সূচী

মার্কিন মুলুকে

পীত দানবের পুরী ৭
একঘেয়েমির রাজত্ব ২৩
'মব্' ৪০

আমার সাক্ষাৎকার

প্রজাতন্ত্রের কোন এক রাজা ৫৫
নীতিধর্মের গুরুঠাকুর ৭৩
জীবনের হর্তাকর্তা ৮৯

প্রবন্ধ

কোন এক মার্কিন পত্রিকার প্রশ্নতালিকার উত্তর ১১১
বুর্জোয়া প্রেস প্রসঙ্গে ১১৪
আমেরিকার নিগ্রো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী সন্ত্রাস . ১২২
আপনারা যাঁরা 'সংস্কৃতির কারিগর', তাঁরা কাদের দলে
আছেন? ১২৮

চিঠিপত্র

পশ্চিম খনিমজুর ফেডারেশনের নেতা উইলিয়ম ডি. হেউড ও
চার্লস ময়ের সমীপে ১৫৭
ন্যু ইয়র্ক সংবাদপত্র-সম্পাদকদের প্রতি ১৫৭
লেওনিদ বরিসভিচ ক্রাসিন সমীপে ১৫৮
কন্স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্নিৎস্কি সমীপে . . . ১৬০
আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে . . ১৬২

ইয়েকাতেরিনা পাভ্‌লভ্‌না পেশ্‌কভা সমীপে ১৬৩
কন্‌স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্‌নিৎস্কি সমীপে ১৬৪
ইভান পাভ্‌লভিচ লাদিজ্‌নিকভ সমীপে ১৬৫
ইভান পাভ্‌লভিচ লাদিজ্‌নিকভ সমীপে ১৬৬
কন্‌স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্‌নিৎস্কি সমীপে ১৬৮
আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে ১৭০
আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে ১৭১
ইয়েকাতেরিনা পাভ্‌লভ্‌না পেশ্‌কভা সমীপে ১৭৩

টীকা-টিপ্পনী ১৭৮

মার্কিন মুলুকে

পীত দানবের পুরী

মহাসাগর আর মাটির বুকের ওপর ঘন ধোঁয়ায় মেশা কুয়াশা, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা অলস মন্থর গতিতে এসে পড়ছে শহরের কালো লেপা পোঁছা দালানকোঠা আর পোতাশ্রয়ের ঘোলাটে জলের ওপর।

দেশান্তরীদের দল জাহাজের ডেক-এ এসে ভিড় করেছে, তারা আশা-আশংকা, ভীতি ও আনন্দ-মিশ্রিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে নীরবে চারধারের সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখছে।

'এ কে?' অবাক হয়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে দেখিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল একটি পোলদেশীয় মেয়ে।

'মার্কিন মুলুকের ভগবান,' কে একজন উত্তরে বলল।

ব্রোঞ্জের বিশাল নারীমূর্তি, সবুজবর্ণের অক্সাইডে আপাদমস্তক ছেয়ে আছে। নিরুত্তাপ মুখ অন্ধ দৃষ্টি মেলে কুয়াশা ভেদ করে ধু ধু মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে -- যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি অপেক্ষা করছে কবে সূর্য এসে তার মৃত চক্ষুতে প্রাণ সঞ্চার করবে। লিবার্টি-মূর্তির পদতলে জমি খুব কম, দেখে মনে হয় বুঝি মহাসাগরের বুক থেকে উঠে এসেছে, তার বেদীটা যেন জমাট তরঙ্গরাশি। মহাসাগর আর জাহাজের মাস্তুল ছাড়িয়ে উঁচিয়ে থাকা তার হাত তার ভঙ্গির মধ্যে একটা গর্বিত মহিমা ও সৌন্দর্য সঞ্চার করে। মনে হয় আঙুলের ফাঁকে শক্ত করে চেপে ধরা মশালটা এই বুঝি দপ করে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠবে, ধূসর বর্ণের এই ধোঁয়া তাড়িয়ে দিয়ে ঔদার্যভরে চারপাশের সমস্ত কিছুর ওপর আনন্দোচ্ছল তপ্ত আলোর বান ঢেলে দেবে।

এদিকে মূর্তিটা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই নগণ্য ভূমিখণ্ডের চতুর্দিকে মহাসাগরের জলরাশির বুকে মান্ধাতার আমলের দৈত্য দানোর মতো পিছলে পিছলে চলেছে বিশাল বিশাল লৌহযান, ক্ষুধার্ত হিংস্র জন্তুজানোয়ারের

মতো ছুটে চলেছে ছোট ছোট লঞ্চ। রূপকথার দৈত্যদের কণ্ঠস্বরে সাইরেন গর্জায়, ক্রুদ্ধ হুইসল বাজে, নোঙ্গরের শেকল ঝনঝন আওয়াজ তোলে, মহাসাগরের ভয়াল তরঙ্গমালা ছিটকে ওঠে।

চারধারের সব কিছু ছুটছে, দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। স্টীমারের স্ক্রু আর প্যাডলগুলো ত্বরিতগতিতে জলের ওপর ঘা মারছে জলরাশি হলুদ ফেনায় আচ্ছন্ন, বলিরেখায় ক্ষতবিক্ষত।

মনে হয় লোহা, পাথর, জল, কাঠ — সব যেন কঠিন শ্রমে বন্দী হয়ে সূর্যহীন জীবনের বিরুদ্ধে গান, সুখবিহীন জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন এক রহস্যময়ী শক্তির আজ্ঞাপালন করতে গিয়ে সবাই যেন কাতরাচ্ছে, আর্তনাদ করছে, দাঁত কড়মড় করছে। লোহা দিয়ে খোঁড়া, ছিন্নভিন্ন, ভাসমান তেলের ফোঁটায় কলঙ্কিত, কাঠের টুকরো, ছিলকে, খড়কুটো আর এঁটো কাঁটা ছড়ানো নোংরা জলরাশির বুকে সর্বত্র কাজ করে চলেছে এক তাপ-উত্তাপবিহীন অদৃশ্য অশুভ শক্তি। কঠোর ও বৈচিত্র্যহীন ভঙ্গিতে সে এই বিরাট গোটা যন্ত্রটাকে ঠেলে চালাচ্ছে — তার ভেতরে জাহাজ আর ডক — এরা ছোট ছোট কতকগুলি অংশমাত্র, আর মানুষ — লোহা ও কাঠের কুৎসিত, নোংরা বুননির মাঝখানে, স্টীমার ও নৌকোর ভিড়ে, ওয়াগন-বোঝাই চেপটা কতকগুলো গাধাবোটের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নগণ্য স্ক্রু ছাড়া আর কিছু নয়।

কোলাহলে বধির, হতচকিত, জড় পদার্থের এই উন্মাদ নৃত্যে বিচলিত, আগাগোড়া ঝুলকালি ও তেলে মাখামাখি দু'পেয়ে জীবটি প্যান্টের পকেটে দু'হাত গুঁজে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ওপর পুরু হয়ে পড়েছে তেলকালির প্রলেপ, সে-মুখের ওপর যা ঝকঝক করছে তা জীবন্ত মানুষের চোখ নয় — সাদা হাড়ের মতো দাঁতের পাটি।

অন্যান্য জলযানের ভিড়ের মধ্য দিয়ে স্টীমারটি ধীরে ধীরে পথ কেটে চলেছে। দেশান্তরী যাত্রীদের মুখগুলো অদ্ভুত ধূসর বর্ণ ধারণ করল, হতবুদ্ধিতে ছেয়ে গেল, সবগুলো চোখের ওপর এসে পড়ল ভেড়ার মতো বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বোকা-বোকা ছাপ। লোকজন ডেক-এর রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এদিকে এই কুয়াশার মধ্যে ফাঁপা মর্মরধ্বনিতে পরিপূর্ণ দূরধিগম্য বিশাল একটা কিসের যেন জন্ম হতে থাকে, বৃদ্ধি ঘটতে থাকে; লোকের মুখের ওপর সে ভারী গন্ধবহ নিশ্বাস ফেলে, তার কোলাহলের মধ্যে ভয়ঙ্কর, লোভাতুর কিসের যেন একটা আভাস পাওয়া যায়।

এটা একটা শহর, এ হল নূ্য-ইয়র্ক। তীরভূমিতে বিশতলা ঘরবাড়ি, নির্বাক-নিস্পন্দ, আঁধার-কালো, 'গগনচুম্বী'। সুন্দর হওয়ার ইচ্ছালেশবিবর্জিত, চারকোনা, স্থূলাকার, ভারী ভারী ইমারত বিষণ্ণ ও বৈচিত্র্যহীন উদাসীন ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাড়ির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় নিজ নিজ উচ্চতা ও কুশ্রীতার জন্য একটা স্পর্ধিত অভিমান। জানলার ধারে ফুলের বালাই নেই, কোন শিশু চোখে পড়ে না।...

দূর থেকে শহরটাকে দেখলে মনে হয় যেন বিশাল চোয়ালের গায়ে এবড়োখেবড়ো কালো কালো দাঁত বেরিয়ে আছে। সে আকাশে ধোঁয়ার কালো মেঘের নিশ্বাস ছাড়ছে, মেদবৃদ্ধি-রোগগ্রস্ত ঔদরিকের মতো ফোঁসফোঁস করছে।

শহরের ভেতরে প্রবেশ করলে মনে হয় যেন পাথর আর লোহার পাকস্থলীর মধ্যে এসে পড়লাম — এই পাকস্থলী কয়েক কোটি মানুষকে গিলে ফেলে পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করে পরিপাক করছে।

রাস্তাটা যেন পিচ্ছিল, লোলুপ গলনালী, তার ভেতর দিয়ে গভীরে কোথায় যেন বয়ে চলেছে শহরের খাদ্য - জীবন্ত মানুষজন। মাথার ওপরে, পায়ের নীচে, তোমার পাশে যেদিকেই তাকাও সর্বত্র নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে, ঘর্ঘর নিনাদে বিজয় গৌরব ঘোষণা করছে লোহা আর লোহা। স্বর্ণের শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের সূক্ষ্ম জালে সে মানুষকে জড়িয়ে ফেলছে তার শ্বাসরোধ করছে, রক্ত ও মজ্জা শুষে খাচ্ছে, পেশী ও স্নায়ু গলাধঃকরণ করছে এবং মৌন পাথরের ওপর ভরসা ক'রে নিজের শৃঙ্খলসংযোগকে আরও দূরে ছড়াতে ছড়াতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

গাড়ি হিঁচড়ে টানতে টানতে বিশাল বিশাল ক্রিমিকীটের মতো সরসর করে এগিয়ে চলেছে রাজ্যের যত লোকোমোটিভ, চর্বিওয়ালা হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করছে মোটরগাড়ির হর্ণ, ইলেক্‌ট্রিক তারের ভয়ঙ্কর গুনগুন আওয়াজ উঠছে — স্পঞ্জ যেমন আর্দ্রতা শুষে নেয় তেমনি ভাবে হাজার হাজার শব্দের গর্জনে পরিপূরিত হয়ে উঠেছে শ্বাসরোধী

বাতাস। কলকারখানার ধোঁয়ায় মলিন বাতাস এই নোংরা শহরের গায়ে চেপে বসে ঝুলকালিমাখা উঁচু উঁচু দেয়ালের মাঝখানে স্থির হয়ে ঝুলে আছে।

বিভিন্ন চত্বরে আর ছোট ছোট স্কোয়ারে যেখানে গাছের ধুলিমলিন পাতা নিষ্প্রাণ অবস্থায় ডালপালার গায়ে ঝুলছে, সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো স্মৃতিমূর্তি। তাদের মুখগুলি কাদার পুরু স্তরে ঢাকা, তাদের যে-চোখ কোন এক সময় দেশপ্রেমের জ্যোতিতে ভাস্বর ছিল এখন তা শহরের ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেছে। এই ব্রোঞ্জের মানুষগুলি মৃত, বহুতলবিশিষ্ট ঘরবাড়ির জালের মধ্যে তারা নিঃসঙ্গ, দেখে মনে হয় তারা যেন উঁচু উঁচু দেয়ালের কালো ছায়ার নীচে নেহাৎই বামন, চারপাশের তান্ডব ও বিশৃঙ্খলা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, চোখে অন্ধকার দেখছে; বিষণ্ণ হয়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের পায়ের কাছে লোকজনের লোলুপ ব্যস্ততা লক্ষ করছে। ক্ষুদ্রকায়, কালো কালো লোকজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্মৃতিমূর্তিগুলির পাশ দিয়ে ছুটে চলে, কেউ ফিরেও তাকায় না বীরপুরুষদের মুখের দিকে। পুঁজির দানব স্বাধীনতাস্রষ্টাদের তাৎপর্য মানুষের মন থেকে মুছে দিয়েছে।

মনে হয় ব্রোঞ্জের মানুষগুলি যেন একই বেদনাদায়ক চিন্তায় আচ্ছন্ন: 'এই রকম জীবন কি আমি গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম?'

উনুনের ওপর বসানো সুপের মতো চারপাশে টগবগ করে ফুটছে জ্বরবিকারগ্রস্ত জীবন, এই টগবগানির মধ্যে খুদে খুদে লোকগুলো সুরুয়ার ভেতরে ফেলা এক মুঠো দানার মতো, সমুদ্রের বুকে ভাসমান কাঠের কুচির মতো ছুটে বেড়াচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শহর গর্জায়, তার অতৃপ্ত মুখগহ্বর একের পর ওদের গিলে ফেলে।

ব্রোঞ্জের বীরপুরুষদের কেউ কেউ হাত নামিয়ে রেখেছে, কেউ কেউ আবার লোকজনের মাথার ওপর হাত তুলে তাদের এই বলে সাবধান করে দিচ্ছে: 'থামো! এটা জীবন নয়, এ যে পাগলামি...'

রাস্তার জীবনের তোলপাড়ের মধ্যে এরা সবাই অতিরিক্ত; লোভাতুর বিকট গর্জনের মধ্যে, পাথর, কাচ আর লোহায় গড়া বিষাদাচ্ছন্ন খেয়ালের কঠিন বন্ধনদশার মধ্যে এদের কারও কোন স্থান নেই।

কোন একদিন নিশীথে তারা সকলে হঠাৎ বেদী থেকে নীচে নেমে এসে লাঞ্ছনাহত চিত্তে ভারী পদক্ষেপে রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে, এই শহর

থেকে তার নিঃসঙ্গতার গ্লানি বয়ে নিয়ে চলে যাবে মুক্ত প্রান্তরে, যেখানে চাঁদ কিরণ দেয়, যেখানে আছে নির্মল বায়ু, পরম শান্তি। যে-মানুষ চিরজীবন তার স্বদেশের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করেছে সে নিঃসন্দেহে অন্তত এটুকু দাবি করতে পারে যে মৃত্যুর পর তাকে যেন শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়।

রাস্তার সমস্ত দিকে ফুটপাথ ধরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ইতস্তত লোকজন চলেছে। পাথুরে দেয়ালের গভীর রোমকূপগুলো তাদের শুষে নিচ্ছে। লোহার বিজয়দৃপ্ত ঝঞ্ঝনা, ইলেক্‌ট্রিসিটির উচ্চ নিনাদ, নতুন কোন ধাতুকারখানা কিংবা পাথরের নতুন নতুন দেয়াল গড়ে তোলার প্রচন্ড গমগম আওয়াজ-- এ সবের মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে, যেমন ভাবে মহাসাগরের ঝঞ্ঝার মধ্যে চাপা পড়ে যায় পাখিদের কলরোল।

লোকজনের মুখ ধীরস্থির শান্ত — জীবনের কেনা গোলাম হওয়ার জন্য, নগর-দানবের খাদ্য হওয়ার জন্য সম্ভবত এদের কারও মনে কোন খেদ নেই। তুচ্ছ আত্মাভিমানবশত এরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা মনে করে তাদের চোখে কখন কখন নিজেদের স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা ঝলক দেয়; কিন্তু তারা বোধ হয় বুঝতে পারে না যে এ স্বাধীনতা নেহাৎই ছুতোরের হাতের কুঠারের মতো, কামারের হাতের হাতুড়ির মতো, এক অদৃশ্য রাজমিস্ত্রীর হাতের ইটের মতো; সে মুখ টিপে চতুর হাসি হেসে সকলের জন্য এক বিশাল অথচ ঠাসাঠাসি কারাগৃহ গেঁথে চলেছে। ওদের মধ্যে বহু অত্যুৎসাহী মুখ আছে, কিন্তু প্রত্যেক মুখের ওপর সর্বাগ্রে চোখে পড়ে দাঁতের সারি। অন্তরের মুক্তি, আত্মার স্বাধীনতা - লোকের চোখে ঝলকায় না। আর স্বাধীনতাহীন এই উৎসাহ স্মরণ করিয়ে দেয় ছুরির শীতল দ্যুতি, যে ছুরি এখনও ভোঁতা হওয়ার অবকাশ পায় নি। এ স্বাধীনতা হল পীত দানবের হাতে — স্বর্ণদানবের হাতে অন্ধ হাতিয়ারের স্বাধীনতা।

এই প্রথম আমি এক দানবীয় শহর দেখছি, এর আগে আর কখনও মানুষকে দেখে আমার এত নগণ্য, এমন দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ মনে হয় নি। সেই সঙ্গে লোভে জড়বুদ্ধিগ্রস্ত এই যে উদরসর্বস্বটি পশুর বন্য গর্জন তুলে মজ্জা ও স্নায়ু গ্রাস করছে, তার এই লোলুপ ও নোংরা পাকস্থলীর মধ্যে তাদের শোচনীয় রূপে হাস্যকর এমন আত্মতৃপ্তি আমি আর কোথাও দেখি নি।...

মানুষ সম্পর্কে কোন কথা বলা ভয়াবহ, বেদনাদায়ক।

'উড়াল পুলের' ওপরকার রেলপথ ধরে, সংকীর্ণ রাস্তার বাড়িঘরের দেয়ালের মাঝখান দিয়ে, লোহার ঝুল-বারান্দা আর সিঁড়ির বৈচিত্র্যহীন জাফরিতে জড়ানো-পাকানো তিন তলা উঁচুতে গর্জন করতে করতে, ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। বাড়িঘরের জানলা খোলা, প্রায় প্রতিটি জানলায় চোখে পড়ে লোকজনের মূর্তি। কেউ কাজ করছে, কিছু একটা সেলাই করছে অথবা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে গুনছে, কেউ বা স্রেফ জানলার ধারে বসে আছে, জানলার তাকের ওপর বুকে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে প্রতি মুহূর্তে গাড়ির কামরাগুলো একের পর এক তাদের চোখের ওপর দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। বৃদ্ধ, যুবা ও শিশু — সকলে একই রকম নির্বাক, বৈচিত্র্যহীন অবিচল, নিশ্চিন্ত। উদ্দেশ্যহীন এই প্রয়াসে তারা অভ্যস্ত, তারা ভাবতে অভ্যস্ত যে এর মধ্যে উদ্দেশ্য আছে। তাদের চোখে লোহার আধিপত্যের ওপর ক্রোধের কোন চিহ্ন নেই, নেই তার বিজয়োল্লাসের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণার ভাব। গাড়ির কামরাগুলো ঝলকে ঝলকে ছুটে চলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘরের দেয়াল কেঁপে উঠছে, নারীদের বক্ষোদেশে, পুরুষদের মাথায় ঝাঁকুনি লাগছে: ঝুল-বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে যে-সমস্ত শিশুর দেহ গড়াগড়ি যাচ্ছে তারাও থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এই জঘন্য জীবনকে সঙ্গত ও অনিবার্য বলে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। যে-মগজ অবিরাম ঝাঁকুনি খেয়ে চলেছে, সেখানে স্বভাবতই সাহসী ও সুন্দর চিন্তার জাল বোনা অসম্ভব, জীবন্ত ও দুঃসাহসী স্বপ্নের আবির্ভাবও সেখানে অসম্ভব।

এক পলকে পাশ দিয়ে সরে গেল এক বুড়ির অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ গায়ে তার নোংরা ব্লাউজ, বুকের সামনের বোতাম খোলা। যন্ত্রণাকাতর, বিষাক্ত বায়ু রেলগাড়িকে পথ ছেড়ে দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে প্রবেশ করল জানলার ভেতরে, বুড়ির মাথার পাকা চুলের রাশি এলোমেলো হয়ে আন্দোলিত হতে লাগল একটা ধূসরবর্ণের পাখির ডানার মতো। সে তার সীসে-ঢালা নিষ্প্রভ চোখ বন্ধ করল। অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোলাটে ঘরের অভ্যন্তরে ঝলক মারছে জীর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত খাটের পাকানো লোহালক্কর, টেবিলের ওপর নোংরা থালাবাসন আর উচ্ছিষ্টের স্তূপ। জানলার তাকে ফুল দেখার বাসনা জাগে, দু'চোখ খুঁজে বেড়ায় বই-হাতে কোন মানুষকে। দেয়ালগুলো চোখের সামনে দিয়ে গলগল করে বয়ে

চলেছে, গলিত পদার্থের মতো নোংরা বন্যাস্রোতের বেগে সামনের দিকে ছুটে আসছে, সেই স্রোতের ক্ষিপ্ত বেগের মধ্যে নির্বাক মানুষজন কিলবিল করছে, নাকানি-চুবানি খাচ্ছে।

ধুলোর স্তরে ঢাকা জানলার শার্সির ওধারে মুহূর্তের জন্য অস্পষ্ট ঝলক দিয়ে উঠল একটা টাক-মাথা। মাথাটা বরাবর একই ভঙ্গিতে কোন এক লেদ-মেশিনের ওপর দুলছে। ছিমছাম গড়নের কটা-কটা চুল একটা অল্পবয়সী মেয়ে জানলার ধারে বসে বসে মোজা বুনতে গিয়ে কালো চোখের গভীর দৃষ্টিতে বুননের ঘর গুনছে। বাতাসের ঝাপটায় সে টাল খেয়ে ঘরের ভেতরে সরে গেল — কিন্তু কাজ থেকে চোখ সরাল না, বাতাসে তার গায়ের যে জামা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল তাও গোছগাছ করল না। দুটি বালক — বছর পাঁচেক করে বয়স হবে — ঝুল-বারান্দায় কাঠের কুচি দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছে। ঝাঁকুনি খেয়ে সে বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। বারান্দার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে সরু সরু কুচিগুলো যাতে রাস্তায় গলে পড়ে না যায় সেজন্য শিশুরা তাদের ছোট ছোট হাতের থাবা দিয়ে সেগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছে। তারাও কিন্তু কী কারণে যে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। আরও আরও মুখ একের পর এক জানলায় ঝলক মারে — যেন বিরাট কোন একটা কিছুর ভাঙা ভাঙা টুকরো, তবে ভেঙে নগণ্য ছোট ছোট টুকরোয় চুরমার হয়ে গেছে, পিষে চূর্ণ হয়েছে বালিকণায়।

ট্রেনের ক্ষিপ্ত গতিবেগে আলোড়িত বাতাস লোকের জামাকাপড় ও চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে, শ্বাসরোধী উষ্ণ ঢেউ তুলে তাদের মুখের ওপর ঝাপ্টা মারছে, ধাক্কা মারছে, তাদের কর্ণকুহরে ঠেসে দিচ্ছে হাজার হাজার শব্দ, চোখে ছুঁড়ে দিচ্ছে জ্বালা ধরা সূক্ষ্ম ধূলিকণা, তাদের অন্ধ করে দিচ্ছে, কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে অবিরাম, একটানা কাতর শব্দে।...

কোন জীবন্ত মানুষের পক্ষে, যে মানুষ ভাবনাচিন্তা করে, যার মস্তিষ্কের ভেতরে স্বপ্ন, চিত্র আর রূপ সৃষ্টির কাজ চলে, যে মানুষ কামনা বাসনার জন্ম দেয়, যার মধ্যে আকুলতা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, যে অস্বীকার করতে পারে, প্রতীক্ষা করতে পারে - সেই জীবন্ত মানুষের পক্ষে এই বন্য আর্তনাদ, বিলাপ, গর্জন, পাথরের দেয়ালের এই কম্পন, জানলার শার্সির ভীরু ঝনঝন আওয়াজ -- এ সবই বিরক্তিকর মনে হতে পারে। তিতবিরক্ত হয়ে সে হয়ত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, ভেঙে ফেলত এই

ঘৃণ্য বস্তুটি — এই 'উড়াল পুল'; স্তব্ধ করে দিত লোহার নির্লজ্জ আর্তনাদ, কারণ সে হল জীবনের প্রভু, তারই জন্য এই জীবন, এবং যা কিছু তার জীবনের ব্যাঘাত ঘটায় সে সবের ধ্বংস হওয়া উচিত।

পীত দানবের পুরীর লোকেরা যা কিছু মানুষকে হত্যা করে বাড়িতে নিশ্চিন্ত চিত্তে সে-সব সহ্য করে থাকে।

নীচে, 'উড়াল পুলের' লোহার জাঙ্গালের তলায়, সদর রাস্তার ধুলোবালির মধ্যে নিঃশব্দে হুটোপাটি করছে শিশুর দল — নিঃশব্দে, যদিও পৃথিবীর সব জায়গার শিশুদের মতো তারাও হাসছে, হৈ হট্টগোল করছে, তবু তাদের মাথার ওপরকার ঘর্ঘর আওয়াজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর, যেমন সমুদ্রে ডুবে যায় বৃষ্টির ফোঁটা। তাদের দেখে মনে হয় যেন ফুলের রাশি, কেউ যেন রুক্ষ হাতে বাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তার কাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শহরের তৈলাক্ত জলীয় বাষ্প থেকে দেহের পুষ্টি সঞ্চয় করার ফলে তারা পাণ্ডুর ও পীতবর্ণ, তাদের শোণিত বিষাক্ত, মরচে ধরা ধাতুর উৎকট চিৎকারে, শৃঙ্খলিত বিদ্যুতের বিষণ্ণ বিলাপে স্নায়ু তাদের উত্তেজিত।

'এই শিশুরা কি বড় হয়ে সুস্থ ও সাহসী মানুষে পরিণত হবে, গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারবে?' নিজের মনে প্রশ্ন জাগে। উত্তরে চারদিক থেকে শোনা যায় দাঁত কড়মড় করার আওয়াজ, হো-হো হাসি, তীক্ষ্ণকণ্ঠের ক্রুদ্ধ চিৎকার।

ট্রেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে শহরের আবর্জনাস্তূপ, দরিদ্রপল্লী ইস্ট সাইডের পাশ দিয়ে। রাস্তাঘাটের গভীর খানাখন্দ লোকজনকে নিয়ে চলেছে কোথায় যেন শহরের গভীরে, যেখানে — কল্পনায় মনে হয় — যেন আছে এক বিশাল অতলস্পর্শী বিবর — ডেকচি অথবা কড়া। এই লোকেরা সবাই চুঁইয়ে চুঁইয়ে সেখানে এসে জমা হয়, সেখানে তাদের গলিয়ে সোনা তৈরি করা হয়। রাস্তার খানাখন্দে গিজগিজ করছে শিশুরা।

দারিদ্র্য আমি বিস্তর দেখেছি, তার নিরক্ত, সবুজ বর্ণের অস্থিসার মুখ আমার কাছে সুপরিচিত। ক্ষুধায় জড়বুদ্ধিগ্রস্ত ও লোভের আগুনঝরা তার চোখ, তার খল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ অথবা দাসসুলভ আজ্ঞানুবর্তী ও নিত্যকার অমানুষিক চোখ আমি সর্বত্র দেখেছি; কিন্তু ইস্ট সাইডের

দারিদ্র্যের যে বিভীষিকা তা আমার জানা যে-কোন ছবির চেয়ে বেদনাদায়ক।

শস্যদানায় ভর্তি বস্তার মতো লোকজনে ঠাসা এই রাস্তাগুলিতে শিশুরা ফুটপাথে রাখা ডাস্টবিনের মধ্যে লুব্ধ দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় পচাগলা শাকসবজী; খুঁজে পেলে তৎক্ষণাৎ জ্বালাধরা ধুলোবালি আর গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে ছাতলাসমেত সেগুলো উদরসাৎ করে।

যখন তারা পচাগলা রুটির শক্ত পিঠ খুঁজে পায় তখন তাদের মধ্যে বেধে যায় ভয়ঙ্কর শত্রুতা। সেই টুকরোটি গলাধঃকরণের প্রবল ইচ্ছায় তারা খুদে কুকুরছানার মতো মারামারি করে। পেটুক পায়রার ঝাঁকের মতো তারা সদর রাস্তা ছেয়ে ফেলে। রাত একটায়, দুটোয়, এমনকি তারও পরে -- দারিদ্র্যের এই শোচনীয় কীটানুরা, পীত দানবের সম্পদশালী ক্রীতদাসদের লোলুপতার উদ্দেশে মূর্তিমান ভর্ৎসনাস্বরূপ এরা তখনও নোংরা ঘেঁটে চলে।

নোংরা রাস্তাঘাটের কোনায় কোনায় কতকগুলি চুল্লী বা কড়াইয়ের মতো কী যেন দেখা যায়, তার মধ্যে কী যেন সেদ্ধ হচ্ছে, একটা সরু নলের ভেতর দিয়ে সজোরে ভাপ বেরিয়ে তার আগার ছোট্ট হুইস্‌লে শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছে। এই তীক্ষ্ণ, কান-ফাটানো শিসধ্বনি, তার কাঁপা কাঁপা তীব্রতা রাস্তার আর সমস্ত আওয়াজকে বিদারণ করে চলে যাচ্ছে, একটা চোখ ধাঁধানো সাদা, ঠাণ্ডা সুতোর মতো একটানা অবিরাম প্রসারিত হয়ে চলেছে, কণ্ঠনালীর চারদিক পেঁচিয়ে ধরছে, মাথার ভেতরকার ভাবনাচিন্তা গুলিয়ে দিচ্ছে, পাগল করে দিচ্ছে, কোথায় যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্যও তার থামার নাম নেই, পূতিগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত করে কাঁপছে, কাঁপছে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে, প্রবল ঘৃণাভরে এই আবিল জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে।

আবিলতা এক প্রাকৃতিক শক্তি -- ঘরবাড়ির দেয়াল, জানলার শার্সি, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের শরীরের লোমকূপ, মস্তিষ্ক, বাসনা, ভাবনাচিন্তা — সব তাতে পরিষিক্ত।

এই সব রাস্তার মধ্যে বাড়ির দরজার অন্ধকারাচ্ছন্ন কোটরগুলি যেন দেয়ালের পাথরের গায়ে পচনধরা ক্ষত। সেগুলির ভেতর দিয়ে উঁকি মারলে যখন আবর্জনায় ঢাকা সিঁড়ির নোংরা ধাপগুলো চোখে পড়ে তখন মনে হয় ভেতরের সব কিছু বুঝি শবদেহের অভ্যন্তরের অন্ত্রের মতো

গলেপচে খসে পড়ছে। আর মানুষগুলো যেন সেখানে ক্রিমিকীটের মতো কিলবিল করছে।...

শিশু-কোলে এক দীর্ঘাঙ্গিনী রমণী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় কালো তার চোখ, তার ব্লাউজের বোতাম খোলা, অসহায় ভাবে লম্বা থলির মতো ঝুলছে তার নীলচে স্তন। শিশু আঙুল দিয়ে তার মা'র নিস্তেজ, বুভুক্ষু শরীরে আঁচড় দিচ্ছে, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, মা'র শরীরের ভেতরে মুখ গুঁজছে, ঠোঁট দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করছে, মুহূর্তের জন্য চুপ করে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার আরও জোরে পরিত্রাহি চিৎকার করছে, হাত-পা ছুঁড়ে মা'র স্তনে ঘা মারছে। মা দাঁড়িয়ে আছে হুবহু একটা প্রস্তরমূর্তির মতো, তার গোলগোল চোখজোড়া প্যাঁচার চোখের মতো — সামনের একটা বিন্দুতে স্থির নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। মনে হয় এ দৃষ্টি অন্ন ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। সে শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ছে, রাস্তার গন্ধবহ ভারী বাতাস টানার সঙ্গে সঙ্গে তার নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই গতকাল যে খাদ্য উদরস্থ করেছিল তারই স্মৃতি নিয়ে জীবন ধারণ করছে, স্বপ্ন দেখছে এক টুকরো খাদ্যবস্তুর, যা কোন এক সময় তার খাবার সুযোগ হলেও হতে পারে। শিশুটি চিৎকার করে কাঁদছে, তার পীতবর্ণের ছোট্ট শরীরটা থেকে থেকে খিঁচুনি দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে -- মা তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না, তার কিল-লাথি অনুভব করতে পারছে না।...

মাথায় টুপি-ছাড়া, হিংস্র চেহারার এক দীর্ঘকায় ও শীর্ণ, পক্বকেশ বৃদ্ধ তার রোগগ্রস্ত চোখের লাল পাতা কুঁচকে সন্তর্পণে আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে কয়লার টুকরো খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন কেউ তার কাছে আসছে তখন সে জবুথবু ভাবে নেকড়ের মতো গোটা ধড়টা ঘুরিয়ে তাকে কী যেন বলছে।

অতি পাণ্ডুর বর্ণের কৃশকায় এক কিশোর ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূসর চোখের দৃষ্টিতে রাস্তা বরাবর তাকিয়ে দেখছে, থেকে থেকে কোঁকড়ানো চুলে ভরা মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তার হাতজোড়া প্যাণ্টের পকেটের গভীরে ঢোকানো, সেখানে তার হাতের আঙুলগুলো বিকারগ্রস্তের মতো নাড়াচাড়া করছে।

এখানে, এই সমস্ত রাস্তায় মানুষ নজরে পড়ে যায়, শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর — ক্রুদ্ধ, খিটখিটে, প্রতিহিংসাপরায়ণ। এখানে মানুষের সত্তা আছে – সে সত্তা ক্ষুধার্ত, উত্তেজিত, আকুলিত। বোঝা যায় কী লোকে

উপলব্ধি করে, লক্ষ করা যায় কী তারা ভাবনাচিন্তা করে। তারা রাস্তার ধারের নোংরা নর্দমার মধ্যে কিলবিল করে, ঘোলা জলের প্রবাহের ভেতরে কুটোর মতো তারা পরস্পরের গায়ে গা ঘষে, ক্ষুধার শক্তি তাদের ঘোরায়, পাক খাওয়ায়, তাদের সঞ্জীবিত করে তোলে কোন কিছু খাবার তীব্র বাসনা।

খাবারের প্রত্যাশায়, উদরতৃপ্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা বিষবাষ্পে পরিপূরিত হাওয়া গলাধঃকরণ করে, তাদের চিত্তের গভীর অন্ধকারে জন্ম নেয় তীক্ষ্ম ভাবনাচিন্তা, ধূর্ত উপলব্ধি, অপরাধচিন্তা।

শহরের পাকস্থলীর মধ্যে তারা যেন রোগ-জীবাণু। এখন সে মুক্তহস্তে যা দিয়ে ওদের পুষ্টি সাধন করছে, এমন এক সময় আসবে যখন সেই বিষ দিয়েই তারা ওকে সংক্রামিত করবে!

ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সেই কিশোরটি থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে সে শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আছে। আমার মন বলছে আমি যেন বুঝতে পারছি সে কী ভাবছে, কী সে চায় — সে যা চায় তা হল ভয়ঙ্কর কোন শক্তির বিশাল বিশাল দুটি হাত আর পিঠে একজোড়া ডানা — আমার তাই বিশ্বাস। এর কারণ যাতে কোন এক সময় দিনের বেলায় শহরের মাথার ওপর উঠে গিয়ে দুটো ইস্পাতের চালনদণ্ডের মতো হাত তার ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ভেতরকার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে আবর্জনা ও ভস্মের স্তূপে পরিণত করতে পারে — ইট আর মণিমুক্তা, ক্রীতদাসদের মাংস আর স্বর্ণপিণ্ড, কাচ আর কোটিপতি, নোংরা, জড়বুদ্ধি মানুষ, দেবালয়, আবিলতায় দূষিত গাছপালা আর এই অর্থহীন বহুতলবিশিষ্ট অভ্রংলিহ দালান — সব, গোটা শহরটাকে পরিণত করতে পারে একটা স্তূপে, মানুষের রক্ত আর কাদামাটির একটা পিণ্ডে — একটা ভয়াল তাণ্ডবে। রুগ্‌ণ লোকের শরীরের সপুঁজ ক্ষতের মতো এই কিশোরের মস্তিষ্কের ভেতরে এমন ভয়ঙ্কর বাসনাও একান্ত স্বাভাবিক। যেখানে ক্রীতদাসদের অনেক কাজ সেখানে স্বাধীন, সৃজনী ভাবনাচিন্তার কোন স্থান থাকতে পারে না, সেখানে প্রস্ফুটিত হতে পারে কেবল ধ্বংসাত্মক ভাবনা, প্রতিহিংসার বিষাক্ত ফুল আর পশুর উদ্দাম প্রতিবাদ। এটা সহজবোধ্য — মানুষের আত্মাকে বিকৃত করার পর তার কাছ থেকে কোন দয়ামায়া আশা করা যায় না।

প্রতিহিংসা গ্রহণের অধিকার মানুষের আছে — মানুষই তাকে এই অধিকার দিয়েছে।

ধোঁয়ার কালিমাখা ঘোলাটে আকাশে দিনের আলো নিভে গেল। বিরাট বিরাট দালানগুলো আরও বিষাদগ্রস্ত, আরও ভারী ভারী হয়ে উঠছে। তাদের অন্ধকার গর্ভের মধ্যে কোথাও কোথাও আলো দপদপ করে জ্বলছে, যারা সারারাত ধরে এই সমাধিগুলোর মৃত সম্পদ পাহারা দেবে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত জন্তুজানোয়ারের পীতবর্ণ চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে।

লোকে দিনের কাজ শেষ করেছে — কেন কাজটা করা হল, তাতে তাদের কোন প্রয়োজন আছে কিনা — একবারও ভেবে না দেখে তারা চটপট ঘুমানোর জন্য ছোটে। ফুটপাথগুলো মনুষ্যদেহের কালো বন্যায় ঢালা। সবগুলো মাথা বৈচিত্র্যহীন গোল গোল টুপিতে ঢাকা, আর মাথার ভেতরকার যে মস্তিষ্ক -- চোখ দেখলেই বুঝতে বাকি থাকে না -- তা ইতিমধ্যেই নিদ্রামগ্ন। কাজ শেষ হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাচিন্তারও শেষ। সব লোকের ভাবনা শুধু যার যার মনিবের জন্য, নিজের সম্পর্কে কারও ভাবার কিছু নেই। কাজ যদি থাকে তাহলে রুটিও আছে, সেই সঙ্গে আছে সস্তা জীবন উপভোগের আনন্দ — এছাড়া পীত দানবের এই পুরীতে মানু-ষের আর কোন প্রয়োজন নেই।

লোকে চলেছে যার যার শয্যার উদ্দেশ্যে, যার যার নারী বা পুরুষের উদ্দেশ্যে — রাতের বেলায়, গুমোট ঘরের মধ্যে গলদঘর্ম হয়ে, ঘামে পিচ্ছিল হয়ে তারা প্রণয়লীলায় মত্ত হবে যাতে শহরের জন্য জন্ম নেয় নতুন, টাটকা পুষ্টি।

তারা চলেছে। হাসির রোল শোনা যায় না, নেই উৎফুল্ল কথাবার্তার কলধ্বনি, মুখে হাসির ঝলক দেখা যায় না।

মোটরগাড়ি প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ করছে, চাবুক চটাস-চটাস করছে. ইলেক্ট্রিকের পাকানো তারে ঘন গুঞ্জন উঠছে, ট্রেন চলার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত কোথাও বাজনাও বাজছে।

রাস্তায় হকার-ছেলের দল তীব্রকণ্ঠে খবরের কাগজের নাম হেঁকে বেড়াচ্ছে। কলের বাজনার নিকৃষ্ট আওয়াজ আর কার যেন আর্ত চিৎকার খুনী ও ভাঁড়ের সকরুণ হাস্যরসাত্মক আলিঙ্গনের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। খুদে খুদে মানুষেরা চলেছে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে — যেন নুড়িপাথর গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে পাহাড়ের ঢল বেয়ে।

পীত বর্ণের আলো ক্রমেই বেশি সংখ্যায় জ্বলে উঠছে — আগাগোড়া একেকটা দেয়াল ঝলমল করে উঠছে বীয়ার, হুইস্কি, সাবান, দাড়ি কামানোর

নতুন খবর, টুপি, সিগার আর থিয়েটার সম্পর্কিত অগ্নিগর্ভ বাণীতে। স্বর্ণের লোভাতুর প্রেরণায় রাস্তার সর্বত্র ঘর্ঘর শব্দে তাড়িত হয়ে চলেছে লোহা— তার আওয়াজের কোন কামাই নেই। এখন সর্বত্র আলো জ্বলে ওঠার পর এই অবিরাম আর্ত চিৎকার আরও বড় তাৎপর্য অর্জন করছে, নতুন অর্থবহ হয়ে উঠছে, আরও উৎকট শক্তি ধারণ করছে।

বাড়িঘরের দেয়াল থেকে, দোকানপাটের সাইনবোর্ড আর হোটেল-রেস্তোরাঁর জানলার ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে বিগলিত স্বর্ণের চোখ-ধাঁধানো আলো। নির্লজ্জ, উচ্চকণ্ঠ, বিজয়দৃপ্ত সে আলোয় সর্বত্র শিহরিত হয়ে উঠছে, চোখ টাটাচ্ছে, তার শীতল দীপ্তিতে বিকৃত হয়ে উঠছে মুখের চেহারা। তার ধূর্ত ঝলক মানুষের পকেট থেকে তাদের রোজগারের নগণ্য দানাটুকু পর্যন্ত টেনে বার করার তীব্র বাসনায় সমাচ্ছন্ন -- সে তার চো খের ইশারাকে মিটিমিটি আলোর ভাষায় প্রকাশ করছে আর এই ভাষা দিয়ে সে শ্রমিকদের আহবান জানাচ্ছে সস্তার পরিতৃপ্তির, তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সুবিধাজনক জিনিসের।

এই শহরের আলোর প্রাচুর্য বড় ভয়াবহ! প্রথম প্রথম এটাকে মনে হয় সুন্দর, এতে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ফুর্তি সঞ্চারিত হয়। আলো হল স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক শক্তি, সূর্যের গর্বিত সন্তান। যখন তার দুরন্ত প্রস্ফুটন ঘটে তখন তার ফুলে ফুলে শিহরণ ওঠে, তার ফুল হয় পৃথিবীর যে কোন ফুলের চেয়ে সুন্দর। সে জীবনকে কলুষমুক্ত করে; জরাজীর্ণ, মৃত ও আবিল সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার ক্ষমতা সে রাখে।

কিন্তু এই শহরে কাচের স্বচ্ছ বন্দীশালায় আবদ্ধ আলোর দিকে যখন তাকানো যায় তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে এখানে আর সব কিছুর মতো আলোও ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। সে স্বর্ণের সেবা করে, স্বর্ণের জন্যই সে আছে, পরম বিদ্বেষভরে মানুষের কাছ থেকে সে দূরে দূরে থাকে।...

লোহা, কাঠ, পাথর — সব কিছুর মতো আলোও চক্রান্ত করে চলেছে মানুষের বিরুদ্ধে — তার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, তাকে ডেকে বলছে, 'এদিকে এসো দেখি!' তাকে ভুলিয়ে বলছে, 'তোমার যা টাকাকড়ি আছে বার করে দিয়ে দাও দেখি!'

লোকে তার ডাক শুনছে, রাজ্যের যত অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল কিনছে, এমন সমস্ত শো দেখছে যাতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হয়ে যায়।

মনে হয় শহরের কেন্দ্রস্থলে কোথায় যেন একটা বিরাট স্বর্ণপিণ্ড কামার্ত

শীৎকার তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘূরপাক খেয়ে চলেছে, সমস্ত রাস্তাঘাটের ওপর সে ছড়িয়ে দিচ্ছে সূক্ষ্ম রেণু, মানুষ সারা দিন ধরে সেগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, লুফে লুফে ধরছে, ব্যগ্র হয়ে চেপে ধরছে। কিন্তু দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, স্বর্ণপিণ্ড উলটো দিকে ঘুরতে শুরু করে, ঘুরতে ঘুরতে শীতল আলোর ঘূর্ণি তৈরি করে, তার ভেতরে লোকজনকে টেনে নেয় যাতে লোকে দিনের বেলায় যে স্বর্ণরেণু ধরেছিল তা আবার ফেরত দিয়ে দেয়। লোকে সব সময় যতটা নিয়েছিল তার চেয়ে বেশি ফেরত দেয়, পর দিন সকালে দেখা যায় স্বর্ণপিণ্ড আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে আরও দ্রুত বেগে পাক খেতে থাকে, তার ক্রীতদাস লোহার বিজয়োল্লাস, তার দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা সমস্ত শক্তির ঘর্ঘর আওয়াজ আরও জোরে বাজতে থাকে।

তারপর আগের দিনের চেয়েও বেশি লোভোন্মত্ত হয়ে, আরও বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সে মানুষের রক্তমজ্জা শুষতে থাকে যাতে আগামীকাল এই রক্ত, এই মজ্জা পরিণত হয় পীতবর্ণের শীতল ধাতুতে। স্বর্ণপিণ্ড হল শহরের হৃৎপিণ্ড। তার স্পন্দনের মধ্যে আছে সমস্ত জীবন, তার আয়তন বৃদ্ধির মধ্যে আছে সেই জীবনের সমস্ত অর্থ।

এরই জন্য মানুষ দিনের পর দিন ধরে গর্ত খুঁড়ে চলছে, লোহা পেটাই করছে, ঘরবাড়ি গড়ছে, কলকারখানার ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে, দেহের রোমকূপ দিয়ে ভেতরে শুষে নিচ্ছে দূষিত, রোগগ্রস্ত বায়ু, এর জন্য তারা বিকিয়ে দিচ্ছে তাদের সুন্দর দেহ।

এই দুষ্ট ইন্দ্রজাল তাদের অন্তঃকরণকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, মানুষকে পরিণত করে পীত দানবের হাতের যদৃচ্ছ হাতিয়ারে, পরিণত করে এমন এক খনিতে যা নিংড়ে সে অনবরত বার করে সোনা, নিজের রক্তমাংস।

ধূ ধূ মহাসাগর থেকে রাত এসে শহরের ওপর স্নিগ্ধ লবণাক্ত নিশ্বাস ফেলছে। হাজার হাজার তীরের ফলায় শীতল আলো তাকে বিদ্ধ করছে — সে চলেছে, চলতে চলতে সমবেদনাবশত বাড়িঘরের কদর্যতাকে, সংকীর্ণ রাস্তাঘাটের জঘন্য চেহারাকে আঁধার-কালো পোশাকে জড়িয়ে দিচ্ছে, দারিদ্র্যের শতচ্ছিন্ন আবিলতাকে ঢেকে দিচ্ছে। লোলুপ উন্মত্ততার বন্য আর্তনাদ তার দিকে ধেয়ে এসে তার নীরবতাকে খান খান করে ভেঙে

ফেলছে — সে চলতে থাকে, চলতে চলতে ধীরে ধীরে দাসত্ব শৃঙ্খলা আবদ্ধ নির্লজ্জ আলোর দীপ্তিকে নিভিয়ে দেয়, তার কোমল হাত দিয়ে ঢেকে দেয় শহরের সপুঁজ ক্ষত।

কিন্তু রাস্তাঘাটের গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করার পর বিজয়ের শক্তি সে হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে নিজের স্নিগ্ধ শীতল নিশ্বাসের সাহায্যে শহরের বিষবাষ্প বিতাড়নের ক্ষমতা। সে রৌদ্রতপ্ত দেয়ালের পাথরের গায়ে গা ঘষে, ছাতের মরচে ধরা লোহা আর সদর রাস্তার নোংরার ওপর দিয়ে গুড়ি মেরে চলে, বিষাক্ত ধুলিকণায় পরিষিক্ত হয়, নানা রকমের গন্ধ গলাধঃকরণ করে এবং পাখা বন্ধ করে দিয়ে, অবসন্ন অবস্থায়, স্থির হয়ে শুয়ে পড়ে বাড়িঘরের ছাদের ওপরে, রাস্তার খানাখন্দে। তার থাকার মধ্যে রয়ে যায় তামসিকতা — কাঠ, পাথর ও লোহা আর মানুষের দূষিত নোংরা ফুসফুস তাকে গিলে ফেলায় অদৃশ্য হয় তার শীতলতা ও স্নিগ্ধতা। তার ভেতরে আর সেই নিস্তব্ধতা থাকে না, থাকে না কাব্যরস।

শহর গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, একটা বিশাল জন্তুর মতো গর্‌গর্‌ করে। সারা দিনে সে এটা-ওটা নানা খাবার বড় বেশি পরিমাণ খেয়ে ফেলেছে, তার গরম লাগছে, সে আইঢাই করছে; বিশ্রী, উৎকট সমস্ত স্বপ্ন দেখছে সে।

কাঁপতে কাঁপতে আলো নিভে গেল, বিজ্ঞাপনের বশংবদ ভৃত্য ও উস্কানিদাতার হীন ভূমিকায় সেদিনকার মতো তার কাজ শেষ হয়ে গেল। বাড়িঘরগুলো একের পর এক লোকজনকে তাদের পাথরের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে টেনে শুষে নিল।

দীর্ঘকায়, শীর্ণ, কোলকুঁজো চেহারার একটি লোক রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে নিষ্প্রভ চোখের উদাস দৃষ্টিতে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখছে। কোথায় যাওয়া যায়? সব রাস্তাই এক রকমের, সব বাড়ি জানলার ঘষা কাচের নিষ্প্রভ শ্বেতাংশ মেলে একই রকম উদাসীন ও মৃত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।...

একটা শ্বাসরোধী ব্যাকুলতা উষ্ণ হাতে কণ্ঠনালী চেপে ধরছে, শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘরবাড়ির ছাদের মাথার ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বচ্ছ মেঘ — অভিশপ্ত, হতভাগ্য শহরের দেহ থেকে দিনের বেলায় নিঃসৃত স্বেদবাষ্প। এই পর্দা ভেদ করে অন্তরীক্ষের অলঙ্ঘনীয় দূরত্বে, ঊর্ধ্ব আকাশে অস্পষ্ট ভাবে মিটমিট করছে শান্ত তারাদল।

লোকটি মাথার টুপি খুলল, মাথা তুলে ঊর্ধ্বপানে তাকাল। এই শহরের উঁচু উঁচু ঘরবাড়ি অন্য যে-কোন জায়গার তুলনায় আকাশকে মাটির চেয়ে অনেক বেশি দূরে ঠেলে দিয়েছে। তারাগুলো ছোট ছোট, নিঃসঙ্গ।

দূরে তামার তূরী বাজছে — যেন বিপদের সংকেত করছে। লোকটির লম্বা লম্বা পাদুটো অদ্ভুত ভাবে ঠকঠক করে কাঁপছে, সে মাথা হেঁট করে, হাত দোলাতে দোলাতে ধীর পদক্ষেপে একটা রাস্তার ভেতরে মোড় নিচ্ছে। অনেক রাত হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ক্রমে আরও নির্জন হয়ে আসছে। নিঃসঙ্গ ছোট ছোট লোকগুলো অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মাছির মতো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ধূসর টুপি মাথায়, লাঠি হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের লোক। তারা আস্তে আস্তে চোয়াল নাড়িয়ে তামাক চিবুচ্ছে।

লোকটা চলল তাদের পাশ কাটিয়ে, টেলিফোনের খুঁটি আর ঘরবাড়ির দেয়ালের ভেতরকার অসংখ্য কালো কালো দরজার পাশ দিয়ে — কালো কালো দরজাগুলো যেন ঝিমোতে ঝিমোতে তাদের চৌকোনা মুখগহ্বর মেলে হাই তুলছে। দূরে কোথায় যেন ট্রামগাড়ি চলার ঘর্ঘর আওয়াজ ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। রাস্তাঘাটের পিঞ্জরের গভীরে রাত্রির নাভিশ্বাস উঠল, রাত্রি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

লোকটা চলেছে সমান তালে পা ফেলে ফেলে, তার দীর্ঘ, কোলকুঁজো দেহ-কাঠামোটা দোলাতে দোলাতে। তার আকার-প্রকারের মধ্যে এমন একটা কিছুর আভাস আছে যা ভাবনাচিন্তারত এবং দ্বিধাগ্রস্ত অথচ সমাধানরত।

আমার মনে হয় লোকটা চোর।

শহরের কালো গোলকধাঁধার মধ্যে একটা লোক যে নিজেকে জীবন্ত অনুভব করছে এ দৃশ্য দেখে ভালো লাগে।

দরাজ খোলা জানলাগুলো মানুষের গায়ের ঘামের ন্যক্কারজনক গন্ধ ছাড়ছে।

প্রাণ-ব্যাকুল-করা, শ্বাসরোধী অন্ধকারের মধ্যে দুর্বোধ্য চাপা আওয়াজ তন্দ্রার ঘোরে ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

পীত দানবের বিষাদাচ্ছন্ন পুরী নিদ্রা গেল, ঘুমের ঘোরে সে ভুল বকছে।

১৯০৬

একঘেয়েমির রাজত্ব

রাত্রি যখন নামে তখন মহাসাগরের বুকে আকাশের দিকে মাথা তুলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় আগাগোড়া আলো-ঝলমলে এক ভূতুড়ে শহর। হাজার হাজার উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ তেতে উঠে অন্ধকারের মধ্যে ঝলক দিচ্ছে, আকাশের অন্ধকার পটে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট রেখায় এ'কে চলেছে রঙবেরঙের স্ফটিকে তৈরি অপূর্ব সমস্ত দুর্গ, প্রাসাদ ও দেবালয়ের সুগঠিত মিনার। পাকে পাকে অগ্নিশিখার স্বচ্ছ কারুকাজ বুনতে বুনতে শূন্যে শিহরণ তুলছে সূক্ষ্ম স্বর্ণজাল, নিজের রূপ জলের বুকে প্রতিফলিত হতে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখছে। রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য ও দুর্বোধ্য আলোর এই ঝলক, যা দগ্ধ হতে হতেও ধ্বংস হয় না। অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর তার এই যে ঐশ্বর্যময় দীপ্তির শিহরণ যা ধু ধু আকাশ আর মহাসাগরের বুকে গড়ে তুলছে অগ্নিময় পুরীর এক ঐন্দ্রজালিক চিত্র তার সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মাথার ওপরে আন্দোলিত হচ্ছে রক্তিম আভা, তার দেহপরিলেখগুলি জল থেকে প্রতিফলিত হয়ে গলিত স্বর্ণের খেয়ালি কল্পনাবিজড়িত নানা ছিটে ফোঁটা দাগে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।...

আলোর খেলা অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের জন্ম দেয় - মনে হয় ওখানে, প্রাসাদের বড় বড় কক্ষে, অগ্নিগর্ভ আনন্দোচ্ছ্বাসের উজ্জ্বল ঝলকের মধ্যে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বেজে চলেছে মৃদু সঙ্গীত, যে সঙ্গীত এর আগে কেউ কখনও শোনে নি। তার সুললিত তরঙ্গপ্রবাহের মাথাব ওপর পক্ষযুক্ত নক্ষত্রমালার মতো দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে দুনিয়ার যত ভালো ভালো চিন্তাভাবনা। এই দিব্য নৃত্যের মধ্যে তারা একে অন্যের সান্নিধ্যে আসে এবং ক্ষণিকের আলিঙ্গনে দপ করে জ্বলে উঠে নতুন অগ্নিশিখার, নতুন ভাবনার জন্ম দেয়।

মনে হয় ওখানে, নরম অন্ধকারের মধ্যে, ঊর্মিমালাবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের বুকে সোনার সুতোয়, ফুলে আর তারায় আশ্চর্যরকম ভাবে বোনা এক বিরাট দোলনা দুলছে — তার মধ্যে রাতের বেলায় সূর্য বিশ্রাম করে।

সূর্য মানুষকে জীবনের সত্যের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে। দিনের বেলায় অগ্নিদীপ্ত রূপকথার পুরীর জায়গায় চোখে পড়ে কেবল সাদা সাদা বায়বীয় দালান।

মহাসমুদ্রের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের নীল কুয়াশা শহরের ধূসর ঘোলাটে

ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায়; স্বচ্ছ পর্দায় ঢাকা পড়ে সাদা রঙের হালকা গাঁথুনিগুলো মরীচিকার মতো কাঁপছে, প্রলুব্ধ করছে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে, সান্ত্বনাদায়ক, সুন্দর কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

ওখানে, পশ্চাৎপটে, ধোঁয়া ধুলোবালির স্রোতের মধ্যে ভারী ভারী শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহরের চৌকোনা ঘরবাড়ি, অতৃপ্ত লোভের ক্ষুধায় কাতর হয়ে অবিরাম গর্জন তুলছে শহর। আকাশ-বাতাস ও অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে-তোলা এই তীব্র ধ্বনি, লোহার তন্ত্রীর এই বিরামবিহীন আর্তনাদ, স্বর্ণশক্তিতে নিপীড়িত জীবনের শক্তির ব্যাকুল বিলাপ, পীত দানবের বিদ্রূপাত্মক শিসধ্বনি — এই কোলাহল শহরের পূতিগন্ধময় দেহের চাপে পিষ্ট ও দূষিত জগৎ থেকে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষ তাই যায় সাগর-উপকূলে, যেখানে সাদা রঙের সুন্দর সুন্দর দালান তাদের বিশ্রাম ও শান্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

কালো জলের গভীরে একটা তীক্ষ্ন ছোরার মতো বিদ্ধ বালির দীর্ঘ অন্তরীপের ওপর তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলোয় বালিরাশি পীতবর্ণের উষ্ণ দীপ্তিতে ঝলমল করছে, স্বচ্ছ দালানগুলিকে মনে হচ্ছে যেন মখমলের ওপর সূক্ষ্ম রেশমী সুতোর কাজ। বুঝি বা কেউ এই তীক্ষ্ন বাঁকা অন্তরীপে এসে নিজের জমকাল পোশাক ছেড়ে তার বুকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরঙ্গমালার ভেতরে নিমজ্জিত হয়েছে।

ইচ্ছে করে ওখানে গিয়ে বস্ত্রের মধুর, নরম জমিন ছুঁয়ে দেখি, তার জমকালো কুঁচিগুলোর ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকি ধু ধু বিস্তারের দিকে, যেখানে দ্রুত ঝলক দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে চলেছে পাখিরা, যেখানে সূর্যের প্রখর দীপ্তির মধ্যে মহাসাগর ও আকাশ আড়ষ্ট হয়ে ঢুলছে।

এর নাম হল কোনি আইল্যান্ড।

সোমবার-সোমবার শহরের খবরের কাগজ জাঁক করে পাঠকবর্গকে জানায়: 'গতকাল ৩ লক্ষ লোক কোনি আইল্যান্ড দর্শন করতে এসেছিলেন। ২৩টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে।...'

... চোখের সামনে কোনি আইল্যান্ডের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য দেখতে গেলে রাস্তার ধুলোবালি আর হৈ হট্টগোলের মধ্য দিয়ে ট্রামে করে ব্রুকলিন আর লং আইল্যান্ডের ওপর দিয়ে অনেক দূর যেতে হবে। মানুষ যেই এই আলোক পুরীর প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ায় অমনি তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ ঝকঝকে নিরুত্তাপ স্ফুলিঙ্গ তার চোখে বর্ষিত

হয়, ঝকঝকে ধূলিকণার মধ্যে সে অনেকক্ষণ কিছু বুঝে উঠতে পারে না, তার চারপাশের সব কিছু আলোকের ফেনপুঞ্জের উত্তাল ঘূর্ণির মধ্যে মিলেমিশে একশা, সব ঘুরছে, ঝলমল করছে, আকর্ষণ করছে। লোকে সঙ্গে সঙ্গে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, এই আলোকের ছটা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তার মাথার ভেতরকার সমস্ত চিন্তা বার করে দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তাকে জনতার খণ্ডাংশে পরিণত করে। লোকে নেশাগ্রস্তের মতো বেহুঁশ হয়ে গা ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোথায় যেন চলেছে এই আলোকের ছটার মাঝখানে। তাদের মস্তিষ্কের ভেতরে এসে প্রবেশ করছে অস্পষ্ট সাদা-সাদা কুয়াশা, একটা লোভাতুর প্রতীক্ষা চটচটে পর্দায় জড়িয়ে ধরে আত্মাকে। আলোকের ছটায় আচ্ছন্ন হয়ে লোকজনের ভিড় কালো ধারায় প্রবাহিত হয়ে রাতের কালো সীমারেখায় চতুর্দিক চাপা-পড়া স্থির আলোর সরোবরে এসে পড়ে।

সর্বত্র নীরস ও নিরুত্তাপ ছোট ছোট বাতির ঝলকানি, সমস্ত খুঁটিতে ও দেয়ালে জানলার চৌকাটের পাশের তক্তায় তক্তায়, দালানের কার্ণিশে-কার্ণিশে বাতি লাগানো, সমান সার বেঁধে বিদ্যুৎ-স্টেশনের উঁচু চিমনির ওপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে তারা চলে গেছে, সব বাড়ির ছাদের মাথায় জ্বলছে, নিষ্প্রাণ আলোকছটার তীক্ষ্ণ সূচিকায় বিদ্ধ করছে মানুষের চোখ -- লোকে চোখ কোঁচকাচ্ছে, বিমূঢ় হাসি হেসে জট পাকানো শৃঙ্খলের ভারী আঙটার মতো ধীরে ধীরে মাটির ওপর পা টেনে টেনে চলেছে।

যার ভেতরে কোন উল্লাস নেই, কোন আনন্দ নেই এমন এক বিস্ময়ের চাপে পিষ্ট জনতার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয় মানুষকে। আর যে-লোক নিজেকে খুঁজে পায় সে দেখতে পায় এই কোটি কোটি দীপ সম্ভাব্য রূপের আভাস সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম দেয় এক হতাশাব্যঞ্জক আলোর, যা সব কিছুকে বিবস্ত্র করে দেয়, সর্বত্র নগ্ন করে তোলে একঘেয়ে, স্থূল বীভৎসতা। দূর থেকে যা দেখতে ছিল স্বচ্ছ, রূপকথার পুরী, এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কতকগুলি সরল রেখার এক অর্থহীন গোলকধাঁধা, শিশুদের আমোদ-ফুর্তির জন্য তাড়াহুড়োয় গড়া শস্তার কিছু গাঁথুনি, যেন শিশুদের দুরন্তপনায় বিচলিত কোন এক প্রবীণ শিক্ষাব্রতীর মাপাজোখা কাজ, খেলনাপাতির মধ্য দিয়েও যাতে আজ্ঞানুবর্তিতা ও নম্রতার শিক্ষা শিশুদের দেওয়া যায় এটাই যেন তাঁর ইচ্ছা। গণ্ডায় গণ্ডায় সাদা দালান — তাদের কুশ্রীতার বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য, কিন্তু

একটির মধ্যেও সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই। সেগুলো কাঠের তৈরি, সাদা রঙের প্রলেপ লাগানো, জায়গায় জায়গায় চটা ওঠা — দেখে মনে হয় যেন একই রকম চর্মরোগে সবাই ভুগছে। উঁচু উঁচু মিনার আর সারি সারি নীচু থাম দুই জড়বৎ সমান রেখায় বিস্তৃত, রুচির কোন বালাই না রেখে ঠেলাঠেলি করছে। আলোর নির্লিপ্ত ছটায় সব কিছু বিবস্ত্র, লুণ্ঠিত। সর্বত্র সে আছে — কোথাও ছায়ার নামগন্ধ নেই। প্রতিটি দালান হতচকিত মূর্খের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়েছে, এককেটা বাড়ির ভেতরে আছে ধোঁয়ার মেঘ, শোনা যায় তামার তূরীর গর্জন, অর্গ্যানের আর্তনাদ, চোখে পড়ে কালো-কালো মূর্তি। লোকে খানাপিনা করছে, ধূমপান করছে।

কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। বাতাসে সমান ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে বড় বড় বাতির হিস-হিস শব্দ, ভেসে বেড়াচ্ছে বাজনার ভাঙা ছেঁড়া টুকরো, কাঠের বাঁশি আর অর্গ্যানের নগণ্য কূজন, চুল্লীর সোঁ-সোঁ আওয়াজ। এ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় শক্ত টানটান করে বাঁধা কোন এক অদৃশ্য মোটা তারের একরোখা গুঞ্জনে, আর মানুষের কণ্ঠস্বর যখন এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির জগতে অনুপ্রবেশ করে তখন তা শোনায় ভীত সন্ত্রস্ত ফিসফিসানির মতো। চারদিকের সব কিছু তাদের একঘেয়ে কুশ্রীতাকে নগ্ন করে দিয়ে নির্লজ্জ ভাবে ঝলমল করছে।...

এই কর্ণভেদী ও চোখ ধাঁধানো বিচিত্রবর্ণের একঘেয়েমির বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এক জীবন্ত, রক্তিম ও প্রস্ফুটিত আলোকের তীব্র বাসনা মানুষের মনকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করে।... ইচ্ছে করে এই মাধুর্যকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে জীবন্ত অগ্নিশিখার রঙবেরঙের লকলকে জিহ্বার বিপুল তান্ডবের মধ্যে, মানসিক দারিদ্র্যের নিষ্প্রাণ ঐশ্বর্য ধ্বংসের সুমধুর ভোজসভায় উন্মত্ত হয়ে, উল্লাসে নৃত্য করি, চিৎকার করি, গান গাই।

এই শহরের যারা বন্দী এমন মানুষের সংখ্যা বাস্তবিকই লক্ষ লক্ষ। খাঁচার আকারের সাদা সাদা গাঁথুনিতে ঠাসাঠাসি এর বিশাল আয়তনের সমস্তটা জুড়ে, দালান-কোঠার সমস্ত বড় বড় ঘরগুলিতে তারা কালো কালো মাছির ঝাঁকের মতো ভিড় করে এসে জোটে। গর্ভবতী নারীরা তাদের গর্ভভার বয়ে বেড়িয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। শিশুরা চলেছে নীরবে, মুখ হাঁ করে, ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখে তারা এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে, গুরুত্ব দিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে যে তাদের সে চাউনি দেখলে মনটা দুঃখে-মমতায় ভরে ওঠে, কেননা তাদের এই দৃষ্টি তাদের মনকে কুশ্রীতায়

পরিপুষ্ট করে তোলে, তারা কুশ্রীতাকে সৌন্দর্য বলে ভুল করে। নিখুঁত দাড়ি কামানো পুরুষদের গোঁফ-ছাড়া মুখগুলো দেখতে অদ্ভুত একরকম, স্থির, গম্ভীর। তাদের বেশির ভাগই স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের এখানে নিয়ে এসেছে; পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ত করছেই তার ওপরে পরিবারের লোকজনকে যে এমন একটা দৃশ্য উপভোগের সুযোগ করে দিচ্ছে সেজন্যও বটে, তারা পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে মনে নিজেদের ভেবে থাকে। এই ঝলমলে দৃশ্য দেখতে তাদের নিজেদেরও ভালো লাগে, কিন্তু তারা এত বেশি গম্ভীর যে নিজেদের সেই উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করে না, তাই বৈচিত্র্যহীন ভঙ্গিতে পাতলা ঠোঁট চেপে, চোখ কুঁচকে ভ্রূকুটি করে তারা এমন ভাবে তাকায় যেন কিছুতেই কখনও আশ্চর্য হয় না। পরিণত অভিজ্ঞতার এই যে আপাত প্রশান্তি তারও অন্তরালে কিন্তু অনুভব করা যায় শহরের সমস্ত রকম সুখ উপভোগের প্রবল বাসনা। এই গুরুগম্ভীর লোকগুলো তাই উজ্জ্বল চোখের কোনায় উপচে পড়া আনন্দের ছটা গোপন করার উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্যভরে বাঁকা হাসি হেসে বৈদ্যুতিক নাগরদোলায় কাঠের ঘোড়া বা হাতির পিঠে চেপে বসে রেলের ওপর দিয়ে সবেগে ধাবিত হওয়ার, সাঁ করে ওপরে ওড়ার এবং সোঁ সোঁ করে নীচে নামার তৃপ্তি লাভের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে। এই ঝাঁকুনি-খাওয়া যাত্রা শেষ করার পর সবাই আবার তাদের মুখের চামড়া শক্ত টান টান করে আরও কিছু আনন্দ উপভোগের জন্য এগিয়ে যায়।

উপভোগের বস্তুর কোন সীমা সংখ্যা নেই।

ঐ ত লৌহমিনারের চূড়ার ওপর মৃদুমন্দ গতিতে দুলছে দুটি সাদারঙের লম্বা লম্বা ডানা, ডানার দু'প্রান্তে ঝুলছে খাঁচা, খাঁচার ভেতরে লোক-জন। একটা ডানা যখন ভারী ঝাপটা মেরে আকাশের দিকে উঠে যায় তখন খাঁচার ভেতরকার লোকগুলোর মুখ বেদনাদায়ক গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে, সব মুখ একই রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে নীরবে চোখ ছানাবড়া করে মাটির দিকে তাকিয়ে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে দেখে। আর ডানার অন্য যে প্রান্তটা এই সময় সন্তর্পণে নীচে নামতে থাকে সেখানকার খাঁচার ভেতরে যে সমস্ত লোক আছে, তাদের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, শোনা যায় পরিতৃপ্তির তীক্ষ্ন চিৎকার। কোন কুকুরছানার টুঁটির চামড়া ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার পর তাকে মেঝেতে নামিয়ে দিলে সে আনন্দে যেমন তীক্ষ্ন চিৎকার করে ওঠে এ আওয়াজ তার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আরেকটা মিনারের চুড়োর চারধারে শূন্যে কতকগুলো নৌকো উড়ছে,

তৃতীয় একটা ঘুরতে ঘুরতে লোহার কয়েকটা চোঙকে সচল করে তুলছে, চতুর্থ, পঞ্চম — সবগুলোই গতিময়, জ্বলজ্বল করছে, নিরুত্তাপ আলোর মৌন চিৎকারে ডাকাডাকি করছে। সব দুলছে, তীক্ষ্ম আওয়াজ করছে, ঘন গর্জন করছে, লোকজনের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তাদের করে তুলছে আত্মপ্রসাদপূর্ণ নীরস, গতির গোলকধাঁধায় আর আলোর দীপ্তিতে অবসন্ন করে ফেলছে তাদের স্নায়ু। হালকা রঙের চোখগুলি আরও হালকা হয়ে উঠছে — সাদা ঝকঝকে কাঠের অদ্ভুত ব্যস্ততার মধ্যে রক্তক্ষরণের ফলে মস্তিষ্ক যেন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করছে। মনে হয় যেন নিজের প্রতি বিতৃষ্ণার দুঃসহ ভারে জর্জরিত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মৃদু যাতনায় একঘেয়েমি ঘুরপাক খাচ্ছে ত খাচ্ছেই এবং হাজার হাজার বৈচিত্র্যহীন কালো কালো লোককে তার বিষাদগ্রস্ত নৃত্যে আকর্ষণ করছে, বাতাস যেমন রাস্তার আবর্জনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তেমনি ভাবে ঝেঁটিয়ে তাদের অক্ষম স্তূপে পরিণত করছে, ফের ছড়িয়ে দিচ্ছে, ফের ঝাঁট দিচ্ছে।...

দালানের ভেতরেও মানুষের জন্য আছে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, তবে সেগুলো গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, মানুষকে শিক্ষা দান করে। নরকপুরী, সে-খানকার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা সেই সঙ্গে মানুষের জন্য সৃষ্ট আইনকানুনের অলঙ্ঘনীয়তা যারা মানে না তাদের ওপর যত রকমের নির্যাতন হতে পারে... সে সব এখানে মানুষকে দেখানো হয়ে থাকে।

নরক তৈরী হয়েছে গাঢ় লাল রঙ করা কাগজের মণ্ড দিয়ে, তার ভেতরটা আগাগোড়া অগ্নিনিরোধক কোন এক পদার্থে এবং চর্বিজাতীয় কোন কিছুর ভারী ও পচা গন্ধে ছেয়ে আছে। নরক তৈরি করা হয়েছে খুব খারাপ ভাবে, এত খারাপ ভাবে যে অতি অল্পে তুষ্ট লোকের মনেও বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। তাকে দেখানো হচ্ছে একটা গুহার আকারে — মৃদু লাল আলো-অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভেতরে বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রাজ্যের শিলাখণ্ড। একটা শিলাখণ্ডের ওপর লাল রঙের আঁটো পোশাক পরে বসে আছে শয়তান, সে তার পাটকিলে রঙের শীর্ণকায় মুখ বিচিত্ররকমের যত ভঙ্গিতে খিঁচিয়ে বিকৃত করে তুলছে, কোন লোক লাভজনক কোন কাজ সারার পর যেমন হাতে হাত ঘষে সেই ভাবে হাতে হাত ঘষছে। বসে থাকাটা তার পক্ষে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর — কাগজের

শিলাখণ্ড খচমচ করছে, দুলছে; কিন্তু সে যেন এসব লক্ষই করছে না — নীচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশ করে দেখছে কী ভাবে তার বাঁকা বাঁকা পায়ের কাছে তার অনুচরেরা পাপীদের শাস্তি বিধান করছে।

এই যে এক তরুণী নতুন একটা টুপি কিনেছে, দর্পণে নিজেকে দেখছে, দেখে তারিফ করছে, খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠছে। কিন্তু শয়তানের ছোটখাটো একজোড়া চর — দেখেশুনে যাদের দস্তুরমতো ক্ষুধার্ত বলেই মনে হয় — পেছন থেকে নিঃশব্দে গুড়ি মেরে তার দিকে এগিয়ে আসে, তারা খপ করে দু'দিক থেকে তার দুই বগল চেপে ধরে, সে হাউমাউ করে ওঠে — কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। শয়তানের চরেরা তাকে একটা লম্বা সমতল সংকীর্ণ ঢালু পথে রেখে দেয় — পথটা সোজা গড়গড় করে নেমে গেছে গুহার মাঝখানের একটা গর্তে; গর্তের ভেতর থেকে ধূসর রঙের ভাপ উঠছে, লকলক করে ওপরে উঠছে লাল রঙের কাগজে তৈরি আগুনের জিহ্বা, আয়না আর টুপি সমেত মেয়েটি ঢালু পথের ওপর দিয়ে চিত হয়ে সরসর করে নেমে গেল এই গর্তটার মধ্যে।

অল্প বয়সী এক ছোকরা এক গেলাস মদ পান করেছে — শয়তানের চরেরা তৎক্ষণাৎ তাকেও ছেড়ে দিল সেখানে — মঞ্চের নীচের গর্তটার ভেতরে।

নরকে গুমোট, শয়তানের চরেরা খুদে খুদে, ক্ষীণজীবী; দেখেশুনে মনে হয় তারা কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজের একঘেয়েমি ও প্রত্যক্ষ নিষ্ফলতার কথা ভেবে তারা বিরক্তি বোধ করে, তাই আনুষ্ঠানিকতার কোন বালাই না রেখে তারা পাপীদের লাকড়ির মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঢালু জায়গাটার ভেতরে। ওদের দিকে তাকালে মনে হয় চিৎকার করে বলি: 'যথেষ্ট হয়েছে! আর নয় এই মূর্খামি! ধর্মঘট কর এবারে সবাই মিলে!...'

একটা মেয়ে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মনিব্যাগ থেকে কয়েকটা মুদ্রা চুরি করল — আর যাবে কোথায়? — সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের চরেরা তার শাস্তিবিধান করল। শয়তান তাতে সন্তুষ্ট, মহা আনন্দে সে পা দোলায় আর খোনা খোনা সুরে হাসে। শয়তানের চরেরা ক্রুদ্ধ হয়ে আড়চোখে নিষ্কর্মার দিকে তাকাচ্ছে আর কাজে কিংবা নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যারাই দৈবাৎ নরকে এসে পড়ছে কোন রকম বাছবিচার না করে রাগে গরগর করতে করতে তাদের সবাইকে জ্বলন্ত আগুনের মুখ-গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।...

জনসাধারণ গম্ভীর হয়ে নীরবে এই সব রোমহর্ষক দৃশ্য দেখছে। হলঘরের ভেতরে অন্ধকার। মাথার চুল কোঁকড়া, ভারী কোট গায়ে এক স্বাস্থ্যবান ছোকরা মঞ্চের দিকে হাত দিয়ে দেখাতে দেখাতে বিষণ্ণ ভারী গলায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

সে তার বক্তৃতায় জোর দিয়ে যে কথা বলছে তা হল এই যে লোকে যদি লাল রঙের আঁটোসাটো পোশাক পরা, বাঁকা-পা শয়তানের শিকার হতে না চায় তাহলে তাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে কোন মেয়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হয়ে তাকে চুম্বন করা অনুচিত, কেননা সেই মেয়ে পরে বারাঙ্গনায় পরিণত হতে পারে; গির্জার অনুমতি ছাড়া কোন যুবককে চুম্বন করা উচিত নয়, যেহেতু তার ফলে বালক-বালিকার জন্ম হতে পারে; বারাঙ্গনার উচিত নয় তার অতিথির পকেট কাটা; মানুষের ভাবাবেগ উদ্রিক্ত করে এমন কোন তরল পদার্থ বা সুরা কোন মানুষের আদৌ পান করা উচিত নয়; শুঁড়িখানায় না গিয়ে লোকের যাওয়া উচিত গির্জায় -- গির্জা মানুষের আত্মার পক্ষে বেশি উপকারী, আর এতে খরচও অনেক কম।...

লোকটা একঘেয়ে এক সুরে কথা বলে চলেছে — দেখেশুনে মনে হয় তাকে যে ধরনের জীবন যাপনের কথা প্রচার করতে বলা হয়েছে তাতে তার নিজেরই যেন বিশ্বাস নেই।

পাপীদের সংশোধনের জন্য এই সব আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা যারা করেছে সেই মালিকদের উদ্দেশে আপনা থেকে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়: 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নীতি, অন্ততপক্ষে ক্যাস্টর অয়েলের মতো কার্যোপযোগী হয়েও, যাতে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, এটা যদি আপনারা চান তাহলে নীতি প্রচারককে আরও বেশি টাকা দেওয়া উচিত।'

এই ভয়াবহ ইতিবৃত্তের পরিশেষে গুহার এক কোনা থেকে বেরিয়ে আসে সুন্দর এক দেবদূত, তবে তাকে দেখলে রীতিমতো বিতৃষ্ণারই উদ্রেক হয়। দেবদূত একটা তারে ঝুলছে, দাঁতের ফাঁকে সোনালি রাংতায় মোড়া কাঠের বাঁশি চেপে ধরে শূন্যে গুহার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। শয়তান তাকে দেখতে পেয়ে পাপীদের পেছন পেছন টুপ করে গর্তের ভেতরে ডুব দিল, একটা খচমচ আওয়াজ উঠল, কাগজের শিলাখণ্ডগুলি একটা আরেকটার গায়ে এসে পড়ল, শয়তানের চরেরা কাজ থেকে রেহাই পেয়ে মহা আনন্দে বিশ্রাম করতে ছুটল — যবনিকা নেমে এলো। জনসাধারণ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে, প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে যেতে

থাকে। কেউ কেউ সাহস করে হাসে, বেশির ভাগ লোক একাগ্র। হয়ত তারা ভাবছে: 'নরক যদি এত ভয়াবহ হয়, তাহলে পাপ করা হয়ত ঠিক হবে না।'

লোকে আরও এগিয়ে চলে। পরের দালানে তাদের দেখানো হচ্ছে 'পরলোক'। এটা একটা বড় কারবার, এটাও কাগজের মন্ড জমিয়ে তৈরি. খনির গর্ভের মতো এর আকার — ভেতরে বিশ্রী রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃত আত্মারা। তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ইশারা করা যায়, কিন্তু তাদের চিমটি কাটার কোন উপায় নেই -- এটা ঘটনা। ভূগর্ভের গোলকধাঁধার আধা অন্ধকারের মধ্যে, ভিজে-ভিজে বাতাসের শীতল প্রবাহে স্যাঁতসেঁতে, খরখরে দেয়ালের মাঝখানে থাকতে তাদের নিশ্চয়ই বড় একঘেয়ে লাগে। কোন কোন আত্মা বিশ্রী ভাবে কাশছে, কেউ কেউ চুপচাপ তামাক চিবুতে চিবুতে মাটিতে হলুদরঙের পিক ফেলছে। একটা আত্মা আবার দেয়ালের এক কোনায় হেলান দিয়ে চুরুট ফুঁকছে।

তাদের পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলে তারা নিষ্প্রভ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে, শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঠান্ডায় হি-হি করতে করতে তাদের পরপারের জীর্ণ বসনের ধূসর ভাঁজের মধ্যে হাত লুকোচ্ছে। এরা, এই হতভাগ্য আত্মাগুলি ক্ষুধার্ত, এদের অনেকে সম্ভবত বাতব্যাধিতে ভুগছে। জনসাধারণ নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখছে, স্যাঁতসেঁতে বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে একটা হতাশ ব্যাকুলতায় তাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, আর তার ফলে, কোন রকমে ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকা কয়লার ওপর নোংরা ভিজে নেকড়া ছুঁড়ে দিলে যা হয় সেই ভাবে মানুষের চিন্তাভাবনাও নিভে যাচ্ছে।...

আরও একটি দালানের ভেতরে পরম উৎসাহভরে দেখানো হচ্ছে 'মহাপ্লাবন'। 'মহাপ্লাবন' যে মানুষের পাপের শাস্তিবিধানের জন্য সংঘটিত একথা সর্বজন-বিদিত।...

বস্তুতপক্ষে, এই শহরের সমস্ত সাজানো দৃশ্যের উদ্দেশ্য একটিই — মৃত্যুর পর লোকে তাদের পাপের কী দন্ড পাবে এবং কী ভাবে সেই দন্ড কার্যকরী হবে, তারা যাতে শান্ত ভাবে নতশিরে আইনকানুন মেনে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়া।...

সর্বত্র সেই এক অনুশাসন: 'কদাচ করিবে না! কদাচ করিবে না!' — যেহেতু দর্শকসাধারণের অধিকাংশই হল শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন।

কিন্তু টাকাকড়ি উপার্জন করতেই হবে, তাই পৃথিবীর আর দশটা জায়গার মতো এই আলোকিত পুরীর নির্জন আনাচে-কানাচে ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারকে নিয়ে উপেক্ষাভরে হাসে ব্যাভিচার। এটা অবশ্য প্রচ্ছন্ন, এবং বলাই বাহুল্য, একঘেয়েও বটে, যেহেতু এও 'জনগণের জন্য'। একটা ফলাও কারবারের মতো, মানুষের পকেট কেটে তার উপার্জনের টাকা বার করে আনার উপায় হিশেবে এই ব্যবস্থার উদ্ভব; স্বর্ণের জন্য লালসায় পরিষিক্ত ঝলমলে একঘেয়েমির এই জলকাদার মধ্যে তা তিনগুণ বিশ্রী ও ন্যক্কারজনক।...

মানুষ এই খেয়ে বেঁচে থাকে।...

...উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বাড়িঘরের দুই সারির মাঝখান দিয়ে তাদের ঘন প্রবাহ বয়ে চলেছে, বাড়িঘর ক্ষুধার্ত হাঁ মেলে তাদের গিলে ফেলছে। ডান দিকে তাকে অনন্ত যন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিয়ে বলা হচ্ছে: 'পাপে লিপ্ত হইও না! ইহা বিপজ্জনক!'

বাঁ দিকে, প্রশস্ত নৃত্যকক্ষে মেঝের ওপর মহিলারা ধীরে ধীরে ঘুরপাক খাচ্ছে — এখানকার সব কিছু যেন বলছে: 'পাপে লিপ্ত হও! ইহা প্রীতিকর!'

আলোকের দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার ফলে, শস্তা অথচ ঝলমলে জাঁকজমকে প্রলুব্ধ হয়ে, কোলাহলেমত্ত মানুষ ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মৃদুমন্দ নৃত্যের তালে তালে ঘুরপাক খেতে খেতে সোৎসাহে অন্ধের মতো চলে বাঁ দিকে — পাপের সন্নিধানে — এবং ডান দিকে — সেই সব ঘরবাড়িতে, যেখানে তার জন্য প্রচারিত হচ্ছে করুণার বাণী।

এই অনিচ্ছাকৃত গমনাগমন একই রকম ভাবে মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেয়, নীতির ব্যাপারী আর ভ্রষ্টাচারের কারবারী দুয়ের কাছেই তা সমান উপকারী।

জীবন এই ভাবে সুব্যবস্থিত যাতে লোকে ছয় দিন কাজ করে আর সপ্তম দিনে পাপে লিপ্ত হয় — নিজেদের পাপের জন্য মূল্য দেয়, পাপ স্বীকার করে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য দক্ষিণা দেয় — এর বেশি কিছু নয়।

হাজার হাজার ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো হিসহিস করছে আলো, কালো কালো মাছির ঝাঁকের মতো গুনগুন করছে অসহায়, হতাশ মানুষের দল, দালানের ভেতরকার সূক্ষ্ম ঝলমলে জালে জড়িয়ে পড়ে তারা ধীরে ধীরে

এপাশ-ওপাশ ঘুরছে। ধীরেসুস্থে, নিখুঁত কামানো মুখে হাসির রেখা না টেনে আলস্যভরে তারা প্রতিটি দরজার ভেতরে প্রবেশ করছে, পশুদের খাঁচার সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খইনি চিবোচ্ছে, পিক ফেলছে।

বিশাল এক খাঁচার ভেতরে একজন লোক রিভলভারের গুলি ছুঁড়ে এবং লিকলিকে চাবুকের নির্মম আঘাত করে কতকগুলো রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চোখ ধাঁধানো আলো আর কান ফাটানো বাজনা ও গুলির আওয়াজে দিশেহারা, আতঙ্কে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য সুন্দর চেহারার এই জন্তুগুলো লোহার গরাদের মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ছটফট করছে, গর্জন করছে, ঘরঘর আওয়াজ করছে, তাদের সবুজ চোখগুলো ঝকঝক করছে, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, ক্রোধে উন্মত্ত হওয়ার ফলে তাদের কষের দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, তারা ভয়ংকর ভাবে কখনও এ-থাবা কখনও ও-থাবা শূন্যে ছুঁড়ছে। কিন্তু লোকটা সরাসরি তাদের চোখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে; ফাঁকা গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ আর কশাঘাতের তীব্র যন্ত্রণা পশুর শক্তিশালী, নমনীয় শরীরকে খাঁচার এক কোনায় ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। প্রচণ্ড ক্রোধে বিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে, শক্তিমানের তীব্র রোষ হেতু আকুলি-বিকুলি করতে করতে, অপমানের জ্বালায় ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বন্দী পশু মুহূর্তের জন্য খাঁচার কোনায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, ক্ষিপ্ত চোখ মেলে দেখে, সর্পাকার লেজটা উত্তেজিত ভাবে নাড়াতে নাড়াতে চোখ মেলে দেখে আর দেখে।...

তার স্থিতিস্থাপক শরীর কুঁকড়ে গিয়ে একটা শক্ত মাংসপেশীর ডেলায় পরিণত হয়, থরথর করে কাঁপতে থাকে, চাবুক হাতে লোকটার মাংসের ভেতরে নখর বসিয়ে দেবার জন্য, তাকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য, বিনাশ করার জন্য সে শূন্যে লম্ফত্যাগের প্রস্তুতি নেয়।

স্প্রিংয়ের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে তার পেছনের দুই পা, সামনের দিকে গলা বেরিয়ে আসে, চোখের সবুজ তারায় দপ্ করে জ্বলে ওঠে আনন্দের রক্তিম স্ফুলিঙ্গ।

খাঁচার গরাদের বাইরে মিলেমিশে একাকার অনুজ্জ্বল তামার ধেবড়া দাগের মতো বৈচিত্র্যহীন পীতবর্ণের মুখগুলির নিষ্প্রভ, নিরুত্তাপ উৎসুক দৃষ্টি শত শত ভোঁতা ছুঁচ হয়ে সেই চোখের তারা বিদ্ধ করছে।

জনতার মুখে মৃত্যুর ভয়াবহ স্থিরতা — তারা অপেক্ষা করে, তারাও

রক্ত চায়, অপেক্ষা করে তার জন্য; কিন্তু তাদের এই প্রতীক্ষা প্রতিহিংসাবশত নয় — দীর্ঘকালের পোষমানা এক জন্তুর মতো, কৌতূহল থেকে।

বাঘটা দুই কাঁধের ভেতরে মাথাটা টেনে নেয়, ব্যাকুল ভাবে চোখ বিস্ফারিত করে, একটা ঢেউ খেলিয়ে মৃদু গতিতে গোটা শরীরটা পেছনে সরিয়ে আনে — দেখে মনে হয় যেন তার প্রতিহিংসার জ্বালা-ধরা গাত্রচর্মের ওপর অকস্মাৎ কেউ হিমশীতল ধারা ঢেলে দিয়েছে।

লোকটা গুলি ছুঁড়ছে, সপাং সপাং চাবুক আছড়াচ্ছে, উন্মত্তের মতো ভয়ংকর চিৎকার করছে — চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে সে যা লুকানোর চেষ্টা করছে তা হল জন্তুটার সামনে তার নিদারুণ ভীতি আর সেই সঙ্গে মানুষ নামে যে জীব নিশ্চিন্ত মনে মানুষের লম্ফঝম্প উপভোগ করছে এবং উদ্বেগভরে জন্তুটার সর্বনাশা লম্ফত্যাগের প্রতীক্ষা করছে, তার মন যোগাতে না পারায় দাসমনোভাবাপন্ন শংকা। সেই জীবটি প্রতীক্ষা করছে — মনে মনে সচেতন না হলেও প্রতীক্ষা করছে, তার ভেতরে ভেতরে জেগে উঠেছে, নিশ্বাস নিচ্ছে এক আদিম প্রবৃত্তি — সেই প্রবৃত্তি যুদ্ধের দাবি করছে। যখন দুটো শরীর পরস্পরকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোবে, খাঁচার মেঝের ওপর ছিটকে ছিটকে পড়বে ছিন্নভিন্ন নরমাংসের ধূমায়মান টুকরো, যখন গর্জনে আর আর্তনাদে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠবে, তখন মনের গহনে একটা মধুর চমকের সুখ সে উপভোগ করতে চায়।

কিন্তু এই জীবটির মস্তিষ্ক ইতিমধ্যেই বহুরকমের বিধিনিষেধ ও আশংকার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। রক্তের জন্য বাসনা থাকলে কী হবে, এই জনমণ্ডলীর মনের মধ্যে ভয় আছে, সে যেমন রক্ত চায়, তেমনি আবার চায়ও না, এবং মনের ভেতরে নিজের সঙ্গে নিজের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে সে উপভোগ করে এক তীব্র সুখ — বেঁচে থাকার সুখ।

লোকটা সব জন্তুজানোয়ারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, বাঘেরা তাদের নরম পায়ে দুদ্দাড় করে খাঁচার গভীরে কোথায় যেন পালিয়ে গেল; এদিকে লোকটা আজকের মতো যে বেঁচে গেল এই ভেবে তৃপ্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে, ঠোঁটের কাঁপুনি গোপন করার চেষ্টায় পাণ্ডুর ঠোঁটে মৃদু হাসি হাসে, জনতার তামাটে মুখের দিকে ফিরে মাথা নোয়ায়, যেন কোন দেবমূর্তিকে প্রণাম করছে।

জনতা হৈ-হৈ করে উঠল, হাততালি দিল, কালো কালো টুকরোয় ভেঙে

ছড়িয়ে পড়ল, তার চারধারের একঘেয়েমির চটচটে জলকাদার ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে চলল।

পশুর সঙ্গে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্য উপভোগ করার পর মানুষ-জন্তুর দল মজাদার আরও কিছুর সন্ধানে ফেরে। এই ত — সার্কাস। সার্কাসের বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে কে একটা লোক লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙ দিয়ে দুটো বাচ্চাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বাচ্চাদুটো একজোড়া ডানা ভাঙা সাদা পায়রার মতো লোকটার মাথার ওপরে ঝলক দিচ্ছে; কখন কখন তারা ওর পা ফসকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, তাদের মালিকের কিংবা তাদের বাবার চিত হয়ে পড়ে-থাকা লাল টকটকে মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে, ফের শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের চারপাশে ভিড় করে আছে জনতা। তারা তাকিয়ে দেখছে। বাচ্চাদের একজন কেউ যখন ওস্তাদের পা ফসকে পড়ে যাচ্ছে তখন সবগুলি মুখের ওপর এমন চাঞ্চল্য ও শিহরণ খেলে যায় যে মনে হয় নোংরা ডোবার বদ্ধ জলের বুকে বাতাস যেন মৃদু তরঙ্গ তুলেছে।

আকাশ-বাতাস খানখান করে গমগম শব্দে বাজনা বেজে চলেছে। বাজিয়েদের দলটা বাজে, বাজিয়েরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তূরীর আওয়াজ অসংলগ্ন ভাবে ছটফট করে বেড়াচ্ছে, যেন খোঁড়াচ্ছে, স্বচ্ছন্দ শৃঙ্খলা বজায় রাখা সুরের পক্ষে অসম্ভব, সুরগুলি একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে, পাল্লায় হারিয়ে দিয়ে, উলটে ফেলে দিয়ে সারি ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। কেন কে জানে, প্রতিটি পৃথক পৃথক ধ্বনি কল্পনায় এককেটি টিনের টুকরো হয়ে ফুটে উঠছে, মানুষের মুখাবয়বের সঙ্গে সেগুলোর কেমন যেন মিল আছে -- ঠোঁট, চোখ আর নাকের ফুটো কেটে বানানো হয়েছে, বসানো হয়েছে লম্বা লম্বা সাদা কান। বাজিয়েদের মাথার ওপর যে লোকটা ছড়ি ঘোরাচ্ছে, কিন্তু যার দিকে ওরা ফিরেও তাকাচ্ছে না, সে এই টুকরোগুলোর হাতার মতো কান পাকড়ে ধরে তাদের তুলে ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে অদৃশ্য করে দিচ্ছে। সেগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুকি লাগছে, তাদের মুখের ফোকরে হাওয়া ঢুকে শিস বেজে উঠছে, তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এমন এক বাজনা যে সার্কাসের অশ্বারোহীদের যে-ঘোড়াগুলো সব ব্যাপারে অভ্যস্ত, তারা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে দূরে সরে থাকে, বিরক্তির সঙ্গে খাড়া খাড়া কান নাড়তে থাকে -- দেখে মনে হয় যেন কানের ভেতর থেকে তীক্ষ্ন হুল ফোটানো ক্যানেস্তারার আওয়াজ ঝেড়ে ফেলতে চায়।...

ক্রীতদাসদের আমোদ-প্রমোদের জন্য ভিখারীদের এই যে বাজনা, তা থেকে উদ্ভট উদ্ভট কল্পনার জন্ম হয়। ইচ্ছে করে বাজিয়ের হাত থেকে সব

চেয়ে বড় পেতলের তূরীটা ছিনিয়ে নিয়ে বুকের সমস্ত জোর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফুঁ দিয়ে তাতে এত জোরাল ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলি যে সেই উন্মত্ত ধ্বনির তাড়নায় আতঙ্কিত হয়ে সকলে বন্দীদশা থেকে ইতস্তত ছুটে পালায়।...

অর্কেস্ট্রার অদূরে ভালুকের খাঁচা। একটা ভালুক মোটা, ধূসর-বাদামী রঙের, কুতকুতে ধূর্ত-ধূর্ত চোখ — খাঁচার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমান তালে মাথা নাড়িয়ে চলছে। সম্ভবত সে ভাবছে: 'ব্যাপারটা যুক্তিসঙ্গত বলে একমাত্র তখনই মেনে নেওয়া যেতে পারে যদি কেউ আমাকে প্রমাণ করে দিতে পারে যে এখানকার সব ব্যবস্থা হয়েছে ইচ্ছে করে, মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্য, তার কানে তালা ধরানোর জন্য, তার বিকৃতিসাধনের জন্য। সেক্ষেত্রে অবশ্যই উদ্দেশ্য উপায়ের সার্থকতা প্রতিপাদন করে। কিন্তু লোকে যদি মনেপ্রাণে এটাই ভাবে যে এগুলো মজার ব্যাপার, তাহলে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমি আর কোন আস্থা পোষণ করতে পারি না।'

অন্য দুটি ভালুক একটা আরেকটার মুখোমুখি বসে আছে — যেন দাবা খেলছে। আরও একটা ভালুক চিন্তিত ভাবে খাঁচার এক কোনায় খড় তুলে গাদা করছে, তার থাবার কালো কালো নখ খাঁচার গরাদে বেধে যাচ্ছে। তার মুখে একটা শান্ত হালছাড়া ভাব। মনে হয় এই জীবন থেকে তার কোন প্রত্যাশা নেই, পারলে সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।...

জন্তুজানোয়ার তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করে — লোকের নিষ্প্রভ জলো দৃষ্টি সর্বক্ষণ তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে — যেন সিংহ আর চিতাবাঘের সুন্দর শরীরের স্বচ্ছন্দ ও তেজোদৃপ্ত চলাফেরার মধ্যে তারা বহুকাল ভুলে যাওয়া কী একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা গরাদের ভেতর দিয়ে লাঠি গলিয়ে দিয়ে কী হয় পরখ করে দেখার জন্য চুপচাপ জন্তুজানোয়ারদের পেটে বা পাঁজরে খোঁচা মেরে চলেছে।

যে সমস্ত জন্তুর এখনও মানবচরিত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটে নি, তারা ওদের ওপর খেপে যায়, থাবা দিয়ে খাঁচার গরাদের ওপর ঘা মারে, প্রচণ্ড ক্রোধে তাদের চোয়াল থরথর করে কাঁপতে থাকে, তারা মুখ হাঁ করে গর্জন করতে থাকে। এটা জনতার ভালো লাগে। লোহার গরাদ পশুদের আঘাত থেকে তাদের রক্ষা করছে বলে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত লোকেরা নিশ্চিন্ত মনে আরক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তিভরে হাসে। অধিকাংশ পশুই কিন্তু লোকের এই ব্যবহারের কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। লাঠির ঘা খেয়ে কিংবা লোকজন তাদের দিকে থুতু ফেললে তারা ধীরে

ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে যে অপমান করেছে তার দিকে ফিরেও না তাকিয়ে খাঁচার দূরপ্রান্তে, এক কোনায় সরে যায়। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে বাঘ সিংহ ও চিতাবাঘের সুন্দর সুন্দর তেজীয়ান শরীর, অন্ধকারে লোকের প্রতি ঘৃণায় ধকধক করে জ্বলছে তাদের চোখের গোল গোল তারা।

লোকে আরও একবার তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই বলতে বলতে সেখান থেকে সরে যায় যে জানোয়ারটা একঘেয়ে ধরনের।

মস্ত হাঁ-করা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরের ভেতর থেকে দাঁতের পাটির মতো সারি সারি চেয়ারের পিঠ বেরিয়ে আছে, গহ্বরটার অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথের ধারে বাজিয়ের দল মরিয়া হয়ে প্রাণপণে বাজনা বাজিয়ে চলেছে -- তাদের সামনে একটা খুঁটি গাড়া, খুঁটিতে সরু শেকলে বাঁধা দুটি বানর — মা-বানর আর তার বাচ্চা। বাচ্চাটা তার লম্বা লম্বা সরু দুই হাতের খুদে খুদে আঙুল দিয়ে মা'র পিঠ আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে বুকের সঙ্গে লেপটে আছে; মা এক হাতে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে, তার অন্য হাতটা সে সন্তর্পণে সামনে প্রসারিত করে রেখেছে --- সে হাতের আঙুলগুলো স্নায়বিক উত্তেজনায় বেঁকে আছে — দরকার হলে আঁচড় দিতে বা ঘা মারার জন্য প্রস্তুত। মা'র চোখদুটো প্রবল উত্তেজনায় বিস্ফারিত, সে চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে একটা অক্ষম হতাশা, প্রতিকারহীন অপমানের তীব্র জ্বালা, একটা অবসাদগ্রস্ত ক্রোধ ও ব্যাকুলতা। বাচ্চাটা তার একটা গাল মা'র বুকে চেপে ধরে আড়চোখে, হিমশীতল আতঙ্কের দৃষ্টিতে লোকজনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে -- সম্ভবত জীবনের প্রথম দিন থেকেই সে আতঙ্কের সঙ্গে পরিচিত, আতঙ্ক তার হৃদয় পরিপূর্ণ, আতঙ্ক তার মনের মধ্যে হিম হয়ে জমে আছে জীবনের বাদবাকি দিনগুলির জন্য। খুদে খুদে সাদা দাঁত বার করে মুখ খিঁচিয়ে আছে বাচ্চার মা, যে হাত দিয়ে সে তার বড় আদরের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আছে, এক মুহূর্তের জন্যও সেটাকে সরাচ্ছে না; আবার দর্শকরা যন্ত্রণা দেবার জন্য তার দিকে লাঠি ও ছাতা বাড়িয়ে দিলে অন্য হাতে অবিরাম তা ঠেকিয়ে যাচ্ছে।

তারা - এই সাদা চামড়ার অসভ্যেরা, ধুচনি টুপি আর পালকগোঁজা টুপি মাথায় এই স্ত্রী-পুরুষেরা -- সংখ্যায় অনেক। ছোট শিশুর খুদে শরীরকে মা-বানর কেমন কৌশলে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে এই দৃশ্য দেখে তারা সবাই ভয়ঙ্কর মজা পায়।

বানরটা যে-কোন মুহূর্তে দর্শকদের পায়ের তলায় পড়ার ঝুঁকি নিয়ে থালার আকারের একটা গোল চেপটা চাকার ওপর দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে তার বাচ্চার গায়ে লাগার মতো যা যা চোখের সামনে পড়ছে সব অক্লান্ত ভাবে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সময়মতো আঘাত ঠেকাতে না পেরে করুণ বিলাপ করছে। তার হাতটা চাবুকের মতো সবেগে দোল খাচ্ছে, কিন্তু দর্শকরা সংখ্যায় এত বেশি, আর প্রত্যেকেরই ঘা মারার ইচ্ছে, বানরটার লেজ বা গলার শিকল ধরে টান মারার ইচ্ছে এত প্রবল যে সে তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। তার চোখ এমন ভাবে পিটপিট করতে থাকে যে দেখলে মায়া হয়, দুঃখে যন্ত্রণায় তার মুখের চারপাশে সূক্ষ্ম কুঞ্চনরেখা জমা হচ্ছে।

বাচ্চাটা দু'হাতে মা'র বুক চেপে ধরেছে, সে এত শক্ত করে মাকে আঁকড়ে ধরে আছে যে মা'র নরম লোমের মধ্যে তার আঙুল প্রায় চোখে পড়ে না। যাদের সামনে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং যারা তার এই আতঙ্ক দেখে অল্পস্বল্প তৃপ্তি পাচ্ছে সেই লোকজনের নিষ্প্রভ চোখের দিকে, তাদের মুখের একাকার হলুদ হলুদ ছোপগুলোর দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

থেকে থেকে বাজিয়েদের কেউ কেউ বানরের দিকে তাক করে তার তুরীর অর্থহীন কাংস্যধ্বনি ছাড়ে, তার ওপর বর্ষণ করে কর্কশ আওয়াজের বন্যা — সে জড়সড় হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বাজিয়ের দিকে চায়।

জনতা হাসতে থাকে, অনুমোদনের ভঙ্গিতে বাজিয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। বাজিয়েও সন্তুষ্ট হয়ে এক মিনিট বাদে আবার তার চাল খাটায়।

দর্শকদের মধ্যে মহিলারাও আছে; তাদের কেউ কেউ নিঃসন্দেহে সন্তানের জননী। কিন্তু কেউ এই নিষ্ঠুর কৌতুকের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করে না। সবাই এতে খুশি।...

যে রকম উত্তেজনাভরে একজন জননীর যন্ত্রণা আর শিশুর নিদারুণ আতঙ্ক লোকে উপভোগ করছে, তাতে মনে হয় কোন কোন চোখজোড়া এই বুঝি ফেটে পড়ল।

বাজিয়েদের দলটার পাশে হাতির খাঁচা। এই প্রৌঢ় মহাশয়টির মাথার চামড়া ঘষা খেয়ে উঠে গেছে, চকচক করছে। খাঁচার গরাদের ভেতর থেকে শুঁড় বার করে দিয়ে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে নাচাতে নাচাতে ইনি জনতার গতিবিধি লক্ষ করছেন। এক প্রসন্নমতি, বিচক্ষণ প্রাণীর মতো মনে মনে ভাবছেন: 'এই যে ইতরগুলো তাদের একঘেয়েমির নোংরা ঝাঁটা নিয়ে

এখানে ঝেঁটিয়ে এসেছে এরা যে এদের নিজেদের পয়গম্বরদেরও উপহাস করতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই — অন্তত এমন কথা আমি বয়োবৃদ্ধ হস্তীদের কাছে শুনেছি। কিন্তু তা হলেও বানরটার জন্য আমার দুঃখ হয়। আমি এও শুনেছি যে মানুষ শেয়াল আর হায়নার মতো সময় সময় পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরোও করে, কিন্তু হায়, তাতে বানরের আর কি সুবিধে হচ্ছে!'

নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে না পারার যে-দুঃখ অসহায় জননীর চোখের তারায় কাঁপছে সে দিকে দৃষ্টিপাত করলে, মানুষের প্রতি একটা গভীর শীতল আতঙ্কে আড়ষ্ট শিশুর জমাট দৃষ্টির দিকে তাকালে, একটা জীবন্ত প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে যারা আমোদ পেতে পারে, সেই লোকগুলোর দিকে তাকালে বানরটাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে এই কথাই বলতে হয়: 'হে প্রাণী, ওদের ক্ষমা করো! এক সময় ওদের সুমতি হবে।...'

বলাই বাহুল্য এটা হাস্যকর, মূর্খের প্রলাপ। নিষ্ফলও বটে। এমন কোন্ মা আছে যে তার সন্তানের ওপর পীড়নকে ক্ষমার চোখে দেখতে পারে? আমার মনে হয় কুকুরদের মধ্যেও নেই।...

কেবল শুয়োররাই হয়ত...

হ্যাঁ...

যা হোক, এই ভাবে যখন রাত নেমে আসে, সাগরবেলায় অকস্মাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে এক স্বচ্ছ মায়াপুরী — আগাগোড়া আলোয় ঝলমলে। নৈশ আকাশের অন্ধকার পটভূমিকায় সে পুরী অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকে — কিন্তু পুড়ে খাক হয় না — মহাসাগরের তরঙ্গমালার সুবিস্তৃত ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে তার রূপের ছায়া পড়ে।

তার স্বচ্ছ দালানকোঠার ঝলমলে সূক্ষ্ম জালের মধ্যে, ভিখারীর ছিন্ন বস্ত্রের ভেতরকার উকুনের মতো বেজার হয়ে ঘুরঘুর করছে হাজার হাজার ধূসর মানুষ — নিষ্প্রভ, বিবর্ণ তাদের চোখ।

যারা লোভী, যারা ইতর, তারা তাদের মিথ্যাচারের ঘৃণ্য নগ্ন রূপ, তাদের শঠতার অকপট চেহারা, নিজেদের ভণ্ডামি, অতৃপ্ত শক্তি ও লালসা লোকের সামনে তুলে ধরে। মৃত আলোকের নিরুত্তাপ ঝলকে বুদ্ধির দারিদ্র্য সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়ছে, মহা সমারোহে দ্যুতি বিস্তার করতে করতে চারপাশের সব কিছুর ওপর তার ছাপ ফেলছে।...

কিন্তু লোকের চোখ এমন নিখুঁত ভাবে ধাঁধিয়ে গেছে যে তারা পরম

আনন্দে, নীরবে পান করে চলেছে সেই ভয়ানক বিষ, তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে তাদের অন্তরাত্মা।

আলস্যবিজড়িত নৃত্যের তালে তালে মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরপাক খেতে খেতে নিজের অক্ষমতাজনিত যাতনায় ধুঁকে মরছে একঘেয়েমি।

এই আলোকোজ্জ্বল পুরীর কেবল একটিই ভালো — এখানে মূর্খতার শক্তির প্রতি ঘৃণা দিয়ে আত্মাকে সারা জীবনের মতো ভরে রাখা যায়।

১৯০৬

'মব্'

আমার ঘরের জানলা একটা চত্বরের মুখোমুখি — বস্তা থেকে গড়িয়ে পড়া আলুর মতো সারাদিন ধরে পাঁচটা রাস্তার লোকজন তার ওপর এসে ছড়িয়ে পড়ছে, তারা এসে ভিড় করছে, ছুটছে, ফের রাজপথ তাদের টেনে নিচ্ছে তার গ্রাসনালীর ভেতরে। চত্বরটা গোলাকার: কোন চাটুতে বহুকাল ধরে মাংস ভাজা সত্ত্বেও সেটাকে যদি মাজা না হয় তাহলে দেখতে যেমন হয় সেই রকম নোংরা। চারটে ট্রাম-লাইন এসে মিলিত হয়েছে এই জনাকীর্ণ বৃত্তটার ওপর, প্রায় প্রতি মিনিটে লোকে ঠাসাঠাসি ট্রামগাড়ি লাইনের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে গড়াতে গড়াতে বাঁক নেবার সময় কর্কশ আর্তনাদ তোলে। চলতে চলতে গাড়ির কামরাগুলো লোহার সশঙ্কিত ত্রস্ত ঘর্ঘর আওয়াজ তোলে, তাদের মাথার ওপরে ও চাকার তলায় বিরক্তিভরে গুঞ্জন তোলে ইলেকট্রিসিটি। ধূলিধূসরিত আকাশ-বাতাস জানলার শার্সির পীড়াদায়ক কম্পনে আর লাইনের গায়ে চাকার ঘর্ষণের তীক্ষ্ন আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠেছে। অবিরাম বিলাপ ধ্বনি তুলছে শহরের নারকীয় সঙ্গীত — চলেছে স্থূল অমার্জিত ধ্বনিতে-ধ্বনিতে নিদারুণ সংঘাত, পরস্পরকে ছুরিকাঘাত করছে, একে অন্যের শ্বাসরোধ করছে, অদ্ভুত ও নিরানন্দ কল্পনার উদ্রেক করছে।

...কেমন যেন উন্মত্ত কতকগুলি বীভৎস মূর্তির একটা ভিড় বিশাল-বিশাল চিমটে আর করাত নিয়ে এবং লোহার তৈরি যত রকমের সম্ভব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কতকগুলি কৃমিকীটের মতো থোক বেঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে উন্মত্ততাবশে নারীর দেহের ওপর অন্ধকার ঘূর্ণির মধ্যে পাক খেয়ে

চলেছে, সেই দেহকে লোলুপ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে মাটিতে, ধুলো আর কাদার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে — তার বুক ছিঁড়ে ফালা ফালা করছে, তার মাংস কেটে নিচ্ছে, রক্তপান করছে, তাকে ধর্ষণ করছে, অন্ধ হয়ে বুভুক্ষুর মতো তার জন্য, তার দেহের অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে অবিরাম কাড়াকাড়ি করছে।

কে এই নারী দেখে বোঝার উপায় নেই। লোকজনের এক বিশাল পীতবর্ণের নোংরা গাদায় সে ঢাকা পড়ে গেছে, চাপা পড়ে আছে। লোকে চারদিক থেকে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে, তাদের হাড্ডিসার শরীর দিয়ে তার সঙ্গে লেগে আছে, যেখানে যেখানে জায়গা পেয়েছে সর্বত্র ঠেকিয়ে রেখেছে তাদের লোলুপ ঠোঁট, দেহের প্রতিটি রোমকূপের ভেতর থেকে তার রস টেনে নিচ্ছে।... ক্ষুধার তাড়নায়, অক্লান্ত লালসার বশে তারা তাদের শিকারের কাছ থেকে পরস্পরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আঘাত করে, পদদলিত করে, একে অন্যের অস্থি চুরমার করে, বিনাশ সাধন করে। প্রত্যেকেই চায় যতদূর সম্ভব বেশি পেতে; পাছে কিছু না মেলে এই ভয়ে নিদারুণ ভীত হয়ে প্রবল উত্তেজনায় সকলে কাঁপতে থাকে। তারা দাঁত কড়মড় করে, তাদের হাতের মুঠোয় ধরা লোহার ঠন্‌ঠন্‌ আওয়াজ ওঠে; যন্ত্রণার কাতরানি, লোভাতুর আর্তনাদ, হতাশার চিৎকার, ক্ষুধাপীড়িত ক্রুদ্ধ গর্জন -- সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় হাজার হাজার ধর্ষণকারীর কবলে ছিন্নভিন্ন, ধর্ষিত, রাজ্যের যত রঙবেরঙের কাদায় মাখামাখি, নিহত শিকারের মৃতদেহের ওপর শোকার্ত বিলাপের মধ্যে।

আর এই ভয়ংকর বিলাপের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে এক তরঙ্গের আকার নেয় যাদের এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা ক্ষুধার তাড়নায় পড়ে পড়ে ভরাপেটের সুখের কথা ভেবে বিশ্রী ভাবে কাঁদছে সেই পরাজিতদের করুণ শোকোচ্ছ্বাস। এর জন্য সংগ্রাম করার ক্ষমতা তাদের নেই, যেহেতু তারা ভীরু ও দুর্বল।

এমনই ছবি আঁকছে নগরের সঙ্গীত।

আজ রবিবার। কাজ নেই।

অনেকের মুখের ওপর তাই হতাশাব্যঞ্জক বিমূঢ়তার ছাপ, প্রায় দুশ্চিন্তার ভাব লক্ষ করা যায়। গতকালের দিনটার একটা নির্দিষ্ট, সাধারণ অর্থ ছিল — সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কাজ করেছে। অভ্যস্ত সময়ে

ঘুম থেকে উঠে যে যার কারখানায়, অফিস-কাছারিতে গেছে, রাস্তায় বেরিয়েছে। তারা যে সমস্ত জায়গায় বসেছে কিংবা দাঁড়িয়েছে, সেগুলো তাদের অভ্যস্ত, আর সেই কারণে আরামদায়কও বটে। তারা টাকাপয়সা গুনেছে, জিনিসপত্র বিক্রি করেছে, মাটি খুঁড়েছে, কাঠ কেটেছে, ছেনি দিয়ে পাথর কেটেছে, তুরপুন চালিয়েছে, লোহা পেটাই করেছে — সারাটা দিন দু'হাতে কাজ করেছে। অভ্যাসমতো শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতে গেছে, কিন্তু আজ ঘুম ভাঙতে তারা দেখতে পাচ্ছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাদের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আলস্য, দাবি করছে তার শূন্যতা যেন কোন কিছু দিয়ে পূর্ণ করা হয়।

লোককে কাজ করতে শেখানো হয়েছে, কিন্তু কী করে জীবনযাপন করতে হয় তা শেখানো হয় নি, ফলে অবকাশযাপনের দিন তাদের কাছে দুঃসহ হয়ে দেখা দিয়েছে। নানা রকমের যন্ত্রপাতি, দেবালয়, বিশাল বিশাল জাহাজ এবং সুন্দর সুন্দর টুকিটাকি সোনার জিনিস বানাতে সম্পূর্ণ সক্ষম হাতিয়ার হলে কী হবে তারা অভ্যস্ত যান্ত্রিক কাজ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে দিনকে ভরে তোলার কথা ভাবতেও পারে না — সে ক্ষমতা তাদের নেই। যন্ত্রপাতির টুকরো-টাকরা আর অংশগুলো দিব্যি নিশ্চিন্ত — কলকারখানায়, অফিস-কাছারিতে আর দোকানপাটে তারা নিজেদের মানুষ বলে ভাবে, সেখানে তারা তাদেরই মতো নানা খণ্ডাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে এক সুগঠিত, অখণ্ড দেহযন্ত্র, যা তার স্নায়ুর সজীব রস থেকে চকিতে সৃষ্টি করে মূল্যবান বস্তু — তবে তার নিজের জন্য নয়।

সপ্তাহের ছয়টা দিন সাদামাঠা। জীবন তখন যেন একটা বিশাল যন্ত্র — সমস্ত লোক তার ছোটখাটো অংশবিশেষ; প্রত্যেকে সেই যন্ত্রের মধ্যে কার কোথায় স্থান জানে, প্রত্যেকে মনে করে যে তার ভাবলেশহীন অন্ধ, নোংরা মুখ সে চেনে, তাকে সে বুঝতে পারে। কিন্তু সপ্তম দিনেই — অবকাশযাপন ও কর্মহীন দিনটিতে — জীবন মানুষের সামনে এক অদ্ভুত খণ্ডবিচ্ছিন্ন চেহারা নিয়ে দেখা দেয়, তার মুখ ভেঙে চুরে যায়, সে তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে।...

লোকে রাস্তায় রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, শুঁড়িখানায়, পার্কে বসে থাকে, গির্জায় যায়, রাস্তার এ কোনায় ও কোনায় দাঁড়িয়ে থাকে। রোজকার মতো চলাচল আছে, কিন্তু মনে হয় এই বুঝি মিনিটখানেক কিংবা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে কোন একটা কিছু দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে — যেন জীবনে কোন একটা জিনিসের অভাব দেখা দিচ্ছে, নতুন কিছু একটা তার

মধ্যে প্রকট হওয়ার চেষ্টা করছে। কেউই তার উপলব্ধি সম্পর্কে সচেতন নয়, কেউ তা কথায় প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু অনভ্যস্ত, উদ্বেগজনক কিসের যেন একটা উপলব্ধিতে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। মাড়ি থেকে দাঁতের পাটি খসে পড়ার মতো হঠাৎ যেন জীবন থেকে খসে পড়ে গেল তার সমস্ত সহজবোধ্য ছোট ছোট চিন্তাভাবনা।

লোকে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করে, ট্রামের কামরায় চেপে বসে, কথাবার্তা বলে ; বাহ্য দৃষ্টিতে তারা সকলে নিশ্চিন্ত, সাধারণত একে অন্যকে বেশ বুঝতে পারে — রবিবার আসে বছরে বাহান্ন বার, তাদের মধ্যে আজ বহুকাল হল অভ্যেস গড়ে উঠেছে একটা রবিবারকে আরেকটার মতো করে কাটানোর। কিন্তু প্রত্যেকে মনে মনে উপলব্ধি করে যে গতকাল সে যা ছিল আজ আর তা নেই, তার বন্ধুও যেমন ছিল তেমন নেই -- ভেতরে কোথায় যেন একটা শূন্যতা কুরে কুরে খাচ্ছে, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, সম্ভবত তার ভেতর থেকে দুর্বোধ্য, অস্বস্তিকর, হয়ত বা ভয়ংকর একটা কিছু আচমকা বেরিয়ে আসবে।...

মানুষের মনের ভেতরে একটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহ উঁকি মারে, সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

লোকে নিজেদের অজানতে গায়ে গায়ে চাপাচাপি করে থাকে, তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে এককেটা দল পাকিয়ে নীরবে রাস্তার এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, চারধারের সব কিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ; ক্রমেই আরও বেশি করে জীবন্ত টুকরো-টাকরা তাদের দিকে আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের একটা অখণ্ডতা সৃষ্টির এই প্রয়াসের ফলে গড়ে ওঠে জনতা।

লোকে ধীরেসুস্থে একে অন্যের সঙ্গে এসে যুক্ত হতে থাকে। চুম্বক যেমন লৌহচূর্ণকে আকর্ষণ করে, তেমনি ওদের আকর্ষণ করে একটা গাদার মধ্যে এনে ফেলে ওদের সকলের সাধারণ উপলব্ধি — বুকের ভেতরে একটা অস্বস্তিকর শূন্যতা। বলতে গেলে কেউ কারও দিকে দৃকপাত না করে তারা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়, নড়েচড়ে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে — সঙ্গে সঙ্গে চত্বরটার এক কোনায় আকার লাভ করে অসংখ্য মুণ্ডধারী একটা কালো রঙের ভারী শরীর। থমথমে, নীরব, প্রতীক্ষারত, উত্তেজনায় পরিপূর্ণ এই শরীর প্রায় স্থির। দেহ আকার নেবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত আবির্ভাব ঘটে আত্মার, গড়ে ওঠে একটা চওড়া আকারের ম্যাড়মেড়ে

মুখ, শত শত শূন্যগর্ভ চোখে ফুটে ওঠে বিশেষ এক ভাব, সে চোখে একই দৃষ্টি ··· সন্দেহাকুল উৎসুক দৃষ্টি, যে-দৃষ্টি নিজের অজ্ঞাতসারে খুঁজছে এমন একটা কোন জিনিস যার কথা সহজাত প্রবৃত্তি জানাতে ভয় পায়।

এই ভাবে জন্মলাভ করে এক ভয়ংকর জীব, সে জীব বহন করছে একটা নিরেট নাম — 'Mob' — জনতা।

...আর দশজন লোকের মতো দেখতে নয়, সাধারণ লোকজনের চেয়ে অন্য ধরনের বেশভূষা পরেছে কিংবা অন্যদের তুলনায় বড় বেশি দ্রুত হাঁটছে এমন কোন লোক যখন রাস্তা ধরে চলতে থাকে তখন 'Mob' শত শত মাথা তার দিকে ঘুরিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে তার সর্বাঙ্গ লেহন করতে করতে তাকে অনুসরণ করে।

আর দশজনের মতো সে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নি কেন? ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এমন একটা দিনে, অন্যেরা যখন ধীর পদক্ষেপে এই রাস্তার ওপর দিয়ে চলেছে তখন এ লোকটার এত দ্রুত চলারই বা কী কারণ থাকতে পারে? অদ্ভুত কান্ড বলতে হয়।...

দুটি যুবক চলতে চলতে জোরে জোরে হাসছে। অমনি জনতার দৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠল। যেখানে সব কিছু এমন দুর্বোধ্য, যখন কোন কাজ নেই এমন যে জীবন সেখানে লোকে কী নিয়ে হাসতে পারে? এই হাসি আমোদ ফূর্তির প্রতি বিরূপ জন্তুটির মনে ঈষৎ বিরক্তির উদ্রেক করল। অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে কয়েকটা মাথা ফূর্তিবাজদের দিকে ঘুরে যায়, মুখে তারা বিড়বিড় করতে থাকে।...

কিন্তু যখন একটা খবরের কাগজওয়ালা চত্বরের ওপরে ট্রামগাড়ির কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে কায়দা করে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে আর তিন দিক থেকে ট্রামগাড়ি লোকটার দিকে ধেয়ে আসার ফলে তার চাপা পড়ার আশংকা দেখা যায় তখন 'Mob' নিজেই হাসিতে ফেটে পড়ে। মৃত্যুর আশংকা যার দেখা দিয়েছে সে-লোকটার মনের আতংক তার বোধগম্য, আর জীবনের এই রহস্যঘন ব্যস্ততার মধ্যে যা যা তার বোধগম্য তাতেই তার আনন্দ।...

এই যে মোটরগাড়ি চেপে যিনি চলেছেন সমস্ত শহরের, এমনকি গোটা দেশের লোক তাঁকে চেনে — ইনি লোকজনের ওপরওয়ালা, কর্তা। 'Mob' গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে দেখে, তার অসংখ্য চোখ

মিলেমিশে একটি রশ্মিতে পরিণত হয়ে কর্তার অস্থিসার হলুদরঙের মুখটাকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার অস্পষ্ট দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলে। বুড়ো ভালুক, বাচ্চা বয়স থেকে যে তাকে পোষ মানিয়েছে, ঠিক এই দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকায়। 'Mob' কর্তাকে বুঝতে পারে — জানে যে ইনি হলেন শক্তি। ইনি মহৎ ব্যক্তি — ইনি যাতে জীবনধারণ করতে পারেন সেজন্য কাজ করে হাজার হাজার লোক। 'Mob' তার কর্তার মধ্যে খুঁজে পায় সম্পূর্ণ স্পষ্ট একটি অর্থ — কর্তা কর্মসংস্থান করেন। কিন্তু এই যে ট্রামের কামরায় বসে আছে একটি লোক — চুল তার সাদা, মুখ থমথমে চোখে কঠিন দৃষ্টি, 'Mob' তাকেও চেনে, জানে লোকটা কে — তার সম্পর্কেই প্রায়ই কাগজে লেখা হয়, এমন কথা লেখা হয় যে সে নাকি বদ্ধ পাগল, সে চায় রাষ্ট্রের ধ্বংস, ছিনিয়ে নিতে চায় যাবতীয় কলকারখানা, রেলপথ, জাহাজ-স্টীমার — সব।... কাগজে ব্যাপারটা এক বাতুলের উদ্ভট তামাসা বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 'Mob' ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে, নিরুত্তাপ ধিক্কার আর তাচ্ছিল্যপূর্ণ কৌতূহল নিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকায়। পাগল সব সময় কৌতূহলের বিষয়।

'Mob' কেবল অনুভব করে, কেবল দেখতে পায়। কিন্তু তার মনের ওপর যে-ছাপ পড়ে তাকে সে চিন্তায় রূপ দিতে পারে না; তার আত্মা মূক, হৃদয় অন্ধ।

...লোকে হেঁটে চলেছে, একের পর এক চলছে ত চলছেই; কিন্তু কোথায়, কেন? — বোঝার উপায় নেই, মনে হয় যেন অদ্ভুত, ব্যাখ্যা করা যায় না। সংখ্যায় তারা প্রচন্ড বেশি। লোহা, কাঠ ও পাথরের টুকরোর তুলনায় তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক বেশি; আর ধাতুর মুদ্রা ও বস্ত্রখন্ড এবং যে-সমস্ত হাতিয়ারের সাহায্যে এই জন্তুটি গতকাল কাজ করেছে সেগুলোর যে-কোনটার তুলনায়ও তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য বেশি। এই জন্য 'Mob' বিরক্ত। সে অস্পষ্ট ভাবে, ভাসা-ভাসা এই উপলব্ধি করতে পারে যে আরও একটি জীবন আছে — সে জীবন তার এই জীবনের চেয়ে অন্য ভাবে গড়া, সেখানকার রীতিনীতি অন্য রকম, সে জীবন এক অজ্ঞাত কিসের যেন এক প্রলোভনে ভরপুর।

এই বিরক্তির উপলব্ধি ধীরে ধীরে বিপদের সন্দেহ ও আশঙ্কাকে পুষ্ট করে তুলতে থাকে, সূক্ষ্ম সূচিকা দিয়ে জন্তুটির অন্ধ হৃদয় আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে। তার চোখের দৃষ্টি আরও বেশি অন্ধকার ও পুরু হয়ে আসে, তার তালগোল পাকানো আকারহীন দেহপিন্ডটা চোখে পড়ার মতো টান টান

হয়ে পড়ে, একটা অজ্ঞাত উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।...

পলকে পলকে লোকজন সরে সরে যায়, হু হু করে চলে ট্রামগাড়ি আর মোটরগাড়ি। দোকানপাটের শো-কেস-এর ভেতর থেকে কী যেন কতকগুলো চকচকে জিনিস দৃষ্টিকে জ্বালাতন করে। কী তাদের কাজ সেটা কারও জানা নেই, কিন্তু তারা মনোযোগ আকর্ষণ করে, লোকের মনে তাদের অধিকারী হওয়ার বাসনা জাগ্রত করে।

'Mob' বিচলিত হয়ে ওঠে।

সে অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করে এই জীবনপ্রবাহের মধ্যে যেন সে নিঃসঙ্গ, যেন সুবেশধারী সমস্ত লোকজন তাকে — এই নিঃসঙ্গ প্রাণীটিকে পরিত্যাগ করেছে। সে লক্ষ করে কী সুন্দর তকতকে তাদের ঘাড়, কী পাতলা, সাদা ধবধবে তাদের হাত, কেমন করে উদর পূর্তির প্রশান্তিভরে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাদের মুখ; অনায়াসে মনে মনে কল্পনা করতে পারে কী খাবার এই সব লোক প্রতিদিন উদরসাৎ করে থাকে। সে খাবার নিশ্চয় আশ্চর্য রকমের সুস্বাদু হবে — তা খেয়েই না ওদের গায়ের চামড়ায় এমন জেল্লা ধরেছে, ওদের পেট এমন সুন্দর গোল হয়ে উঠছে!..

'Mob' ভেতরে ভেতরে অনুভব করে ঈর্ষা। ঈর্ষা যেন সুড়সুড়ি দেয় তার পাকস্থলীতে।...

দামী, হালকা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে চলেছে সুন্দরী, তন্বী রমণীরা। তারা প্ররোচনার ভঙ্গিতে গদিতে হেলান দিয়ে ছোট ছোট পা ছড়িয়ে বার করে রেখেছে; তাদের মুখ তারার মতো, আর তাদের সুন্দর সুন্দর মুখ মানুষকে যেন হাসার আহ্বান জানাচ্ছে।

'দেখ, দেখ, আমরা কী সুন্দর!' রমণীরা নীরব আহ্বান জানায়।

জনতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকিয়ে দেখে, এই নারীদের তুলনা করে তার নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে। হয় অস্থিসার, নয়ত বড় বেশি পৃথুলা এই স্ত্রীরা চিরকাল লোভী, আর প্রায়ই তারা রোগে ভোগে। বিশেষ করে তাদের দাঁতের ব্যথা, পেটের অসুখ ঘন ঘন লেগে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে সব সময় কোন্দল করে।

'Mob' মনে মনে গাড়ির ভেতরকার এই নারীদের বিবস্ত্র করে, তাদের স্তন, তাদের পা স্পর্শ করে দেখে। অন্নপুষ্ট, টানটান চিক্কণ নগ্ন নারীদেহ কল্পনা ক'রে 'Mob' পরম পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, উচ্চ কণ্ঠে নিজে নিজের সঙ্গে কথা বিনিময় করে চলে; নোংরা, ভারী হাতের চপেটাঘাতের

মতো ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড তার সেই কথাগুলো থেকে তৈলাক্ত, গরম ঘামের গন্ধ পাওয়া যায়।...

'Mob' একজন নারীকে চায়। তার পাশ দিয়ে এই যে সুন্দরীদের মজবুত, ছিপছিপে শরীরগুলো একের পর এক ঝলক দিয়ে চলে যাচ্ছে তা দেখে তার চোখ জ্বলজ্বল করে, তার লোভাতুর দৃষ্টি তাদের লেহন করে।

তাদের শিশুরাও কী সুন্দর ঝলমলে! শিশুদের হাসি আর হট্টগোল আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরা সুস্থ সবল শিশু এরা — সুঠাম, সোজা পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোলাপী গাল, হাসিখুশি...

'Mob'-এর শিশুরা রুগ্ণ, হলদে রঙের, তাদের পাগুলো কেন যেন বাঁকা। শিশুদের পা বাঁকা — এটা খুব সাধারণ দৃশ্য। দোষটা সম্ভবত তাদের মায়েদের, সন্তান প্রসবের সময় হয়ত তারা এমন কিছু করে যা তাদের করা উচিত নয়।...

এই তুলনার ফলে 'Mob'-এর মনের অন্ধকার গহ্বরে জেগে ওঠে ঈর্ষা।

এখন জনতার বিরক্তির সঙ্গে এসে মেশে বৈরিতা — ঈর্ষার উর্বর জমিতে যার প্রচুর ফলন। বিশাল, কালো দেহটা আনাড়ির মতো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করে; শত শত চোখ, যা কিছু তাদের কাছে অপরিচিত ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, সে সব মনোযোগ দিয়ে দেখে, তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে।

'Mob' উপলব্ধি করে যে তার একটি শত্রু আছে — সে-শত্রু ধূর্ত, শক্তিমান, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আর সেই কারণে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেও বটে। সে কাছেপিঠেই কোথায় যেন আছে, আবার কোথাও নেইও। সমস্ত ভালো ভালো স্বাদের জিনিস, সমস্ত সুন্দরী নারী আর গোলাপী রঙের শিশুদের, গাড়িঘোড়া, ঝলমলে রেশমী বস্ত্র — সব সে নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছে; এগুলো সে যাকে যাকে তার খুশি তাদের বিলিয়ে দেয় — তবে 'Mob'-কে নয়। Mob'-কে সে উপেক্ষা করে, অস্বীকার করে, তাকে সে দেখতে পায় না — যেমন 'Mob'-ও দেখতে পায় না তাকে।...

'Mob' খুঁজে বেড়ায়, শুঁকে বেড়ায়, নজর রাখে সব কিছুর ওপর। কিন্তু সবই সাধারণ। আর রাস্তাঘাটের জীবনযাত্রার মধ্যে তার অজানা ও নতুন নতুন অনেক বস্তু থাকলেও তা জনতার পাশ দিয়ে ঝলকে ঝলকে সরে যায়, এমন ভাবে বয়ে চলে যে কাউকে ধরে পিষে মেরে ফেলার অস্পষ্ট বাসনার বা তার বৈরিতার শক্ত টান-টান তন্ত্রীর গায়ে আঘাত করে না।

চত্বরের মাঝখানে ছাইরঙা টুপি মাথায় একটা পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে। পেতলের মতো চকচক করছে তার কামানো মুখ। এই লোকটা অজেয় শক্তির অধিকারী, যেহেতু তার হাতে আছে সীসে ঢালাই করা একটা বেঁটে, মোটা লাঠি।

'Mob' আড়চোখে এই লাঠিটার দিকে তাকায়। এই লাঠি যে কী বস্তু তার জানা আছে, এরকম লক্ষ লক্ষ লাঠি সে দেখেছে। সবগুলোই স্রেফ কাঠ বা লোহা।

কিন্তু এই বেঁটে ও ভোঁতা লাঠির মধ্যে এমন এক দানবীয় শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যার বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না, যাওয়া অসম্ভব।

যে-কোন জিনিসের প্রতি 'Mob' চাপা ও অন্ধ বৈরিতা পোষণ করে। সে উত্তেজিত, ভয়ংকর কিছু একটা করার জন্য সে প্রস্তুত। নিজের অজ্ঞাতসারে চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে এই বেঁটে, ভোঁতা লাঠিটার মাপ নেয়।

অজ্ঞানের অন্ধকার আবর্জনাস্তূপের মধ্যে চিরকালই ধিকিধিকি ভীতি জ্বলতে দেখা যায়।

জীবন তার নিরলস গতিতে বয়ে চলে, অবিরাম গর্জন তোলে। 'Mob' যখন কাজ করে না তখন কোথা থেকে আসে জীবনের এই তেজ?

জনতার কাছে ক্রমেই আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার নিঃসঙ্গতা, সে টের পায় কিসের যেন একটা বঞ্চনা। উত্তরোত্তর তার বিরক্তি বাড়তে থাকে, তার সন্ধানী দৃষ্টি আঁকড়ে ধরার মতো কোন বস্তু সে খুঁজে বেড়ায়।

এখন সে হয়ে ওঠে সজাগ, সংবেদনশীল — তার কাছে যা নতুন এমন কোন জিনিস আর তার অগোচর থাকে না, তার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে না। তার পরিহাস এখন হয় কটু ও বিদ্বেষপূর্ণ। বড় বেশি চওড়া কানাতওয়ালা ছাইরঙা টুপি মাথায় ঐ লোকটাকে তাই জনতার বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির খোঁচা আর তার উচ্চ নিনাদের কশাঘাতের সঙ্গে তাল রেখে পায়ের গতি বাড়াতে হয়। এক রমণী চত্বরটা হেঁটে পার হয়ে যাবার সময় তার স্কার্টটা সামান্য উঠিয়েছিল, কিন্তু জনতা কী দৃষ্টিতে তার পাজোড়া লক্ষ করছে সেটা নজরে পড়ামাত্র সে হাতে ধরা কাপড়ের অংশটা ছেড়ে দিয়ে হাতের আঙুলগুলো এমন ভাবে সিধে করল যে মনে হল কেউ বুঝি তার হাতে আঘাত করেছে।...

কোথা থেকে যেন চত্বরের ওপর টলতে টলতে এসে পড়ল এক মাতাল।

সে চলেছে বুকের ওপর মাথা ঝুলিয়ে, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, মদে চুরচুর তার শরীরটা অসহায় ভাবে টলছে, যে কোন মুহূর্তে সে পড়ে যেতে পারে, সদর রাস্তায় বা রেললাইনের ওপর পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।...

তার এক হাত পকেটে গোঁজা, আরেক হাতে সে ধরে রেখেছে দলামোচড়া পাকানো, ধুলোমাখা একটা টুপি — সেটা সে মাথার ওপর নাড়াচ্ছে, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

চত্বরের ওপরে, ধাতব ধ্বনির ভয়ংকর ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়ার পর তার হুঁশ খানিকটা ফিরে এলো, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিজে ভিজে ঝাপসা চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখল। চারদিক থেকে তার দিকে ছুটে আসছে ট্রামগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি — যেন কালো কালো পুঁতি গাঁথা একটা লম্বা সুতো এগিয়ে আসছে। ট্রামগাড়ি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বিরক্তিভরে ঘণ্টি মারছে, ঘোড়ার নালের খটখট আওয়াজ উঠছে; গুমগুম, ঘর্ঘর আওয়াজ করতে করতে সব যেন ধেয়ে আসছে তার দিকে।

'Mob' অল্পস্বল্প আমোদ পাওয়া গেলেও যেতে পারে এমন কোন বস্তুর সম্ভাবনা উপলব্ধি করে। আবার সে তার শত শত চোখের দৃষ্টিকে একত্রে মিলিয়ে একটা রশ্মিতে পরিণত করে আগ্রহভরে লক্ষ করতে থাকে, প্রতীক্ষা করে।...

ট্রামগাড়ির কন্ডাক্টর ঘণ্টি বাজাল, রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ওপাশে ঝুঁকে পড়ে সে মাতালটার উদ্দেশে চিৎকার-চেঁচামেচি করল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। মাতাল অমায়িক ভঙ্গিতে তার উদ্দেশে টুপি নাড়াল, ট্রামগাড়ির ঠিক সামনের লাইনের দিকে পা বাড়াল। পুরো শরীরের ভারটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ট্রাম-ড্রাইভার সজোরে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দিল — গাড়িটা একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ঘ্যাচাং করে থেমে গেল।

মাতাল আরও এগিয়ে চলল — টুপিটা মাথায় দিয়ে ফের মাটির দিকে মুখ গুঁজে চলতে লাগল।

কিন্তু প্রথম ট্রামগাড়ির পেছন থেকে আরেকটা ট্রামগাড়ি ধীরেসুস্থে গড়াতে গড়াতে এসে মাতালের পায়ে ধাক্কা মারল, মাতাল চোট খেয়ে দড়াম করে প্রথমে এসে পড়ল ট্রামের সামনের জালটার ভেতরে, তারপর সেখান থেকে আস্তে করে গড়িয়ে পড়ল লাইনের ওপরে — এবারে জালটা তাকে ঠেলা দিল, তার তালগোল পাকানো দেহটাকে মাটির ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলল।

মাতালের হাত আর পা মাটির ওপর লটপট করতে দেখা যাচ্ছে। রক্তরাগ

রঞ্জিত সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে, যেন ইশারায় কাউকে কাছে ডাকছে।...

ট্রামগাড়ির ভেতরে যে সমস্ত মহিলা ছিল তারা তীক্ষ্ম স্বরে আর্তনাদ শুরু করে দিল, কিন্তু সব আওয়াজ তৎক্ষণাৎ ডুবে যায় উল্লসিত 'Mob'-এর গভীর উচ্চ রোলের মধ্যে -- মনে হয় যেন অকস্মাৎ একটা ভিজে ও ভারী বিছানার চাদর তাদের ওপর ছুঁড়ে দেওয়াতে তারা দমে গেছে। একটা কালো ঢেউ, জনতার ঢেউ জন্তুর মতো গর্জন করতে করতে সামনের দিকে ছুটে এলো, ট্রামগাড়ির গায়ে এসে আছড়ে পড়ল, গাড়ির সর্বাঙ্গে কালো রঙের ফিনকি ছিটিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করে দিল। তার সামনে পড়ামাত্র ঘণ্টির ব্যাকুল ঢংঢং আওয়াজ, ঘোড়ার পায়ের খুরের খটখট আওয়াজ আর ইলেক্‌ট্রিসিটির গুঞ্জন -- সব আতঙ্কে হিম হয়ে গেল।

ভয়ে ভয়ে, মৃদু মৃদু কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ল গাড়ির জানলার শার্সিগুলো। কিছুই চোখে পড়ে না, কেবল 'Mob'-এর বিশাল দেহটা স্পন্দন তুলছে, কাঁপছে। শোনার মধ্যে যেটুকু শোনা যাচ্ছে তা হল তার উচ্চ আর্তনাদ, তার উত্তেজিত চিৎকার -- চিৎকার দিয়ে সে সোল্লাসে ঘোষণা করছে তার নিজের অস্তিত্ব, তার শক্তি, ঘোষণা করছে যে শেষ পর্যন্ত তারও একটা কাজ জুটে গেছে।

শূন্যে ঝলক দিচ্ছে শত শত বিশাল বিশাল হাত; এক অদ্ভুত, তীব্র বুভুক্ষার লোভাতুর দীপ্তিতে চকচক করতে থাকে গণ্ডায় গণ্ডায় চোখ।

কাকে যেন প্রহার করছে এই কালো 'Mob'-টা, কাকে যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা করছে, কার ওপর যেন প্রতিহিংসা গ্রহণ করছে।...

তার একাকার চিৎকারের ঝটিকার ভেতর থেকে উত্তরোত্তর বেশি করে শোনা যাচ্ছে, লম্বা, লকলকে ছুরির ফলার মতো ঝলক মারছে একটা হিসহিস শব্দ: 'লিঞ্চ!'

শব্দটার এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে, যার বলে 'Mob'-এর সমস্ত অস্পষ্ট বাসনা একত্রে মিলিত হয়, তার মধ্যে আরও ঘন হয়ে এসে মিশে যায় তার সেই চিৎকার: 'লিঞ্চ!'

জনতার কতকগুলি অংশ ঝট করে ট্রামগাড়ির চালের ওপর উঠে গেল, সেখান থেকেও চাবুকের মতো শিস তুলে, ঈষৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে বাতাসে পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে: 'লিঞ্চ!'

এই যে জনতার মাঝখানে গড়ে উঠেছে একটা নিরেট গোলা। গোলাটা কিছু একটা গিলে ফেলে, টেনে শুষে নিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে, জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসছে। জনতার ঘনবদ্ধ দেহটা নতশিরে মাঝখানকার এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে, ধীরে ধীরে ছিন্নভিন্ন হতে হতে তার গর্ভ থেকে বার করে দিচ্ছে এই নিরেট শক্ত ডেলাটা — তার নিজের মাথা আর মুখগহ্বর।

তার এই মুখগহ্বরে, দাঁতের ফাঁকে দুলছে একটা ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত মানুষ — লোকটার গায়ে ইউনিফর্মের যে ছেঁড়া টুকরো-টাকরা ঝুলঝুল করছে তার ওপরকার ডোরা দেখে কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে সে ছিল ট্রাম-ড্রাইভার।

এখন সে চর্বিত মাংসের — রক্তঝরা লাল টকটকে তাজা মাংসের একটা লোভনীয় টুকরো।

জনতা তার কালো মুখগহ্বরের মধ্যে তাকে পুরে নিয়ে বয়ে চলে, তখনও তাকে চিবোতে থাকে। জনতার হাতগুলো অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে থাকে মুখমণ্ডলহীন এই দেহটাকে।

'Mob' ক্রুদ্ধ গর্জন তোলে: 'লিঞ্চ!'

তার মাথার পেছনে দেখতে দেখতে আকার লাভ করে এক দীর্ঘ, ভরাট ধড় — প্রচুর পরিমাণে তাজা মাংস উদরসাৎ করার জন্য সে মুখিয়ে আছে।

কিন্তু আচমকা কোথা থেকে যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল নিখুঁত দাড়ি গোঁফ কামানো একটা লোক, যার মুখটা দেখতে তামার মতো। সে তার মাথার ছাইরঙা টুপি চোখের ওপর টেনে এনে একটা ছাইরঙা পাথরের মূর্তির মতো জনতার পথের সামনে এসে দাঁড়িয়ে নীরবে তার লাঠিটা শূন্যে ওঠাল।

জনতার মাথাটা এই লাঠি থেকে ফসকে যাবার চেষ্টায়, তাকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে একবার ডাইনে আরেকবার বাঁয়ে টাল খেল।

পুলিশের লোকটা অনড়, অটল। তার হাতের লাঠি এতটুকু কাঁপে না, তার শান্ত, কঠিন চোখে পলক পড়ে না।

লোকটার নিজের শক্তির ওপর এই আস্থা সঙ্গে সঙ্গে 'Mob'-এর জ্বলন্ত মুখের ওপর শিরশিরে ঠান্ডা স্রোত ছেড়ে দিল।

একটা লোক যখন একা জনতার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, লাভা-স্রোতের মতো ভারী ও কঠিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একা দাঁড়ায় এবং যখন সে এমন শান্ত — তখন মানতেই হবে যে সে অপরাজেয়!..

জনতা তার মুখের ওপর কী যেন চিৎকার করে বলে, দাঁড়াগুলো নাড়ায় — মনে হয় যেন ওগুলো দিয়ে পুলিশের চওড়া কাঁধ জড়িয়ে ধরতে চায়; কিন্তু এখন তার চিৎকার বিক্ষুব্ধ হলেও শোনাচ্ছে কেমন যেন করুণ-করুণ। পুলিশের তামার ছাঁচে ঢালা মুখটা যখন কালো থমথমে ও নিষ্প্রভ হয়ে আসে, যখন তার হাত বেঁটে, ভোঁতা লাঠিটা আরও উঁচিয়ে ধরে — তখন 'Mob'-এর গর্জন অদ্ভুত ভাবে থেমে যেতে শুরু করে, তার ধড়টা একটু একটু করে, ধীরে ধীরে ধসে পড়তে থাকে, যদিও মাথাটা তখনও তর্ক করতে ছাড়ে না, এদিক ওদিক দুলতে থাকে, গুঁড়ি মেরে আরও দূরে যেতে চায়।

ঐ যে ধীরেসুস্থে চলেছে লাঠি হাতে আরও দুটি লোক। 'Mob'-এর দাঁড়াগুলো শক্তি হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ল, যে দেহটাকে মুঠোয় চেপে ধরে রেখেছিল এবারে তাকে ছেড়ে দিল। দেহটা হাঁটু ভেঙে হুমড়ি খেয়ে এসে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল আইনের মুখপাত্রটির পায়ের কাছে, আইনের মুখপাত্র তার ওপর তুলে ধরল নিজের ক্ষমতার প্রতীক বেঁটে, ভোঁতা লাঠিটা।...

'Mob'-এর মাথাটাও ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। তার ধড়টা এখন আর নেই। চত্বরের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল ক্লান্ত ও অবদমিত লোকজনের কালো কালো মূর্তি — যেন চত্বরের নোংরা বৃত্তটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে একটা বিশাল মালার কালো কালো পুঁতি।

মুখ কালো করে রাস্তার খানাখন্দের মধ্যে ঢুকে পড়ে নীরবে চলতে থাকে ছিন্নভিন্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকজন।

১৯০৬

আমার সাক্ষাৎকার

প্রজাতন্ত্রের কোন এক রাজা

...ইস্পাত ও কেরোসিনের রাজারা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর সব রাজাবদশা আমার কল্পনাকে চিরকালই বিব্রত করেছে। যাদের এত টাকাপয়সা আছে তারা যে সাধারণ লোক এটা আমার ধারণায় আসত না।

আমার মনে হত তাদের একেকজনের অন্ততপক্ষে তিনটে করে পাকস্থলী আর সারা মুখ জুড়ে শ' দেড়েক দাঁত। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে কোটিপতি মানুষ রোজ সকাল ছয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত অবিরাম খেয়ে চলে। সবচেয়ে দামী দামী খাবারের -- হাঁস, টার্কি, কচি শুকরছানা, মাখন, পুডিং, কেক ইত্যাদি নানা রকমের উপাদেয় বস্তুর সে ধ্বংস সাধন করে। সারা দিন চোয়াল নাড়িয়ে নাড়িয়ে সন্ধ্যা নাগাদ সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে তখন সে তার নিগ্রো অনুচরদের ডেকে তার হয়ে খাবার চিবোতে বলে, নিজে কেবল খাবার গলাধঃকরণ করে। শেষকালে সে তার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে, গলদঘর্ম হয়ে হাঁপাতে থাকে ·· এই অবস্থায় নিগ্রোরা তাকে বয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। পরদিন সকাল বেলা ছ'টা থেকে ফের শুরু হয় তার মর্মান্তিক জীবনযাত্রা।

কিন্তু এত প্রাণপণ শক্তি খাটিয়েও সে তার পুঁজির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সুদ পর্যন্ত ভোগ করতে পারে না।

বলাই বাহুল্য এ জীবন কঠিন জীবন। কিন্তু উপায়টা কী? সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি যদি না-ই খেতে পারা যায় তাহলে কোটিপতি হয়ে লাভ কী?

আমার মনে হত তার অন্তর্বাস বুঝি জরির কাপড়ে তৈরি, তার জুতোর হিলে সোনার পেরেক লাগানো আর মাথায় টুপির বদলে মণিমুক্তোর তৈরি কোন জিনিস। তার গায়ের জ্যাকেট নির্ঘাত সবচেয়ে দামী মখমলে তৈরি, সেটা কমসে কম পঞ্চাশ ফুট লম্বা — অন্তত তিন শ'টা সোনার বোতাম

তার শোভাবর্ধন করছে। ছুটি ছাটা বা পালাপার্বণের দিনে সে এক সঙ্গে আটটা জ্যাকেট আর ছয়টা প্যান্ট পরে। ব্যাপারটা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি রীতিমতো অস্বস্তিকরও বটে।... কিন্তু এত ধনী হয়ে সে আর দশটা মানুষের মতো বেশভূষা করবে এটাই বা কী করে হয়?..

আমি মনে মনে ভাবতাম কোটিপতির পকেটটা বুঝি একটা গর্তের মতো, যেখানে গির্জা, সিনেটের দালান, যা যা প্রয়োজন সব জিনিস স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু এই ভদ্রলোকের উদরের ধারণক্ষমতা ভালো একটা সমুদ্রগামী বাষ্পীয় পোতের খোলের সমান বলে মনে মনে ধরে নিলেও এমন একটা জীবের পা আর প্যান্টের দৈর্ঘ্য কতখানি হতে পারে তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। তবে আমার মনে হত যে-লেপের তলায় সে নিদ্রা যায় সেটা নিশ্চয় এক বর্গ মাইলের কম হবে না। আর সে যদি খৈনি চিবোয় তবে বলাই বাহুল্য, সবচেয়ে ভালো খৈনি আর একসঙ্গে পাউন্ড দুয়েক করে। আর যদি নস্যি নেয় ত একেক টিপে পাউন্ড খানেকের কম নয়। টাকাকড়ির দাবি হল যেন তাদের খরচ করা হয়।...

তার হাতের আঙুলগুলো আশ্চর্যরকমের অনুভূতিশীল, মায়াবলে সেগুলো তার ইচ্ছেমতো সে বাড়াতে পারে — নু্য-ইয়র্কে বসে থাকতে থাকতে সে যদি অনুভব করে যে সাইবেরিয়ার কোথাও একটা ডলার গজিয়েছে অমনি সে বেরিং প্রণালীর ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, নিজের জায়গা থেকে এতটুকু না নড়ে সাধের ফুলটি ছিঁড়ে নেয়।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এত কিছু সত্ত্বেও আমার কিন্তু কল্পনায়ই আসত না এই রাক্ষসের মাথাটা দেখতে কেমন হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হত যে-কোন জিনিসের ভেতর থেকে স্বর্ণনিষ্কাশনের প্রবল বাসনায় অনুপ্রাণিত মাংসপেশী ও হাড়ের এত বড় স্তূপ যার দখলে আছে তার পক্ষে মাথাটা ত নিতান্তই বাহুল্য। মোটের ওপর, কোটিপতি সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিল অসম্পূর্ণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি সর্বোপরি যা দেখতে পেয়েছিলাম তা হল যখন তখন বড় করা যায় এমন একজোড়া লম্বা হাত। এই হাতজোড়া গোটা ভূমণ্ডলকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাকে বিরাট, অন্ধকার মুখগহ্বরের সামনে টেনে আনছে, আর এই হাঁ করা মুখটা আমাদের গ্রহটাকে শুষছে, কুরে কুরে, চিবিয়ে খাচ্ছে - লোভে তার ওপর এমন ভাবে মুখের গরম লালা ঝরাচ্ছে যেন ওটা একটা সেঁকা গরম আলু।...

একজন কোটিপতির সাক্ষাৎ পেয়ে আমি যখন দেখতে পেলাম সে

নেহাৎই সাধারণ একজন মানুষ তখন আমি যে কী অবাক হয়েছিলাম, আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

আমার সামনে নরম গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছে এক শুঁটকো, লম্বা বুড়ো। পরম নিশ্চিন্তে সে পেটের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে স্বাভাবিক আয়তনের সাধারণ মানুষের হাতের সমান মাপের দুটি হাত — খয়েরী রঙের, বলিরেখা আঁকা। তার গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, মুখ নিখুঁত কামানো, ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার নীচের ঠোঁট ঝুলে আছে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে চমৎকার বাঁধানো দাঁতের পাটি — সারি সারি সোনার দাঁত। ওপরের ঠোঁট — কামানো, রক্তশূন্য, পাতলা ফিনফিনে — তার চর্বণযন্ত্রের সঙ্গে শক্ত করে সেঁটে আছে, বুড়ো যখন কথা বলে তখন সেটা নড়ে না বললেই চলে। তার নিষ্প্রভ চোখের ওপর ভুরুর লেশমাত্র নেই, ম্যাটমেটে করোটিটার ওপর একগাছা চুলও নেই। মনে হচ্ছিল এই মুখে যেন চামড়ার কিঞ্চিৎ অভাব আছে; লালচে, স্থির ও মসৃণ এই মুখ কেন যেন বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল এক নবজাত শিশুর মুখ। এই জীবটি কি সবে পৃথিবীতে তার জীবন শুরু করছে, নাকি জীবনের অন্তিমে এসে গেছে — সঠিক বলা কঠিন।...

তার বেশভূষাও একজন সাধারণ মরণশীল জীবের মতো। তার অঙ্গে সোনা বলতে সাকুল্যে যা ছিল তা হল তার হাতের আঙটি ও ঘড়ি আর সেই বাঁধানো দাঁত। সবগুলো একসঙ্গে ওজন করলে সম্ভবত আধ পাউন্ডও হবে না। মোট কথা এই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ইউরোপের বনেদী বাড়ির কোন পুরাতন ভৃত্য।...

যে ঘরে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল সেখানকার গৃহসজ্জার জাঁকজমক যেমন তাক লাগানোর মতো নয় তেমনি তার সৌন্দর্যও আহা মরি কিছু নয়। আসবাবপত্র বেশ পোক্ত ধরনের — এই যা বলা যেতে পারে।

এই বাড়িতে খুব সম্ভব মাঝে-মধ্যে হাতিদের আগমন ঘটে — ঠিক এই চিন্তাই মনে এলো আসবাবপত্র দেখে।

'আপনিই বুঝি সেই কোটিপতি?' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, আমিই,' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সে উত্তর দিল।

আমি এমন ভাব দেখালাম যেন তার কথায় বিশ্বাস করেছি, কিন্তু ঠিক করলাম এক্ষুনি লোকটার আসল চেহারা ফাঁস করতে হবে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা সকালে খাবার সময় কতটা মাংস আপনি খেতে পারেন?'

'আমি মাংস খাই না!' সে জানাল। 'এক কোয়া কমলালেবু, একটা ডিম, ছোট একটা কাপের এক কাপ চা — ব্যস, আর কিছু নয়...'

শিশুর মতো নিষ্পাপ তার চোখজোড়া বড় বড় ঘোলাটে দু'ফোঁটা জলের মতো আমার সামনে অস্পষ্ট ভাবে চিকচিক করতে লাগল, সে চোখে আমি মিথ্যার এতটুকু আভাস পেলাম না।

'আচ্ছা বেশ!' আমি ভেবাচেকা খেয়ে গিয়ে বললাম। 'কিন্তু মন খুলে, কোন রকম লুকোচুরি না করে আমাকে বলুন ত দিনে আপনি ক'বার খান?'

'দু'বার!' শান্ত কণ্ঠে সে জবাব দিল। 'সকালে আর দুপুরে ·· তাতেই আমার দিব্যি চলে যায়। দুপুরে আমি খাই এক প্লেট সুপ, পাখির মাংস আর মিষ্টি একটা কিছু। কিছু ফল। এক কাপ কফি। একটা সিগার...'

আমার বিস্ময় ধাঁক ধাঁক করে বেড়ে চলল। সে কিন্তু আমার দিকে সাধু-সন্তের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের এই এত টাকা নিয়ে আপনি কী করেন বলবেন কি?'

আমার কথা বুঝতে না পেরে সে তার কাঁধ সামান্য নাচাল, কোটরের ভেতরে চোখ গোল গোল করে ঘুরিয়ে সে উত্তর দিল:

'ঐ টাকা দিয়ে আমি আরও টাকা করি।'

'কিন্তু কেন?'

'যাতে আরও টাকা করা যায়।'

'কেন?' আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম।

সে চেয়ারের হাতলে কনুই ভর দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কতকটা কৌতূহলের ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কি পাগল?'

'আর আপনি?' আমিও পালটা প্রশ্ন করলাম।

বুড়ো ঘাড় কাত করে সোনা বাঁধানো দাঁতের ফাঁক দিয়ে টেনে টেনে বলল:

'আচ্ছা মজার লোক ত!.. আমার মনে হয় এই বোধহয় প্রথম আমি এরকম একজনকে দেখছি।'

তার পর সে মাথা তুলে মুখ আকর্ণবিস্তৃত করে টেনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

নীরবে আমাকে দেখতে লাগল। তার মুখের শান্ত ভাব দেখে মনে হল সে সম্ভবত নিজেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ বলে গণ্য করে। তার টাইয়ে পিন দিয়ে গাঁথা একটা ছোট রত্ন আমি লক্ষ করলাম। এই পাথরটার আয়তন যদি জুতোর হিলের সমান হত তাহলেও না হয় আমি একটা মানে বুঝতে পারতাম।

'আপনি কী কাজ করেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'টাকা বানাই!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সংক্ষেপে সে বলল।

'টাকা জাল করেন নাকি?' আমি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম — আমার মনে হল এতক্ষণে আমি বোধহয় রহস্যভেদের কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু আমার এই কথায় চাপা আওয়াজ করে সে হিক্কা তুলতে লাগল। তার গোটা শরীরটা কাঁপতে লাগল, মনে হল কেউ যেন অদৃশ্য হাতে তার বগলের তলায় কাতুকুতু দিচ্ছে। তার চোখ ঘন ঘন পিটপিট করতে লাগল।

'বেড়ে বলেছেন!' আশ্বস্ত হয়ে প্রসন্ন দৃষ্টির ভিজে বাষ্প আমার মুখের ওপর ঢেলে দিয়ে সে বলল। 'আরও কিছু জানতে চান ত জিজ্ঞেস করুন!' আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কেন যেন সে গালদুটো ফুলাল।

আমি একটু ভেবে নিয়ে দৃঢ়স্বরে তাকে প্রশ্ন করলাম:

'আপনি কী করে টাকা বানান?'

'ও! বুঝতে পেরেছি!' মাথা নাড়িয়ে সে বলল। 'কাজটা খুবই সহজ। আমি রেলওয়ের মালিক। চাষীরা কেনাবেচার জিনিস ফলায়। আমি তাদের জিনিস বাজারে পেঁৗছে দিই। হিসাব করে দেখতে হবে চাষী যাতে না খেয়ে মারা না পড়ে এবং পরেও কাজ করতে পারে সেজন্য কতটা টাকা তার জন্য রাখা উচিত; বাদবাকি যা থাকছে সেটা আমার নিজের — মালের ভাড়া। খুব সহজ ব্যাপার।'

'চাষীরা কি এতে সন্তুষ্ট?'

'সবাই যে সন্তুষ্ট এমন আমার মনে হয় না!' শিশুসুলভ সারল্যের সঙ্গে সে বলল। 'তবে কথায় বলে, যতই দাও না কেন সব লোককে কখনই তুষ্ট করা যায় না। সব সময় কিছু না কিছু খাপছাড়া লোকজন থাকে, যারা গজগজ করে।...'

'সরকার আপনাকে ঘাঁটায় না?' আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'সরকার?' আমার কথাটা সে আওড়াল। অন্যমনস্ক ভাবে সে আঙুল দিয়ে কপাল ঘষল। তারপর কী যেন মনে পড়ে যেতে সে মাথা নেড়ে বলল, 'ও... ঐ ওয়াশিংটনে যারা আছে তাদের কথা বলছেন? না, না, তারা আমাকে

ঘাঁটায় না। বাছারা আমার বড় ভালো।... তাদের মধ্যে আমার আখড়ারও কেউ কেউ আছে। তবে তাদের সঙ্গে কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়।... তাই অনেক সময় তাদের কথা মনেও থাকে না। না, ওরা আমাকে ঘাঁটায় না,' কথাটা আরও একবার আউড়ে সঙ্গে সঙ্গে সে কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করল, 'এমন কোন সরকার আছে নাকি যে লোকের টাকা বানানোর কাজে বাগড়া দেয়?'

নিজের সরল বিশ্বাস আর তার প্রাজ্ঞতার কথা ভেবে আমি মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলাম।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, 'না, আমি ঠিক সে কথা বলছি না।... আসল কথাটা কী জানেন, আমি ভেবেছিলাম কখন কখন সরকারের উচিত সরাসরি লুটপাটের ঘটনা বন্ধ করা।'

'উঁহু!' সে আপত্তি তুলে বলল। 'এ হল আদর্শবাদ। এখানে সে প্রথা নেই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার সরকারের নেই।'

এমন নিশ্চিন্ত শিশুসুলভ বিজ্ঞতা দেখে আমি বিনয়ে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লাম।

'কিন্তু একজন লোক যখন অনেক লোকের সর্বনাশ ঘটায় তখন সেটাকে কি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা যায়?' আমি ভদ্রভাবে নিবেদন করলাম।

'সর্বনাশ?' চোখদুটো বিস্ফারিত করে সে আওড়াল। 'সর্বনাশ তখনই যখন শ্রমের দাম বেশি। যখন ধর্মঘট হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আছে অন্য দেশ থেকে এখানে যারা বসবাসের জন্য আসছে, সেই দেশান্তরীদের দল। তাদের কল্যাণে শ্রমিকদের মজুরী সব সময় নীচের দিকে থাকে, ধর্মঘটীদের জায়গায় কাজ করার জন্য তারা মুখিয়ে আছে। দেশে যখন এই রকম লোক যথেষ্ট পরিমাণে এসে জুটবে, যারা শস্তায় কাজ করবে এবং কিনবে অনেক, তখন সব ভালো চলবে।'

সে খানিকটা উদ্দীপিত হয়ে উঠল। এখন আর তাকে একাধারে বৃদ্ধ ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মিশ্রণ বলে ততটা মনে হচ্ছে না। তার সরু সরু কালো আঙুলগুলো নড়েচড়ে উঠল, তার শুষ্ক কণ্ঠস্বর আরও দ্রুত, তীক্ষ্ন হয়ে আমার কানে এসে বিঁধল।

'সরকার? এটা অবশ্য একটা কৌতূহলজনক প্রশ্ন — হ্যাঁ, তা-ই বটে। ভালো সরকার অবশ্য খুবই দরকার। এই ধরুন না কেন, আমি যা যা বেচতে চাই সব যাতে কেনে তার জন্য আমার যত লোক দরকার দেশে তত লোক থাকা উচিত — ভালো সরকার হলে এই ধরনের সমস্ত সমস্যার সমাধান

করে। শ্রমিকের সংখ্যা এমন হতে হবে যাতে তাদের কোন অভাব আমি বোধ না করি। কিন্তু তাই বলে বাড়তি একটিও না! তখন আর সমাজতন্ত্রী বলে কেউ থাকবে না। ধর্মঘটও হবে না। মোটা অঙ্কের ট্যাক্স চাপানো সরকারের উচিত নয়। জনসাধারণ যা দিতে পারে সে সমস্ত আমি নিজে নেব। এই রকম যে সরকার তাকেই আমি বলব ভালো সরকার।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, 'লোকটা দেখছি নিজের মূর্খতা জাহির করছে — এটা নিঃসন্দেহে নিজের মহিমা সম্পর্কে তার সচেতনতার লক্ষণ। বোধহয় সত্যি সত্যিই সে রাজা-টাজা হবে...'

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলে চলল, 'আমার যেটা দরকার তা হল দেশে যেন আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে। সরকার অল্পস্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নানা ধরনের দার্শনিকদের ভাড়া করে। তারা প্রত্যেক রবিবার অন্ততপক্ষে আট ঘণ্টা জনসাধারণকে আইনকানুনের সমাদর করতে শেখায়। যদি দেখা যায় একাজের জন্য দার্শনিকেরা যথেষ্ট নয় তাহলে সৈন্যদের নামিয়ে দাও। এক্ষেত্রে উপায়টা বড় কথা নয়, আসল কথা হল কার্যসিদ্ধি। পণ্য যারা ভোগ করছে তাদের এবং শ্রমিকদের অবশ্য কর্তব্য হবে আইনকে শ্রদ্ধা করা। এই হল শেষ কথা!' আঙুল নিয়ে খেলতে খেলতে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

'না, লোকটা মূর্খ নয়, রাজা কিনা সন্দেহ!' মনে মনে এই ভেবে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বর্তমানের এই সরকারে আপনি সন্তুষ্ট কি?'

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না।

'সরকার ইচ্ছে করলে যা করতে পারে তার চেয়ে কম করছে। আমি বলি অন্য দেশ থেকে বসবাসের জন্য যারা এ দেশে আসছে আপাতত তাদের ঢুকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এখানে আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা তারা ভোগ করছে — এর জন্য মূল্য দেওয়া উচিত। এদের একেকজনে অন্ততপক্ষে ৫০০ ডলার সঙ্গে নিয়ে আসুক। যার ৫০০ ডলার আছে সে লোক যার মাত্র ৫০ ডলার আছে তার চেয়ে দশগুণ ভালো।... বাজে লোকজন — ভবঘুরে, ভিখিরি, রোগী ইত্যাদি যত রাজ্যের কুঁড়ের বাদশা — কোথাও কোন কাজে লাগবে না।'

'কিন্তু এখানে বসবাস করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশ থেকে যারা আসছিল এর ফলে তাদের আসা ত কমে যাবে,' আমি বললাম।

বুড়ো মাথা ঝাঁকিয়ে আমার কথা সমর্থন করল।

'কোন এক সময় আমি ওদের জন্য এই দেশের দরজা একেবারে বন্ধ

করে দেবার প্রস্তাব দেব।... তবে আপাতত প্রত্যেকে একটু একটু করে সোনা নিয়ে আসুক।... এটা দেশের পক্ষে ভালো। তারপর নাগরিক অধিকার লাভের জন্য যে মেয়াদ আছে তা বাড়িয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। পরে আস্তে আস্তে তাদের সেই অধিকার পুরোপুরি বিলোপ করে দিতে হবে। মার্কি-নীদের জন্য যারা কাজ করতে চায় তারা কাজ করুক, কিন্তু তাই বলে তাদের মার্কিন নাগরিক অধিকার দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। মার্কিনী প্রচুর করা হয়ে গেছে — আর নয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে যত্ন নিতে তাদের প্রত্যেকেই যথেষ্ট সক্ষম। এ সবই সরকারের কাজ। কিন্তু এর ব্যবস্থা করতে হবে অন্য ভিত্তিতে। সরকারের যারা সদস্য তাদের সকলকে নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার হতে হবে — তা হলে তারা বেশ তাড়াতাড়ি আর সহজে দেশের স্বার্থ বুঝতে পারবে। এখন আমার যেটা দরকার তা হল সিনেটরদের কেনা, যাতে ছোটখাটো নানা জিনিস... কী কী আমার একান্ত দরকার, তাদের বুঝিয়ে বলতে পারি। তা যদি করতে পারি তাহলে সেটা হবে বাড়তি...'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা ঝাড়া দিয়ে যোগ করল:

'কেবল সোনার পাহাড়ের চুড়ো থেকেই জীবনের সঠিক ছবি পাওয়া যায়।'

এখন রাজনীতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম:

'আচ্ছা, ধর্ম সম্পর্কে আপনার মতামত কী?'

'ও!' উরুতে চাপড় মেরে সোৎসাহে ভ্রূভঙ্গ করে সে চেঁচিয়ে বলল। 'খুবই ভালো ধারণা আমার! ধর্মে জনসাধারণের প্রয়োজন আছে। আমি আন্তরিক ভাবে এটা বিশ্বাস করি! এমনকি আমি নিজে রবিবার রবিবার গির্জায় ধর্মপ্রচার করে বেড়াই। তা নইলে চলবে কী করে!'

'ধর্মপ্রচারের সময় আপনি কী বলেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী আবার বলব? একজন খাঁটি খ্রীষ্টানের পক্ষে গির্জায় যা যা বলা সম্ভব তা-ই বলি!' দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে সে বলল। 'আমি অবশ্য একটা গরিব মহল্লায় ধর্মপ্রচার করি। ভালো কথা শোনা আর পিতৃতুল্য কারও কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছু শোনা গরিবদের বড় দরকার।... আমি ওদের বলি...'

মুহূর্তের জন্য তার মুখে শিশুসুলভ ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চোখ তুলল ঘরের সিলিং-এর দিকে, যেখানে মদনদেবের অনুচরেরা ইয়র্কশায়ার বরাহের মতো গোলাপী চামড়ার এক

স্থূলাঙ্গিনীর নগ্ন দেহ সলজ্জ ভঙ্গিতে ঢেকে দিচ্ছে। তার নিষ্প্রভ চোখের গভীরে সিলিং-এর রঙের বাহার প্রতিফলিত হল, বিচিত্র রঙের ফুলকি ঝলকে উঠল তার চোখে। সে মৃদুস্বরে বলতে শুরু করল।

'হে আমার খ্রীষ্টসম্পর্কিত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ। ঈর্ষার ধূর্ত দানবের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ো না। তোমার যা যা পার্থিব আছে পরিহার কর। পৃথিবীর এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষ কেবল চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ভালো কর্মী, চল্লিশোর্ধ্বে সে আর কলকারখানার চাকরী পায় না। জীবন অনিত্য। এই যে তোমরা কাজ কর -- একবার হয়ত হাত ওঠানো-নামানোর এদিক ওদিক হয়ে গেল --- অমনি যন্ত্র গুঁড়িয়ে দিল তোমার হাড়গোড়; সর্দিগর্মিতে পড়লে -- তাতেই হয়ে গেল দফা রফা! তোমাকে পদে পদে অনুসরণ করছে ব্যাধি, সর্বত্র দুর্ভাগ্য! হতভাগ্য মানুষের অবস্থা একটা উঁচু বাড়ির চালের ওপরে একজন অন্ধের মতন — যে-দিকেই যাক না কেন তার পতন ঘটবে, তার ধ্বংস অনিবার্য — বলেছেন সন্ত জুডের ভ্রাতা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত সন্ত যেম্‌স। হে ভ্রাতৃবৃন্দ! ইহলোককে মূল্যবান বলে গণ্য করা তোমাদের উচিত নয় --- ইহলোক মানুষের আত্মার অপহারক শয়তানের সৃষ্টি। হে খ্রীষ্টের স্নেহধন্য সন্তানেরা, তোমাদের পিতার মতো তোমাদেরও সাম্রাজ্য ইহজগতের নয় -- তার অবস্থান স্বর্গলোকে। তোমরা যদি সহিষ্ণু হও, যদি কোন রকম অভিযোগ না ক'রে, অসন্তোষ প্রকাশ না ক'রে মুখ বুজে তোমাদের ইহলোকের পথ অতিক্রম করতে পার তাহলে তিনি স্বর্গরাজ্যে তোমাদের গ্রহণ করবেন, এই পৃথিবীতে তোমরা যে শ্রম করেছ তার জন্য তোমাদের পুরস্কৃত করবেন --- তোমরা অনন্ত স্বর্গসুখের অধিকারী হবে। ইহজীবন তোমাদের আত্মার শোধনাগার মাত্র, এখানে তোমরা যত বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবে তত বেশি সুখভোগের অধিকারী হবে পরলোকে গিয়ে --- স্বয়ং সন্ত জুড এই কথা বলেছেন।'

সে হাত দিয়ে ছাদের সিলিং দেখাল, একটু ভেবে নিয়ে শীতল ও কঠিন স্বরে কথার জের টেনে বলতে লাগল:

'হ্যাঁ, আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! আমাদের প্রতিবেশী যে-ই হোক না কেন তার প্রতি প্রেমবশত আমরা যদি আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করতে না পারি তাহলে এই জীবনটাই অসার ও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। ঈর্ষারূপ রিপুর অধিকারে হৃদয় সমর্পণ করো না! ঈর্ষা করার মতো কী বস্তু এখানে থাকতে পারে? পার্থিব সুখসম্পদ — মায়া, শয়তানের খেলা। ধনী দরিদ্র, রাজা ও কয়লাখনির মজুর, মহাজন আর রাস্তার ঝাড়ুদার — আমরা যে যা-ই

হই না কেন, সকলকেই মরতে হবে। এমনও হতে পারে, স্বর্গের স্নিগ্ধ নন্দনকাননে কয়লাখনির মজুররাই হবে রাজা আর রাজা নন্দনকাননের পথে ঝাড়ু দেবে — তোমরা রোজ যে মিঠাই খাবে তার ফেলে দেওয়া মোড়ক আর গাছের ঝরাপাতা সাফ করবে। ভ্রাতৃগণ! যেখানে আত্মা শিশুর মতো দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় পাপের সেই অন্ধকার অরণ্যে, এই পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা করার মতো কী থাকতে পারে? প্রেম ও নম্রতার পথ ধরে যাও সবে স্বর্গলোকে, তোমাদের অদৃষ্টে যা-ই ঘটুক না কেন নীরবে সহ্য কর। সকলকে ভালোবাস, এমনকি যারা তোমাকে অপমান করে — তাদেরও।...'

সে আবার চোখ বুজল, চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে বসে আবার শুরু করল:

'যে সমস্ত লোক এক দলের দারিদ্র্য এবং অন্য দলের ঐশ্বর্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তোমাদের হৃদয়ে ঈর্ষার পাপজনক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তাদের কথায় কান দিও না। ঐ সব লোক শয়তানের চর; প্রভু প্রতিবেশীকে হিংসা করতে নিষেধ করেছেন। যারা ধনী তারাও দরিদ্র, তারা প্রেমের কাঙাল। ধনী ব্যক্তিকে প্রেম দাও, যেহেতু সে হল ঈশ্বর-মনোনীত! — এই কথা ঘোষণা করেন প্রভু যিশুর ভ্রাতা দেবালয়ের প্রধান যাজক সন্ত জুড। সাম্যের বাণী এবং শয়তানের অন্যান্য কারসাজির দিকে মনোযোগ দিও না। এখানে, এই পৃথিবীতে সাম্যের কী অর্থ? তোমাদের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত ঈশ্বরের সম্মুখে আত্মার শুদ্ধতায় পরস্পরের সমতুল্য হওয়া। ধৈর্যসহকারে তোমাদের ক্রুশ বহন কর, আজ্ঞানুবর্তিতা তোমাদের এই বোঝা হালকা করবে। হে আমার সন্তানবর্গ, ঈশ্বর তোমাদের সহায় — এর বেশি আর কী চাই তোমাদের!'

বুড়ো চুপ করল, মুখের হাঁ প্রসারিত করে, সোনা বাঁধানো দাঁতের ঝলক তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে আমার দিকে তাকাল।

'আপনি ধর্মের রীতিমতো সদ্ব্যবহার করছেন!' আমি মন্তব্য করলাম।

'ও, সে আর বলতে! আমি এর মূল্য জানি,' সে বলল। 'আপনাকে আবার বলি, গরিবদের পক্ষে ধর্মের একান্ত প্রয়োজন আছে। ধর্ম আমার বেশ লাগে। ধর্ম বলে, পৃথিবীতে সব কিছু দানবের অধিকারে। হে মানুষ, যদি আত্মার পরিত্রাণ চাও তা হলে এখানকার, এই পৃথিবীর কোন বস্তু কামনা করো না, স্পর্শ করো না। মৃত্যুর পরে যে জীবন আছে তার সমস্ত আনন্দ তুমি উপভোগ করতে পারবে — স্বর্গে যা আছে সব তোমার!

লোকে যখন একথা বিশ্বাস করে তখন তাদের নিয়ে কাজ করা সহজ। হ্যাঁ। ধর্ম যেন মেশিনের তেল। জীবনের মেশিনে এই তেল আমরা যত বেশি লাগাব ততই তার অংশগুলির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ কমে যাবে, ততই সহজ হবে মেশিন চালকের কাজ।...'

'হ্যাঁ লোকটা রাজাই বটে,' মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করে আমি শূকরপালকের সাম্প্রতিক বংশধরটিকে ভক্তিভরে জিজ্ঞেস করলাম:

'আপনি কি নিজেকে খ্রীষ্টান বলে গণ্য করেন?'

'হ্যাঁ, একশ' বার!' পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলল। 'কিন্তু...' সে ওপরের দিকে হাত তুলে জাঁক করে বলল, 'সেই সঙ্গে কথা হল এই যে আমি একজন মার্কিনী, এবং সেই হিশেবে আমি কঠোর নীতিবাদী।...'

তার চোখেমুখে একটা নাটকীয় ভাব ফুটে উঠল — সে ঠোঁট কোঁচকাল, তার কানদুটো নাকের কাছাকাছি নেমে এলো।

'আপনি কী বলতে চান?' কণ্ঠস্বর নামিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

'যা বলব সেটা যেন আপনার-আমার মধ্যেই থাকে,' মৃদুস্বরে সে সতর্ক করে দিয়ে বলল। 'একজন মার্কিনীর পক্ষে খ্রীষ্টকে মেনে নেওয়া অসম্ভব!'

'অসম্ভব?' একটু থেমে ফিসফিস করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই!' সেও ফিসফিস করে বলল — এবং জোর দিয়েই বলল।

'কিন্তু কেন?' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খ্রীষ্ট অবৈধ সন্তান!' বুড়ো আমার দিকে চোখ টিপে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। 'আপনি বুঝতে পারছেন? দেবত্ব লাভের কথা দূরে থাক, আমেরিকায় একজন অবৈধ সন্তান সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত হতে পারে না। ভদ্র সমাজে তার কোন স্থান নেই। কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে যাবে না। ওরে বাবা! এ ব্যাপারে আমরা দারুণ কড়া! খ্রীষ্টকে যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে সমস্ত অবৈধ সন্তানকে ভদ্রসন্তান বলে মেনে নিতে হয়... এমনকি নিগ্রো পুরুষ আর শ্বেতাঙ্গিনীর মিলনজাত সন্তানকেও। একবার ভেবে দেখুন দেখি কী সাংঘাতিক! অ্যাঁ?'

ব্যাপারটা বাস্তবিকই সাংঘাতিক হবেও বা — বুড়োর চোখজোড়া সবুজবর্ণ ধারণ করল, পেঁচার চোখের মতো গোল গোল হয়ে গেল। সে বেশ চেষ্টা করে নীচের ঠোঁটটা ওপরের দিকে টেনে শক্ত করে দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরল। তার হয়ত মনে হচ্ছিল যে এই ভঙ্গিতে তার মুখটা বেশ জমকাল ও কঠোর দেখাচ্ছে।

'নিগ্রোকে কি আপনারা কোন মতে মানুষ বলে মেনে নিতে পারেন না?' গণতান্ত্রিক দেশের নীতিবোধের চাপে মর্মাহত হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

'আপনি বড় বেশি সরল দেখছি!' সহানুভূতির সুরে সে বলল। 'আরে ওরা যে কালো! ওদের গায়ে বোটকা গন্ধ। কোন নিগ্রো কোন শ্বেতাঙ্গিনীকে স্ত্রী হিশেবে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে সহবাস করেছে — এ কথা আমরা একবার জানতে পারলে আর রক্ষে নেই -- আমরা নিগ্রোটাকে 'লিঞ্চ' করব। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে তাকে গাছে লটকে দেব... বিন্দুমাত্র দেরি হবে না! নীতির প্রশ্ন যখন আসে তখন আমরা ভীষণ কড়া।...'

কটা বাসী মড়াকে লোকে যেমন সম্ভ্রম না করে পারে না এই লোকটাও এখন আমার মনে সেই রকম সম্ভ্রমের উদ্রেক করল। কিন্তু আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি, সে কাজের একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। সত্য, স্বাধীনতা, বুদ্ধিবিবেচনা এবং যা কিছু মহৎ ও পবিত্র, যাতে আমার আস্থা আছে সে সবের ওপরে পীড়নের এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার বাসনায় আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললাম।

'সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে আপনার কী মনোভাব?'

'আরে ওরাই ত হল শয়তানের চর!' হাতের তালু দিয়ে হাঁটু চাপড়ে সে চটপট বলল। 'সমাজতন্ত্রীরা হল জীবনের মেশিনে বালুকণা — এই বালুকণা যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে যন্ত্রের কাজে গন্ডগোল পাকায়। যে সরকার ভালো সেখানে সমাজতন্ত্রীদের স্থান নেই। আমেরিকায় তারা জন্মায়। তার মানে ওয়াশিংটনে যারা আছে তারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। তাদের উচিত সমাজতন্ত্রীদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া। তাহলে অন্তত একটা কাজের কাজ হত। আমার কথা হল সরকারকে জীবনের বাস্তবতার বেশ কাছাকাছি থাকতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন সরকারের সমস্ত সদস্য কোটিপতিদের ভেতর থেকে নেওয়া হয়। এই হল আসল কথা!'

'আপনার চিন্তাভাবনার মধ্যে বেশ সঙ্গতি আছে দেখতে পাচ্ছি!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ তা ত হবেই!' মাথা নেড়ে সে আমার কথায় সায় দিল। এখন তার মুখের ওপর থেকে সমস্ত ছেলেমানুষী ভাব কোথায় উধাও হয়ে গেছে! তার দুই গালে ফুটে উঠেছে গভীর বলিরেখা।

আমার ইচ্ছে হল শিল্পকলা সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি।

'আচ্ছা বলুন ত...' আমি শুরু করলাম, কিন্তু সে আঙুল তুলল, নিজে থেকেই বলতে শুরু করল:

'সমাজতন্ত্রীর মাথায় আছে নিরীশ্বরবাদ, তার পেটের ভেতরে গজগজ করছে নৈরাজ্যবাদ। দানব তার আত্মাকে ক্ষেপামি আর হিংসার ডানা দিয়েছে, সেই ডানায় ভর করে সে উড়ছে। সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে লড়তে হলে আরও বেশি করে ধর্ম আর সৈন্যের দরকার। ধর্ম লড়বে নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে, আর সৈন্যরা — অরাজকতার বিরুদ্ধে। প্রথমে সমাজতন্ত্রীর মাথার ভেতরে পুরে দাও গির্জার ধর্মোপদেশের ভারী সীসে। তাতেও যদি তার রোগ না সারে তাহলে সৈন্যরা তার পেটে সীসের গুলি ছুঁড়ুক!..'

সে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলল:

'দানবের ক্ষমতা অপরিসীম!'

'হ্যাঁ, তা ত বটেই!' আমি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললাম।

এই প্রথম আমি পীত দানবের - স্বর্ণের প্রবল প্রভাব এমন জলজ্যান্ত আকারে লক্ষ করলাম। গেঁটে বাতে আর অন্যান্য বাতরোগে ঘুণধরা বুড়োর শুকনো হাড়, পুরনো চামড়ার বস্তাবন্দী তার দুর্বল হাড় জিরজিরে শরীর, ঝরঝরে জঞ্জালের এই ছোটখাটো গোটা স্তূপটা এখন মিথ্যাচার ও আধ্যাত্মিক ভ্রষ্টাচারের জনক পীত দানবের ঠাণ্ডা সিরসিরে, নিষ্ঠুর ইচ্ছার বশে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বুড়োর চোখজোড়া দুটো নতুন মুদ্রার মতো চকচক করছে, সে যেন আগাগোড়া আরও পোক্ত আরও শুকনো হয়ে গেছে। এখন তাকে আরও বেশি করে একজন ভৃত্যের মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু এখন আর আমার জানতে বাকি নেই তার প্রভুটি কে।

'শিল্পকলা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করল, মুখে হাত বুলিয়ে নিয়ে সেখান থেকে কঠোর বিদ্বেষের ভাব মুছে ফেলল। ফের সেই মুখে ফুটে উঠল কেমন যেন একটা ছেলেমানুষী ভাব।

'হ্যাঁ, কী যেন বললেন আপনি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'শিল্পকলা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?'

'ও, এই কথা!' শান্ত কণ্ঠে সে বলল। 'ও নিয়ে আমি ভাবি-টাবি না, আমি ওগুলো শুধু কিনি, এই যা...'

'সে আমি জানি। কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে সে সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তার কাছে আপনার কোন দাবি আছে?'

'ও হ্যাঁ। সে ত বটেই, দাবি আছে বৈ কি!.. তাকে, মানে এই শিল্পকলাকে

হতে হবে মজাদার — এই হল আমার দাবি। আমি যেন হাসতে পারি। আমার যা কাজ তাতে হাসির তেমন কোন জায়গা নেই। কখন কখন মস্তিষ্ককে শান্ত করার জন্য বা শরীরকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য ওষুধের নিতান্ত দরকার হয়ে পড়ে। ছাদের সিলিং-এ কিংবা দেয়ালের গায়ে যখন কোন শিল্প ফুটিয়ে তোলা হয় তখন তা এমন হওয়া উচিত যে তাকে দেখে যেন ক্ষুধার উদ্রেক হয়।... বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকা উচিত সবচেয়ে ভালো আর উজ্জ্বল রঙে। বিজ্ঞাপনকে এমন হতে হবে যাতে দূর থেকে, মাইলখানেক দূর থেকেই তা আপনাকে প্রলুব্ধ করে এবং যেখানে ডাকছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেয়। তবেই অর্থব্যয় সার্থক। মূর্তি কিংবা ফুলদানি — সব সময়ই মার্বেলপাথর বা চীনেমাটির চেয়ে ব্রোঞ্জের হওয়া ভালো -- চাকর-বাকরেরা ব্রোঞ্জের জিনিস চীনেমাটির মতো অত ঘন ঘন ভাঙতে পারে না। মোরগের লড়াই আর ধেড়ে ইঁদুর মারা খুব ভালো। লন্ডনে আমি দেখেছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। বক্সিং — সেও ভালো, কিন্তু খুনোখুনির পর্যায়ে গড়ানো ঠিক নয়।... গানবাজনা হওয়া উচিত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। মার্চের বাজনা সব সময় ভালো, তবে সবচেয়ে ভালো মার্চের বাজনা -- মার্কিন। আমেরিকা পৃথিবীর সেরা দেশ -- আর সেই কারণে মার্কিন বাজনাও জগতের সেরা বাজনা। ভালো গানাবাজনা সেখানেই, যেখানে লোকজন ভালো। মার্কিনীরা পৃথিবীর সেরা মানুষ। তাদের সবচেয়ে বেশি টাকা। আমাদের মতন এত টাকাকড়ির মালিক আর কেউ নয়। তাই শিগগিরই সমস্ত দুনিয়াকে আমাদের কাছে আসতে হবে।...'

আমি এই অসুস্থ শিশুটির আত্মতৃপ্ত বকুনি শুনে যেতে লাগলাম; শুনতে শুনতে টাসমানিয়ার অসভ্যদের কথা ভেবে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। শুনতে পাই ওরাও নাকি নরখাদক, কিন্তু হাজার হোক তাদের সৌন্দর্যবোধ উন্নত ধরনের।

'আপনি থিয়েটারে যান?' পীত দানবের এই বৃদ্ধ বশংবদ ভৃত্যটি নিজের জীবন দিয়ে যে-দেশকে কলুষিত করেছে তার জন্য তার এত বড়াই দেখে সেটা থামানোর উদ্দেশ্যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'থিয়েটার? হ্যাঁ, তা যাই বৈ কি! আমি জানি এও এক শিল্প!' প্রত্যয়ের সুরে সে বলল।

'আচ্ছা, থিয়েটারে আপনার কী পছন্দ?'

'আমার ভালো লাগে যখন নীচু কাটের পোশাক পরা বহু অল্পবয়সী

মহিলাদের দেখতে পাই — ওদের চেয়ে উঁচুতে বসে ওদের ওপর নজর দেওয়া যায়!' একটু ভেবে সে জবাব দিল।

'কিন্তু থিয়েটারে আপনি সবচেয়ে বেশি কী পছন্দ করেন?' আমি মরিয়া হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম।

'ও, এই কথা!' একগাল হেসে সে বলল। 'অবশ্যই অভিনেত্রীদের — যেমন আর সকলে পছন্দ করে।... অভিনেত্রীরা যদি তরুণী আর সুন্দরী হয় তাহলে তারা নিপুণ হবেই। কিন্তু ওদের মধ্যে কোন্‌টা যে সত্যি সত্যিই তরুণী চট করে অনুমান করা কঠিন। ওরা সবাই এমন সুন্দর কারচুপি করতে পারে! আমি অবশ্য বুঝি এটা ওদের বৃত্তি। কিন্তু কখন কখন হয়ত মনে হল, ওঃ! এই যে একটা মেয়ের মতো মেয়ে বটে! — পরে দেখা গেল তার বয়স হয়ত পঞ্চাশ বছর আর তার অন্তত শ' দুয়েক উপপতি ছিল। ঘটনাটা মোটেই প্রীতিকর নয়।... সার্কাসের মেয়েরা থিয়েটারের অভিনেত্রীদের চেয়ে ভালো। প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা বয়সে ছোট আর শরীরও তারা বেশ বাঁকাতে পারে।'

দেখেশুনে মনে হল এই শাস্ত্রে সে একজন রীতিমতো বিশারদ। এমনকি আমি হেন লোক, যে কিনা সারা জীবন পাঁকে ডুবে কাটিয়েছে, সেও অনেক জিনিস এই প্রথম তার কাছ থেকে জানতে পারল।

'কবিতা আপনার কেমন লাগে?' আমি জানতে চাইলাম।

'কবিতা?' পায়ের জুতোর দিকে চোখ নামিয়ে কপাল কুঁচকে সে পালটা প্রশ্ন করল। একটু ভেবে নিল, তারপর মাথা পেছনে হেলিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেখাল আমাকে। 'কবিতা? ও, হ্যাঁ! কবিতা আমার বড় ভালো লাগে। জীবন বড় ফুর্তির হত যদি সবাই কবিতায় বিজ্ঞাপন লিখতে শুরু করে।'

'আপনার প্রিয় কবি কে?' পরের প্রশ্নটা আমি একটু তাড়াতাড়ি করে ফেললাম।

বৃদ্ধ কেমন যেন হতভম্ব হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করল, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'কী বললেন আপনি?'

আমি আমার প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলাম।

'হুম্‌... আপনি বড় মজার লোক দেখছি!' এই বলে সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়ল। 'একজন কবিকে ভালোবাসতে যাব কেন বলুন ত? তাকে ভালোবাসার কী দরকার?'

'আমাকে মাফ করবেন!' মাথার ঘাম মুছতে মুছতে আমি বললাম। 'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম আপনার প্রিয় বই কী? অবশ্য চেকবই বাদে...'

'ও, তাই বলুন!' আমার প্রশ্নটা এবারে সে মেনে নিল। 'আমি দুটো বই ভালোবাসি -- বাইবেল আর লেজার। দুটোই সমানভাবে বুদ্ধিকে উৎসাহিত করে তোলে। হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন তাদের মধ্যে এমন শক্তি আছে যা আপনাকে সব দিতে পারে -- যা যা দরকার সব।'

'লোকটা বোধহয় আমার সঙ্গে মস্করা করছে!' এই ভেবে আমি মনোযোগ দিয়ে তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু না। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি যে সম্পূর্ণ অকপট তার চোখ দেখে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। সে যে ভাবে গদি আঁটা চেয়ারে বসে ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন খোলার ভেতরে বাদামের শাঁস শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে গেছে; বোঝাই যাচ্ছিল যে নিজের কথার সত্যতা সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

'হ্যাঁ,' হাতের নখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে তার কথার জের টেনে বলে চলল, 'ওগুলো দস্তুরমতো ভালো বই। একটা লিখেছেন অবতার পুরুষেরা, আর অন্যটা আমার নিজের রচনা। আমার বইতে কথা কম। সেখানে আছে সংখ্যা। মানুষ যদি সততা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করতে চায় তবে যে সে কী করতে পারে সংখ্যার সাহায্যে তা বলা হয়েছে। আমার মৃত্যুর পর সরকারের উচিত হবে আমার বইটা প্রকাশ করা। লোকে দেখুক এতটা উঁচুতে পৌঁছুতে গেলে কী ভাবে চলতে হয়।'

এই বলে বিজয়ীর মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে সে চারপাশে দৃষ্টি বুলাল।

আমার মন বলল আর নয়, এবারে আলোচনায় ছেদ টানা যাক। যে কোন মাথার পক্ষে এই অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব নয়।

'আপনি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?' আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'বিজ্ঞান?' সে আঙুল তুলল, চোখ সিলিং-এর দিকে ওঠাল। তারপর ঘড়ি বার করে তাকিয়ে দেখল কটা বাজে, ঘড়ির ডালা বন্ধ করল এবং ঘড়ির চেন আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে ঘড়িটা বার কয়েক শূন্যে দোলাল। এ সমস্তের পর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল:

'বিজ্ঞান... হ্যাঁ, আমি জানি! এর মানে হল বই। যদি আমেরিকা সম্পর্কে ভালো কথা লেখে তাহলে বলতে হবে উপকারী বই! কিন্তু বইয়ে সত্যি

কথা কদাচিৎ লেখা হয়। এই সব কবি-টবি... যারা বইপুথি বানায়, আমার ধারণায় তাদের রোজগারপাতি অল্প। যে দেশে প্রতিটি লোক যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সেখানে বই পড়ার লোক নেই।... আর হ্যাঁ, কবিরা রাগী স্বভাবের, কেননা তাদের বই কেউ কেনে না। সরকারের উচিত লেখকদের ভালো পারিশ্রমিক দেওয়া। যে লোকের পেট ভরা তার মন মেজাজ সব সময় ভালো আর খুশি থাকে। আর আমেরিকা সম্পর্কে বই যদি আদৌ দরকার হয় তাহলে ভালো ভালো কবিদের ভাড়া করা উচিত, তাহলে আমেরিকার জন্যে যা যা বইয়ের প্রয়োজন সব তৈরি হবে।... এই হল কথা।'

'আপনার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা খানিকটা সঙ্কীর্ণ,' আমি মন্তব্য করলাম।

সে চোখের পাতা নামিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। তারপর আবার চোখ খুলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলে চলল:

'হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক, শিক্ষক, দার্শনিক... এও বিজ্ঞান বটে। প্রফেসর, মিডওয়াইফ, ডেণ্টিস্ট... আমি জানি। উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র। অল্ রাইট। এ সব খুবই দরকারী। যে বিজ্ঞান ভালো তা খারাপ কিছু শেখাতে পারে না। কিন্তু আমার মেয়ের টীচার আমাকে এক দিন বলেছিল যে সমাজবিজ্ঞান বলে নাকি একটা বিজ্ঞান আছে।... এটা আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় জিনিসটা ক্ষতিকারক। ভালো বিজ্ঞান কোন সমাজতন্ত্রীর তৈরি হতে পারে না। বিজ্ঞান নিয়ে সমাজতন্ত্রীদের আদৌ কিছু করতে দেওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ বিজ্ঞান করেছেন বটে এডিসন - দরকারী কিংবা মজার যা-ই বলুন। ফোনোগ্রাফ, সিনেমা - কাজের জিনিস। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে যখন অনেক বইপুথি এসে জোটে সেটা হয় বাড়তি। মাথার ভেতরে নানা রকম সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারে এমন বইপুথি লোকের পড়া উচিত নয়। পৃথিবীতে সব কিছু যেমন দরকার তেমনি চলছে।... মোট কথা, কাজের সঙ্গে বই গুলিয়ে ফেলার কোন মানে হয় না।'

আমি উঠে পড়লাম।

ও, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ!' আমি বললাম। 'এখন, আমি যখন চলে যাচ্ছি, আপনি হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকে বুঝিয়ে বলবেন - কোটিপতি হওয়ার অর্থটা কী?'

উত্তর দেওয়ার বদলে সে হিক্কা তুলতে লাগল, পা ঝাঁকাতে লাগল। কে বলতে পারে এটাই তার হাসার ভঙ্গি কিনা?

'এটা অভ্যেস! হাঁপ ছেড়ে সে চেঁচিয়ে বলল।

'কিসের অভ্যেস?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।'

'কোটিপতি হওয়া... এটা অভ্যেস!'

আমি একটু ভেবে তাকে শেষ প্রশ্ন করলাম:

'আপনি বলতে চান ভবঘুরে, চণ্ডুখোর আর কোটিপতি একই পর্যায়ে পড়ে?'

এতে সম্ভবত সে ক্ষুণ্ণ হল। সে চোখ গোল গোল করে তাকাল, বিরক্তি ভরে তার চোখে সবুজ রঙ ধরল। বিরস কণ্ঠে সে বলল:

'আমার মনে হয় আপনার শিক্ষাদীক্ষার অভাব আছে।'

'আচ্ছা চললাম,' আমি বললাম।

সে ভদ্রতা করে দেউড়ি পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল, সিঁড়ির ওপরের ধাপে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের পায়ের জুতোর সামনের দিকটা লক্ষ করতে লাগল। তার বাড়ির সামনে সমান করে ছাঁটা ঘন ঘাসে ভর্তি লন। তার ওপর দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে আমি এই ভেবে পরম তৃপ্তি উপভোগ করতে লাগলাম যে এ লোকটির সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। এমন সময় আমি আমার পেছন থেকে শুনতে পেলাম:

'হ্যালো, শুনছেন?'

আমি ঘুরে তাকালাম। সে তখনও দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল।

'আচ্ছা, আপনাদের ইউরোপে বাড়তি রাজা-টাজা আছে কি?' সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে হয় তারা সবাই বাড়তি!' আমি জবাব দিলাম।

সে ডান দিকে ফিরে থুতু ফেলে বলল:

'আমি ভাবছি আমার নিজের জন্যে এক জোড়া রাজা ভাড়া নিলে কেমন হয়? আপনি কী বলেন?'

'আপনি নিতে যাবেন কী করতে?'

'বেশ মজার, বুঝলেন কিনা। আমি ওদের এই এখানে বক্সিং খেলতে হুকুম দিতাম...'

বাড়ির সামনের লনটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রশ্নের সুরে যোগ করল:

'রোজ একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। কী বলেন? খাওয়া দাওয়ার পর আধ ঘণ্টা শিল্পকলার পেছনে দেওয়া আনন্দের বটে... বেশ ভালো।'

কথাগুলো সে বলছিল বেশ গুরুত্ব দিয়ে। বোঝাই যাচ্ছিল নিজের বাসনা বাস্তবে পরিণত করার জন্য সে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবে না।

‘এটাই যদি আপনার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে রাজার কী দরকার?’ আমি জানতে চাইলাম।

‘এমন জিনিস এখানে এখনও কারও নেই!’ সে সংক্ষেপে জানাল।

‘কিন্তু রাজাদের অভ্যেস ত কেবল অন্য লোকদের দিয়ে যুদ্ধ করানো!’ এই বলে আমি আমার পথ ধরলাম।

‘হ্যালো, শুনছেন?’ আবার সে আমাকে ডাকল।

আমি ফের দাঁড়িয়ে পড়লাম। সে তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেই আগের জায়গায়, পকেটে হাত গুঁজে। তার মুখে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব।

‘কী হল আপনার?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে বিবেচনার ভঙ্গি করে, ধীরে ধীরে বলল:

‘আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় --- বক্সিংয়ের জন্য দুটো রাজা, রোজ আধ ঘণ্টা করে, তিন মাসের জন্য কত দাম হতে পারে, অ্যাঁ?’

১৯০৬

নীতিধর্মের গুরুঠাকুর

সে যখন আমার কাছে এলো তখন বেশ রাত। সন্দেহের দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল:

‘আপনার সঙ্গে আমি একান্তে আধ ঘণ্টাখানেক কথা বলতে পারি কি?’

তার কণ্ঠস্বরে এবং তার কোলকুঁজো, রোগা দেহটার মধ্যে আগাগোড়া রহস্যজনক ও শঙ্কাজনক কী যেন একটা ছিল। সে এত সন্তর্পণে চেয়ারে বসল যেন তার ভয় হচ্ছিল আসবাবটা তার দীর্ঘ ও তীক্ষ্ন হাড়গুলোর ওজন সহ্য করতে পারবে না।

‘জানলার খড়খড়িটা নামিয়ে দেবেন কি?’ মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

‘অবশ্যই,’ বলে আমি তৎক্ষণাৎ তার ইচ্ছা পূরণ করলাম।

আমার দিকে মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে চোখ টিপে জানলার দিকে ঈঙ্গিত করল আর নীচু গলায় মন্তব্য করল:

‘সর্বক্ষণ নজর রাখে ওরা।’

‘ওরা কারা?’

'কারা আবার? রিপোর্টাররা।'

আমি মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলাম। বেশভূষা বেশ ভদ্র, এমনকি অনেকটা শৌখিনই বলা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকটাকে দেখে কেন যেন গরিব-গরিব মনে হয়। তার তে-আঁটিয়া, টেকো মাথার খুলিটা নিজেকে বিন্দুমাত্র জাহির না ক'রে, বিনা আড়ম্বরে চকচক করছে। নিখুঁত কামানো, বিশীর্ণ মুখ; চোখের পাতার হালকা রঙের লোমে আধো-ঢাকা তার ধূসর চোখে কেমন যেন কাচুমাচু হাসি। সে যখন চোখের পাতা তুলে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল তখন আমার সামনে আমি যেন এক ঝাপসা, অগভীর শূন্যতা দেখতে পাচ্ছিলাম। সে বসে ছিল পাজোড়া চেয়ারের নীচে গুটিয়ে, ডান হাতের করতল সে রেখেছিল হাঁটুর ওপর আর বাঁ হাতটা মেঝের ওপর ঝুলছিল, সে হাতে ধরা ছিল একটা গোল টুপি। হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো একটু একটু কাঁপছে, শক্ত চাপা ঠোঁটের কোনা ক্লান্তিভরে ঝুলে পড়েছে লোকটাকে যে তার পোশাকের জন্য বড় রকমের খেসারত দিতে হয়েছে, তারই লক্ষণ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আড়চোখে জানলার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সে শুরু করল:

'আজ্ঞা হয় ত আমার পরিচয় দিই।... আমি হলেম গিয়ে... যাকে বলে, একজন পেশাদার পাপী।...'

আমি এমন ভাব করলাম যেন তার কথাটা আমি শুনতে পাই নি। বাইরে শান্ত ভাব বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলাম:

'মাফ করবেন। কী বললেন?'

'আমি একজন পেশাদার পাপী,' সে অক্ষরে অক্ষরে আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল, তারপর যোগ করল, 'সামাজিক নীতিবোধের বিরুদ্ধে অপরাধ করে বেড়ানো আমার বৃত্তি।'

এই কথাগুলো সে যেই সুরে বলল তার মধ্যে বিনয়ের ভাব ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পেল না; আমি তার কথায় বা মুখের ভঙ্গিতে কোথাও অনুতাপের এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

'এক গেলাস জল ইচ্ছে করেন কি?' আমি তাকে বললাম।

'না, ধন্যবাদ!' সে প্রত্যাখ্যান করল। তার হাসি-হাসি কাচুমাচু চোখের দৃষ্টি আমার ওপর এসে থেমে গেল।

'আমার মনে হয় আপনি আমার কথা খুব একটা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না।'

'কেন? তা হতে যাবে কেন?' ইউরোপীয় সাংবাদিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কুণ্ঠাহীনতার আড়ালে অজ্ঞতাকে ঢেকে রেখে আমি আপত্তি তুলে বললাম। কিন্তু বোঝা গেল লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। হাতের গোল টুপিটা শূন্যে এদিক-ওদিক নাচাতে নাচাতে মৃদু হেসে সবিনয়ে সে বলতে শুরু করল:

'আপনি যাতে বুঝতে পারেন আমি কে, সেই জন্য আমার কার্যকলাপের কিছু কিছু উল্লেখ আপনার কাছে করব।...'

এই বলে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করল। এবারেও আমি তার এই দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে শুধু ক্লান্তির আভাস পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আস্তে আস্তে টুপিটা দোলাতে দোলাতে সে বলতে শুরু করল, 'আপনার মনে আছে কি, খবরের কাগজে একটা লোকের কথা লেখা হয়েছিল... এক মাতাল সম্পর্কে? সেই যে থিয়েটারে কেলেঙ্কারীর ঘটনা?'

'ও, সামনের সারির সেই ভদ্রলোক, যে কিনা কোন এক মর্মান্তিক দৃশ্যের সময় মাথায় হ্যাট পড়ে 'গাড়োয়ান গাড়োয়ান' বলে চেঁচাতে থাকে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন,' বলে সে অনুগ্রহ করে নিজে থেকে যোগ করল, 'আমিই সেই লোক। 'শিশু নির্যাতনকারী পশু' ··· এই শিরনামায় মন্তব্য – এটাও আমার উদ্দেশ্যে, যেমন আরও একটা ·· 'স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিক্রয়'... রাস্তায় এক ভদ্রমহিলার পশ্চাদনুসরণ করে সেই যে একজন পুরুষ অশালীন প্রস্তাব দিয়েছিল – সেও আমি।... মোটের ওপর আমার সম্পর্কে কমসে কম সপ্তাহে একবার করে কাগজে লেখা হয়, আর প্রত্যেকবার তখনই লেখা হয় যখন লোকের স্বভাবচরিত্র যে খারাপ হয়ে গেছে তা প্রমাণ করার দরকার দেখা দেয়।'

এ সবই সে বলছিল অনুচ্চ স্বরে, বেশ স্পষ্ট করে, কিন্তু তার মধ্যে বড়াইয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু সেটা ভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। আর দশজন লেখকের মতো আমিও এমন ভাব করি যেন মানুষ আর জীবনের সমস্ত রহস্য আমার নখদর্পণে।

'হুম্!' কণ্ঠস্বরে দার্শনিকের ভাব ফুটিয়ে তুলে আমি বললাম। 'তা এই ধরনের কাজে সময় ব্যয় করে আপনি কি তৃপ্তি পান?'

উত্তরে সে বলল, 'আমার বয়স যখন কম ছিল, বলতে বাধা নেই, তখন আমি এতে মজা পেতাম। কিন্তু এখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমি

বিবাহিত, আমার দুটি কন্যা আছে।... এই অবস্থায় যখন কাগজে সপ্তাহে দু'বার-তিনবার করে আপনাকে অসচ্চরিত্র ও লাম্পট্যের উৎস হিশেবে আঁকা হয় তখন বড় অস্বস্তি লাগে বৈ কি। আপনি যাতে ঠিক ঠিক এবং যথা সময়ে আপনার কর্তব্য পালন করেন তার জন্য রিপোর্টাররা সর্বক্ষণ আপনার ওপর নজর রাখে।'

আমি আমার হতভম্ব ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যে কাশতে শুরু করে দিলাম। তারপর সমবেদনার সুরে জিজ্ঞেস করলাম:

'এটা কি আপনার কোন রোগ?'

সে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল, টুপিটা হাতপাখার মতো করে মুখের ওপর নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে উত্তর দিল:

'না, এটা আমার পেশা। আমি ত আপনাকে বলেইছি যে আমার বৃত্তি হল রাস্তায় ঘাটে ও প্রকাশ্য স্থানে ছোটখাটো কেলেঙ্কারী বাধানো।... আমাদের ব্যুরোর অন্যান্য যে-সমস্ত বন্ধুবান্ধব আছে তারা আরও বড় বড় ও দায়িত্বসম্পন্ন কাজে আছে -- এই ধরুন, কোন ধর্মবোধে আঘাত করা, স্ত্রীলোক বা কুমারী মেয়েকে ফুসলানো, চুরি-বাটপারি - তবে হাজার ডলারের ওপরে নয়।...' সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'এই রকম আরও সব নীতিবিগর্হিত কাজকর্ম।... তবে আমি যা করি তা হল কেবল ছোটখাটো কেলেঙ্কারী।...'

কোন কারিগর তার কারিগরি সম্পর্কে যে ভাবে বলে থাকে সেও সেই ভাবে বলে যাচ্ছিল। শুনে আমার বিরক্তি ধরে যেতে লাগল, আমি তাই ব্যঙ্গ করে বললাম:

'এতে কি আপনি সন্তুষ্ট নন?'

'না,' তার সাফ জবাব।

তার এই সারল্য আমাকে নিরস্ত্র করল, আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলল এক তীব্র কৌতূহল। একটু চুপ করে থাকার পর আমি প্রশ্ন করলাম:

'আপনি জেল খেটেছেন?'

'তিন বার। তবে মোটের ওপর আমি জরিমানার এক্তিয়ারের মধ্যেই কাজ করি। জরিমানা দেয় অবশ্য ব্যুরো,' সে বলল।

'ব্যুরো?' নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম।

'হ্যাঁ, তবে বলছি কী? আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আমার নিজের পক্ষে জরিমানার টাকা দেওয়া অসম্ভব!' মৃদু হেসে সে বলল। 'হপ্তায় পঞ্চাশ ডলার -- চারজনের একটা পরিবারের পক্ষে খুবই সামান্য...'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমাকে এ সম্পর্কে একটু ভাবতে দিন।'

'অবশ্যই,' সে রাজী হয়ে বলল।

আমি তার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে আগে-পিছে পায়চারী করতে করতে কত রকমের মানসিক ব্যাধি থাকতে পারে মনে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। তার রোগের সঠিক চরিত্র নির্ণয়ের ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু আমি পারলাম না। আমার কাছে একটা জিনিসই পরিষ্কার হল যে এটা হামবড়া অভ্যাস নয়। শীর্ণ, ক্ষীণ মুখে বিনীত হাসি-হাসি ভাব ফুটিয়ে তুলে সে আমার হাবভাব লক্ষ করতে লাগল, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল আমি কী বলি।

'হ্যাঁ, তাহলে বলছিলেন যে একটা ব্যুরো আছে?' তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' সে বলল।

'সেখানে কি অনেক কর্মচারী?'

'এই শহরের কথা যদি বলেন ত ১২৫ জন পুরুষ আর ৭৫ জন মেয়েমানুষ...'

'বলছেন এই শহরে? তার মানে... অন্যান্য শহরেও ব্যুরো আছে বলতে চান?'

'অবশ্যই, সমস্ত দেশ জুড়ে আছে!' এই বলে পৃষ্ঠপোষকের ভঙ্গিতে সে মৃদু হাসল।

'কিন্তু... তারা...' আমি ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ব্যুরোগুলো কী করে?'

'কী আবার করবে? নীতিশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করে!' বিনীত ভাবে সে নিবেদন করল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আরাম-চেয়ারে গিয়ে বসে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে অকপট কৌতূহল নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার মুখ দেখতে লাগল। বুঝতে বাকি রইল না যে আমাকে তার মনে হচ্ছিল একটা অসভ্য জংলী, তাই এখন তার আগেকার লজ্জা-সঙ্কোচও ঘুচে গেছে।

'মরুক গে!' আমি মনে মনে ভাবলাম। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না এটা বুঝতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি তাই হাতে হাত ঘষে সোৎসাহে বললাম:

'ব্যাপারটা কৌতূহলজনক বটে! খুবই কৌতূহলজনক! ...তবে কিনা... কেন, কী দরকার এর?'

'কিসের?' সে মৃদু হাসল।

'নীতিশাস্ত্রের আইন ভাঙার জন্য এই যে সব ব্যুরো এগুলোর কথা বলছি।'

আমার কথায় সে প্রসন্ন হাসি হাসল — বাচ্চাদের আহাম্মকি দেখলে বড়রা যেমন হাসে। আমি তার দিকে তাকালাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল বাস্তবিকই জীবনের সমস্ত অপ্রীতিকর বিষয়ের উৎস হল অজ্ঞতা।

'আপনার কী মনে হয়? — জীবন ধারণ করার দরকার আছে, না কি নেই?' সে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই আছে!'

'আর জীবন ধারণ করা উচিত ভালো ভাবে, তাই না?'

'একশ' বার!'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে চাপড় মারল।

'নীতিশাস্ত্রের আইন লঙ্ঘন না করে জীবন উপভোগ করা যায় কি? আপনার কী মনে হয়, অ্যাঁ?'

সে আমার কাছ থেকে পিছনে সরে গেল, আমাকে লক্ষ করে চোখ টিপল, খাবার থালার ওপর সেদ্ধ মাছের মতন ধপাস করে ফের আরাম চেয়ারে গিয়ে পড়ল, একটা চুরুট বার করে আমার অনুমতির কোন তোয়াক্কা না করে ধরাল। তারপর বলে চলল:

'কার্বলিক এসিড দিয়ে স্ট্রবেরি খেতে কার ভালো লাগে শুনি?' সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠিটা সে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

এটাই চিরকালের নিয়ম — কেউ যখন তার ধারেকাছের কোন লোকের ওপর নিজের প্রাধান্য উপলব্ধি করতে পারে তক্ষুনি সে তার সঙ্গে শুয়োরের মতো আচরণ করতে থাকে।

'আপনাকে বোঝা আমার পক্ষে কঠিন!' তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে স্বীকার করতে হল।

সে মৃদু হেসে বলল:

'আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার কিন্তু উঁচু ধারণা ছিল...'

নিজের আচারব্যবহার সম্পর্কে তার ঢিলেমির মাত্রা উত্তরোত্তর এতো বাড়তে লাগল যে শেষ পর্যন্ত সরাসরি মেঝের ওপর সে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলল,

চোখের পাতার লোমের ফাঁক দিয়ে আধবোজা চোখে তার চুরুটের ধোঁয়ার স্রোত লক্ষ করতে করতে একজন নীতিবিশারদের চালে বলল:

'নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে আপনার বিশেষ জানা নেই দেখছি...'

'কথাটা ঠিক নয়, প্রায়ই তার সম্মুখীন হতে হয় আমাকে,' আমি তার কথায় আপত্তি তুলে বিনীত ভাবে জানালাম।

সে মুখের ফাঁক থেকে চুরুটটা বার করে তার শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দার্শনিকসুলভ ভঙ্গিতে মন্তব্য করল:

'দেয়ালে কপাল খোঁড়ার অর্থ এই নয় যে আপনি দেয়াল সম্পর্কে জেনে বসে আছেন।'

'হ্যাঁ আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু কেন জানি না বল্ যেমন দেয়ালে লেগে ছিটকে বেরিয়ে আসে, আমিও তেমনি নীতিশাস্ত্র থেকে সব সময় ছিটকে যাই।'

'এখানে আপনার শিক্ষাদীক্ষার ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে!' সে সাড়ম্বরে রায় দিল।

'খুবই সম্ভব,' আমি স্বীকার করলাম। 'সবচেয়ে মরিয়া ধরনের যে নীতিবাগীশকে আমি জানতাম, তিনি হলেন আমার দাদামশাই। তিনি স্বর্গের সমস্ত পথ জানতেন, যাকে হাতের কাছে পেতেন তাকেই অনবরত সেই পথে ঠেলে নামানোর চেষ্টা করতেন। সত্য কেবল একা তিনি জানতেন, আর হাতের সামনে যা পেতেন মহা উৎসাহে তাই দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেই সত্য তিনি পরিবারের সকলের মাথার ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করতেন। ভগবান মানুষের কাছ থেকে কী কী চান তিনি খুব ভালো করে জানতেন — এমনকি কুকুর-বেড়ালকেও তিনি শেখাতেন শাশ্বত স্বর্গসুখ অর্জন করতে গেলে কেমন আচরণ করা উচিত। এত সব সত্ত্বেও তিনি ছিলেন লোভী, হীন স্বভাবের, হরদম মিথ্যে বলতেন, মহাজনী কারবার করতেন, আর ভীতু লোক নিষ্ঠুর হলে যেমন হয় -- যেটা যে-কোন নীতিবাগীশের আত্মার বিশেষত্ব — অবসর সময়ে, সুযোগ পেলেই যা দিয়ে পারতেন এবং যে ভাবে তাঁর খুশি, তিনি তাঁর বাড়ির লোকজনকে ধরে পেটাতেন।... দাদামশাইয়ের মনকে নরম করার বাসনায় আমি তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলাম — একবার বুড়োকে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, আরেকবার আমি তাকে আরশি ছুঁড়ে মারলাম। আয়না আর সার্শি দুই-ই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু এতে তাঁর স্বভাবের কোন উন্নতি হল না। তিনি নীতিবাগীশ অবস্থায়ই মারা

গেলেন। এর পর থেকে নীতিশাস্ত্রের প্রতি আমার এক ধরনের অভক্তি ধরে গেছে।... তার সঙ্গে আপস করার কোন উপায় আপনি আমাকে বাতলে দেবেন কি?' আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম।

সে ঘড়ি বার করে তাকিয়ে দেখে বলল:

'আপনাকে বক্তৃতা শোনাবার মতো সময় আমার নেই।... তবে আমি যখন আপনার কাছে এসেছি তখন আর কী উপায়? কোন জিনিস শুরু করলে তা শেষ করাই উচিত। হয়ত বা আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারবেন।... আমি সংক্ষেপে সারছি।...'

সে ফের চোখ আধবোজা করে প্রভাবব্যঞ্জক স্বরে বলতে শুরু করল:

'নীতিশাস্ত্র আপনার পক্ষে একান্ত দরকার — এটা মনে রাখা চাই! একান্ত দরকার কেন? তার কারণ এই যে নীতিশাস্ত্র আপনার গৃহশান্তি, আপনার অধিকার ও আপনার সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করে — অন্য কথায় বলতে গেলে, 'তোমার প্রতীবেশীর' স্বার্থ রক্ষা করে। আর 'তোমার প্রতিবেশী' সে হল সব সময় আপনি -- আপনি ছাড়া আর কেউ নয়, বুঝলেন ত? যদি আপনার সুন্দরী স্ত্রী থাকে আপনি আপনার আশেপাশের সকলকে বলুন: 'তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লুব্ধ হইও না।' কোন লোকের যদি টাকাকড়ি থাকে, বলদগোরু, ক্রীতদাস আর গাধা থাকে এবং সে নিজে যদি নেহাৎ মূর্খ না হয় তাহলেই সে নীতিবাগীশ হতে পারে। নীতিশাস্ত্র আপনার পক্ষে তখনই লাভজনক যখন আপনার যা যা প্রয়োজন সব আপনার আছে; নীতিশাস্ত্রে কোন লাভ হয় না যদি আপনার মাথার চুল ছাড়া বাড়তি কিছু আপনার না থাকে।'

সে তার নগ্ন করোটির ওপর হাত বুলিয়ে বলে চলল:

'নীতিশাস্ত্র হল আপনার স্বার্থের রক্ষক, আপনার আশেপাশের লোকজনদের মনের মধ্যে তা গেঁথে দেবার চেষ্টা করুন আপনি। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ আর গোয়েন্দা লাগিয়ে দিন, লোকের মনের মধ্যে গুচ্ছের কতকগুলো মূলনীতি গুঁজে দিন -- সেগুলো তার মস্তিষ্কের ভেতরে শেকড় গাড়ুক, সেখানে বাসা বাঁধুক, আপনার বিরুদ্ধে যায় এমন সমস্ত চিন্তাভাবনার, আপনার অধিকার বিপন্ন করে তুলতে পারে এমন সমস্ত বাসনার শ্বাসরোধ করুক, ধ্বংসসাধন করুক। নীতির সেখানেই বেশি কড়াকড়ি যেখানে অর্থনৈতিক বিরোধ বেশি প্রত্যক্ষ। আমার টাকা যত বেশি, আমি তত কট্টর নীতিবাগীশ। ঠিক এই কারণেই আমেরিকায়,

যেখানে ধনীরা সংখ্যায় এত বেশি, তারা একশ' অশ্বশক্তিতে নীতি প্রচার করে থাকে। আমার কথা বুঝলেন ত?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি,' আমি বললাম, 'কিন্তু ব্যুরো এখানে কোত্থেকে আসে?'

'সবুর করুন!' আমার কথার উত্তরে গম্ভীর ভাবে হাত তুলে সে বলল। 'সুতরাং দেখা যাচ্ছে নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল সব লোককে এই কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে তারা যেন আপনাকে না ঘাঁটায়। কিন্তু আপনার যদি প্রচুর টাকা থাকে তবে আপনার অসংখ্য সাধ থাকবে এবং সেই সঙ্গে সাধ মেটানোর পুরোপুরি সুযোগও থাকবে — ঠিক কিনা? অথচ আপনার অধিকাংশ সাধই নীতিশাস্ত্রের মূল নিয়মকানুন লঙ্ঘন না করে মেটানো সম্ভব নয়। তাহলে উপায় কী? এমন জিনিস লোকজনের কাছে প্রচার করা উচিত নয় যা আপনি নিজেই মানেন না; ব্যাপারটা বেখাপ্পা ত বটেই, তা ছাড়া লোকে আপনাকে বিশ্বাস নাও করতে পারে। হাজার হোক তারা সকলেই ত আর মূর্খ নয়।... যেমন ধরুন, আপনি রেস্তোরাঁয় বসে শ্যাম্পেন পান করছেন এবং এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীর মুখচুম্বন করছেন, যদিও সে রমণী আপনার ঘরনী নয়।... আপনি যে আদর্শকে সকলের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয় বলে মনে করেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এ ধরনের কাজ নীতিবিগর্হিত। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আপনার জন্য এই ভাবে সময় কাটানো একান্ত দরকার — এটা আপনার বড় মধুর একটা অভ্যাস, এতে আপনি প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। আপনার সামনে তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়: আপনি যে পাপাচার থেকে বিরত থাকার বাণী প্রচার করছেন তার সঙ্গে সেই পাপাচারের প্রতি আপনার আসক্তিকে কী ভাবে মেলানো যায়? আরও একটি দৃষ্টান্ত -- আপনি সকলকে বলে বেড়াচ্ছেন, 'চুরি করিও না'; এর কারণ, আপনার নিজেরই অত্যন্ত খারাপ লাগবে যদি লোকে আপনার সম্পত্তি চুরি করতে থাকে — তাই না? কিন্তু সেই সঙ্গে, আপনার টাকাকড়ি থাকলে কী হবে, আরও খানিকটা হাতানোর জন্য আপনার হাত নিশপিশ করতে থাকে। তৃতীয়ত, আপনি 'হত্যা করিও না' নীতি কঠোর ভাবে মেনে চলেন; কারণ এই যে জীবন আপনার কাছে মূল্যবান, প্রীতিকর, উপভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। হঠাৎ একদিন দেখা গেল আপনার কয়লাখনিতে মজুরেরা মজুরী বাড়ানোর দাবি করছে। আপনি সৈন্যবাহিনী তলব না করে পারেন না — ব্যস, গুড়ুম! -- ডজন কয়েক মজুরের লাশ পড়ে গেল। কিংবা ধরুন, আপনার মাল বেচার

মতো বাজার আপনি পাচ্ছেন না। আপনি এই ঘটনাটা আপনার সরকারের গোচরীভূত করুন, সরকারকে রাজী করান যাতে আপনার জন্য নতুন বাজার খোলে। সরকার গদগদ হয়ে একটা ছোটখাটো সৈন্যদল এশিয়া বা আফ্রিকার কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে কয়েক শ' বা কয়েক হাজার দেশীয় লোককে গুলি ক'রে নামিয়ে দিয়ে আপনার বাসনা পূরণ করল। ...আপনি যে মানবপ্রেম, সংযম ও সদাচারের কথা বলেন এর কোনটার সঙ্গে তার তেমন একটা সঙ্গতি দেখা যায় না। কিন্তু শ্রমিক বা ভিনদেশী লোকদের পিটিয়ে আপনি রাষ্ট্রের স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজের দোষ ক্ষালন করতে পারেন, যেহেতু লোকে যদি আপনার স্বার্থ মেনে না চলে তাহলে রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। রাষ্ট্র বলতে যাকে বোঝায় সে হল আপনি — বলাই বাহুল্য, যদি আপনি ধনী হন। ব্যভিচার, চুরিচামারি ইত্যাদি ছোটখাটো নানা ব্যাপার নিয়ে আপনাকে অবশ্য অনেক বেশি মুশকিলে পড়তে হয়। মোটের ওপর ধনী লোকের অবস্থাটা বড় করুণ। তাকে ভালোমতো লক্ষ রাখতে হবে যেন সবাই তাকে ভালোবাসে, তার সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকে, যেন কেউ তার অভ্যাসের অন্তরায় না হয় এবং সকলে তার স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীর সতীত্বের মর্যাদা দেয়। অন্য দিকে তার নিজের পক্ষে অন্য লোকদের ভালোবাসা, চুরিচামারি থেকে বিরত থাকা স্ত্রীলোকের সতীত্বের মর্যাদা দেওয়া ইত্যাদি একান্ত আবশ্যক ত নয়ই বরং তার উলটো। এসব তার ব্যক্তিগত কাজকর্মে অসুবিধা সৃষ্টি ত করবেই, তার কাজের সাফল্যেও বাগড়া দেবে। সচরাচর তার জীবনটা আগাগোড়া চুরিচামারিতে ঠাসা, সে হাজার হাজার লোকের ওপর, গোটা দেশের ওপর লুঠতরাজ করে বেড়ায় — তার পুঁজি বাড়ানোর জন্য, অর্থাৎ দেশের প্রগতির স্বার্থে এটা একান্ত দরকার — আপনি বুঝতে পারছেন? সে গণ্ডা গণ্ডা স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ করে — একজন নিষ্কর্মার পক্ষে এটা অবসরভোগের বড় চমৎকার উপায়। আর কাকে সে ভালোবাসতে যাবে বলুন? তার কাছে মানুষমাত্রেই দুটি দলে বিভক্ত — এক দলের ওপর সে লুটপাট করে, অন্য দল সেই কাজে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।'

আমার প্রশ্নের উত্তরে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বক্তা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল, তারপর চুরুটের পোড়া টুকরোটা ঘরের এক কোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে চলল:

'সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে নীতিশাস্ত্র ধনী লোকের পক্ষে উপকারী, কিন্তু আর সব লোকের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু সেই সঙ্গে বলা যায় ধনীর যেমন

তাতে কোন প্রয়োজন নেই, তেমনি অন্য সকলের পক্ষে তা একান্ত আবশ্যক। ঠিক এই কারণেই নীতিবাগীশরা নীতিশাস্ত্রের মূল নিয়মগুলোকে লোকের মাথার ভেতরে ঠুকে ঢোকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেরা সব সময় টাই বা দস্তানার মতো সেগুলো ওপরে ওপরে পরে থাকে। পরের প্রশ্ন হল নীতিশাস্ত্রের নিয়মকানুন মেনে চলা যে তাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক একথা লোকের মনে কী করে গেঁথে দেওয়া যায়? চোর বাটপারের মাঝখানে সৎ থেকে কারই বা লাভ? কিন্তু বলে কয়ে লোকের মনে যদি বিশ্বাস উৎপাদন করতে একান্তই না পারেন তাহলে তাদের সম্মোহিত করুন! এতে সব সময় কাজ দেয়।'

সে তার কথার সমর্থনে মাথা নাড়ল, আমার দিকে চোখ টিপে আবার বলল:

'বলে কয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করতে যদি না পারেন তাহলে সম্মোহিত করুন।'

তারপর সে আমার হাঁটুর ওপর তার হাত রেখে আমার মুখের দিকে উঁকি মেরে গলার স্বর নামিয়ে বলে চলল:

'এর পরের যা যা কথা সেগুলো কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে — আপনি রাজী?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'আমি যে ব্যুরোতে চাকরী করি তার কাজ হল জনসাধারণের মতামতকে সম্মোহিত করা। আমেরিকায় রীতিমতো মৌলিক ধরনের যে সমস্ত সংস্থা আছে এটি সেগুলোর অন্যতম — খেয়াল রাখবেন কিন্তু!' সে সগর্বে বলল।

আমি আবার মাথা নাড়ালাম।

সে বলল, 'আপনি জানেন, আমাদের দেশ একমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়ে চলছে — তা হল টাকা তৈরি করা। এখানে সকলেই চায় ধনী হতে, মানুষের কাছে মানুষ স্রেফ একটা উপাদান যাকে দোহন করলে যে-কোন সময় কয়েক দানা সোনা পাওয়া যেতে পারে। সমস্ত জীবনটা হল মানুষের রক্ত-মাংস নিঙড়ে সোনা বার করার একটা প্রক্রিয়া। এদেশে — এবং আমি শুনেছি, আর সব জায়গাতেও — মানুষ হল পীতবর্ণের ধাতু নিষ্কাশনের খনি; প্রগতি — জনসাধারণের কেন্দ্রীভূত দৈহিক বল, অর্থাৎ মানুষের অস্থিমজ্জা, মাংস ও স্নায়ু কেলাসিত হয়ে স্বর্ণে পরিণত হলে যা হয় তা-ই। জীবন গড়ে উঠেছে খুব সাধারণ ভাবে...'

'এটা আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা? অবশ্যই নয়!' সে সগর্বে বলল। 'এটা স্রেফ কারও উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত।... আমার মাথায় কী করে ঢুকল মনে করতে পারছি না।... আমি এটা ব্যবহার করি একমাত্র তখনই, যখন লোকজনের সঙ্গে... অস্বাভাবিক লোকজনের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হয়।... যা হোক, যা বলছিলাম। এখানে লোকের নীতিবিগর্হিত কাজ করার অবকাশ নেই — এর জন্য এতটুকু অবসর সময় তারা পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রচণ্ড খাটাখাটুনি ক'রে লোকে এত অবসন্ন হয়ে পড়ে যে বিশ্রামের সময়টুকুতে পাপকাজ করার বাসনা আর তাদের থাকে না। লোকে ভাবার অবকাশ পায় না, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করার মতো শক্তি তাদের থাকে না, কেবল কাজ নিয়ে থাকে, স্রেফ কাজের জন্য তাদের জীবন; ফলে তাদের নীতিজ্ঞান হয় খুব প্রবল। তবে হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে ছুটিছাটা বা উৎসব পার্বণের দিনে কিছু ছেলেছোকরা মিলে হয়ত একজোড়া নিগ্রোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল -- কিন্তু এটা নীতিবিরুদ্ধ বলে ধর্তব্য নয়, কেননা নিগ্রোরা সাদা চামড়ার লোক নয়, তার ওপরে তারা -- এই নিগ্রোগুলো এখানে সংখ্যায় অনেক। কম বেশি সব লোক ভদ্র স্বভাবের; পুরনো গোঁড়া নীতিশাস্ত্রের আঁটসাঁট চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা এই বদ্ধ জীবনের সাধারণ ধূসর পটভূমিকায় তার যে কোন মূল নিয়ম লঙ্ঘন করার সঙ্গে সঙ্গে কালো ঝুলকালির ছাপের মতো তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। ব্যাপারটা ভালো, কিন্তু মন্দও বটে। সমাজের ওপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীর লোকদের আচরণে গর্ব বোধ করতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এধরনের আচরণ ধনীদের কার্যকলাপের স্বাধীনতায় ব্যাঘাতও সৃষ্টি করে। তাদের টাকাকড়ি আছে — তার মানে নীতিশাস্ত্রের তোয়াক্কা না করে যেমন খুশি জীবন যাপনের অধিকার তাদের আছে। ধনীরা লোভী, যারা অন্নতৃপ্ত তারা কামুক, যারা নিষ্কর্মা তারা অসচ্চরিত্র। আগাছার পুষ্টি উর্বর জমিতে, ব্যভিচারের পুষ্টি চরম পরিতৃপ্তির জমিতে। তাহলে উপায় কী? নীতিশাস্ত্রকে অস্বীকার করা? সেটা অসম্ভব, যেহেতু তা হবে মূর্খতার সামিল। লোকে সচ্চরিত্র হলে যদি আপনার লাভ হয় তাহলে নিজের চরিত্রের খুঁত ঢেকে রাখতে শিখুন... তাহলেই চুকে গেল! ব্যাপারটা তেমন একটা নতুন কিছু নয়...'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে গলার স্বর আরও নামাল।

'সৌভাগ্যের কথা, ন্যু ইয়র্কের ওপরতলার সমাজের যারা মুখপাত্র, তাদের মাথায় তাই একটা চমৎকার চিন্তা খেলেছে। নীতিশাস্ত্রের

আইনকানুন প্রকাশ্যে লঙ্ঘনের জন্য তারা দেশে একটা গুপ্ত সমিতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চাঁদা তুলে বেশ শাঁসাল মূলধন সংগ্রহ করা গেল, তা দিয়ে দেশের বিভিন্ন শহরে — বলাই বাহুল্য, ঢেকে ঢেকে -- খোলা হল জনমত সম্মোহনের ব্যুরো। তারা আপনার এই অধম দাসের মতো নানা রকমের লোকজন ভাড়া নিয়ে তাদের ওপর নীতিশাস্ত্রবিরোধী অপরাধ করার ভার দিয়েছে। প্রতিটি ব্যুরোর প্রধান হল একজন করে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক -- সে অন্যান্য কর্মচারীদের কাজের তদারক করে, তাদের কাকে কী কাজ করতে হবে ঠিক করে দেয়।.. সচরাচর সে হয় কোন কাগজের সম্পাদক।'

'ব্যুরোগুলোর উদ্দেশ্য ত আমি বুঝতে পারছি না!' বেজার হয়ে আমি বললাম।

'খুব সোজা!' উত্তরে সে বলল। কিন্তু তারপর হঠাৎ তার মুখের ওপর ফুটে উঠল কিসের যেন একটা অস্থির প্রতীক্ষা আর উদ্বেগের চিহ্ন। সে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেছনে মুড়ে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল।

'খুব সোজা!' সে আবার বলল। 'আমি ত আপনাকে বলেইছি যে নীচু শ্রেণীর লোকদের সময়ের অনটন থাকায় তারা কম পাপ করে। অন্যদিকে নৈতিকতা লঙ্ঘন করাও একান্ত দরকার! -- হাজার হোক তাকে ত আর বন্ধ্যা চিরকুমারী করে রাখা যায় না। নৈতিকতা নিয়ে সব সময় চিৎকার-চেঁচামেচি হওয়া দরকার — এর ফলে সমাজের কানে তালা ধরে যায়, তখন আর সত্য তার কানে যায় না। নদীর জলে যদি একগাদা ছোট ছোট কুচি ফেলা যায় তাদের মাঝখানে আপনার অলক্ষ্যে একটা বড় গুঁড়িকাঠ ভাসতে ভাসতে চলে যেতে পারে। কিংবা আপনি যদি তেমন সাবধানতার আশ্রয় না নিয়ে আপনার পাশের লোকের পকেট থেকে মনিব্যাগ টেনে বার করেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় রাস্তার একটা বাচ্চা ছেলেকে এক মুঠো বাদাম চুরি করতে দেখে জনসাধারণের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করতে পারেন তাহলে কেলেঙ্কারী থেকে বেঁচে গেলেও যেতে পারেন। কেবল যত জোরে পারেন চেঁচাবেন — চোর! আমাদের ব্যুরোর কাজ হল বড় বড় অপরাধ আড়াল করার উদ্দেশ্যে বহু ছোট ছোট কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করা।'

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না।

'ধরুন, শহরে রটে গেছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে ধরে পেটান। ব্যুরো তৎক্ষণাৎ আমাকে এবং আমার আরও কয়েকজন বন্ধুকে আজ্ঞা দেয় আমরা যেন আমাদের বৌদের ধরে পেটাই। আমরা পেটাই। আমাদের বৌরা এ ব্যাপারে অবগত আছে, তাই তারাও তারস্বরে চেঁচায়। এ সম্পর্কে সমস্ত পত্রপত্রিকায় লেখা হয়, সোরগোল পড়ে যায়, আর এই সোরগোলের ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিটির স্ত্রীর প্রতি আচরণের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। ঘটনা যখন হাতের কাছে তখন গুজব নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? কিংবা সেনেটরদের ঘুষ নেওয়া সম্পর্কে কথা বলাবলি শুরু হয়েছে। ব্যুরো কালবিলম্ব না করে পুলিশ কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের বেশ কিছু ব্যবস্থা করে ফেলল এবং জনসাধারণের সামনে তাদের দুর্নীতির স্বরূপ তুলে ধরল। ফের ঘটনার সামনে পড়ে গুজব অন্তর্ধান করল। উঁচুতলার সমাজের কেউ হয়ত কোন মহিলাকে অপমান করেছে। তৎক্ষণাৎ রেস্তোরাঁয়, রাস্তায় ঘাটে মহিলাদের লাঞ্ছনার কতকগুলো ঘটনা সংঘটিত হল। একই ধরনের অসংখ্য অপরাধের মধ্যে সম্পূর্ণ তলিয়ে যায় উঁচুতলার সমাজের সেই লোকটির কুকর্ম। সর্বত্র আকছার এই ঘটছে। ছোটখাটো চুরির গাদার নীচে বড় চুরি চাপা পড়ে যাচ্ছে — মোটের ওপর সমস্ত বড় বড় অপরাধ ছোটখাটো অপরাধের চাপে পড়ে তলিয়ে যায়। এই হল ব্যুরোর কাজ।'

সে জানলার ধারে এগিয়ে এসে সন্তর্পণে রাস্তায় উঁকি মারল, তারপর আবার চেয়ারে বসে পড়ে মৃদুস্বরে বলে চলল:

'ব্যুরো মার্কিন সমাজের ওপরতলার শ্রেণীকে জনসাধারণের বিচার থেকে আড়াল করে রাখে: সেই সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের নিয়মকানুন লঙ্ঘন সম্পর্কে অবিরাম গলা ফাটিয়ে ধনীদের চারিত্রিক দোষত্রুটি ঢাকার উদ্দেশ্যে সংগঠিত ছোটখাটো কেলেঙ্কারীর ঘটনা দিয়ে মানুষের মাথা বোঝাই করে রাখে। জনসাধারণ সবসময় একটা সম্মোহিত অবস্থার মধ্যে থাকে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তার নেই, সে শুধু কাগজের কথা শোনে। খবরের কাগজের মালিক হল কোটিপতিরা, তারাই আবার ব্যুরোর সংগঠক।... ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? বেশ মৌলিক ধরনের চিন্তা বটে।'

সে চুপ করে গেল, মাথা নীচু করে গভীর ভাবনায় ডুবে রইল।

'আপনাকে ধন্যবাদ!' আমি বললাম। 'আপনি আমাকে বহু আকর্ষণীয় জিনিসের সন্ধান দিয়েছেন।'

সে মাথা তুলে হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ আকর্ষণীয় বৈ কি! অবশ্যই আকর্ষণীয়!' ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে সে উচ্চারণ করল। 'কিন্তু আমি এখন এতে বড় ক্লান্তি বোধ করি। আমি সংসারী লোক। তিন বছর আগে আমি নিজের বাড়ি উঠিয়েছি।... আমি এখন একটু বিশ্রাম নিতে চাই। আমার এই চাকরী বড় কঠিন কাজ। নীতিশাস্ত্রের নিয়মকানুনের প্রতি সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধা যাতে বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা — ওঃ! এটা কিন্তু সত্যিই সহজ কাজ নয়! ভেবে দেখুন না কেন, মাদকদ্রব্য আমার সয় না, অথচ আমাকে মদ খেয়ে মাতাল হতে হয়, আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, নির্ঝঞ্ঝাট সংসারযাত্রা পছন্দ করি, অথচ আমাকে রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় ঘুরতে হয়, কেলেঙ্কারী বাধাতে হয়... অনবরত নিজেকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখতে হয়... যদিও বলাই বাহুল্য, অন্যের নামে -- কিন্তু তা হলেও... একদিন যদি আমার নিজের নাম প্রকাশ হয়ে যায়... তাহলে আর দেখতে হবে না... এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।... পরামর্শ নেওয়া দরকার।... আমি আমার কাজের ব্যাপারে আপনার কাছে মতামত... জানতে এসেছি।... বড় জট পাকানো এই ব্যাপারটা!'

'বলে যান!' আমি তাকে বললাম।

সে শুরু করল, 'বুঝলেন কিনা, সম্প্রতি দক্ষিণের স্টেটগুলোতে ওপরতলার লোকজনের মধ্যে নিগ্রো মেয়েদের উপপত্নী হিশেবে রাখার চল দেখা দিয়েছে... একসঙ্গে দুটো-তিনটে করে। এ নিয়ে লোকজনের মধ্যে কথা শুরু হয়ে গেছে। স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের আচরণে অসন্তুষ্ট। কোন কোন খবরের কাগজে এমন সমস্ত চিঠিপত্র এসেছে যেখানে মহিলারা তাদের স্বামীদের কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। একটা বড় রকমের কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যুরো সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাকে 'পালটা ঘটনা' বলি সেই রকম কতকগুলো ঘটনা সংঘটনের জন্য লেগে পড়েছে। তেরোজন এজেন্টকে — তাদের মধ্যে আমিও আছি — কালবিলম্ব না করে নিগ্রো রক্ষিতা রাখতে হবে। একসঙ্গে দুটো, এমনকি পারলে তিনটে করে।'

সে নার্ভাস ভাবে তড়াক ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, তার ফ্রককোটের পকেটের গায়ে হাত লাগিয়ে জানাল:

'এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি।...

তাছাড়া সেও আমাকে এ কাজ করতে দেবে না ...এই হল বড় কথা! একটা হলে তাও না হয় কথা ছিল!'

'আপনি 'না' করে দিন না!' আমি পরামর্শ দিলাম।

সে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'তাহলে হপ্তায় হপ্তায় আমাকে ৫০ ডলার করে মাইনেটা কে দেবে? আর সফল হলে সে বাবদ বোনাসটা? না, না ঐ উপদেশ আপনি নিজের জন্যে তুলে রাখুন।... একজন মার্কিনীর পক্ষে টাকাকড়ি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয় -- এমনকি নিজের মৃত্যুর পরের দিনও না। আপনি অন্য কোন পরামর্শ দিন।'

'আমার পক্ষে কঠিন,' আমি বললাম।

'হুম্! কঠিন কেন শুনি? আপনারা ইউরোপীয়রা নৈতিক ব্যাপারে বড় চপলমতি।.. আপনাদের ভ্রষ্টাচারী স্বভাব আমাদের জানতে বাকি নেই।'

তার কথার সুরে বোঝা গেল নিজের কথার সত্যতা সম্পর্কে তার আস্থা দৃঢ়।

'তাহলে বলি,' আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'আপনার, জানাশোনা কিছু ইউরোপীয় নিশ্চয়ই আছে? আমি বিশ্বাস করি, আছে।'

'তাদের দিয়ে আপনার কী হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী হবে?' সে আমার কাছ থেকে এক পা পেছনে সরে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, 'এটা ঠিক যে নিগ্রো মেয়েদের এই ব্যাপারটার দায়িত্ব আমি আদৌ নিতে পারছি না — আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। আপনি নিজে ভেবে দেখুন: আমার স্ত্রী আমাকে এ কাজ করতে দেবে না, আমিও তাকে ভালোবাসি। না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।...'

সে ভয়ঙ্কর জোরে মাথা ঝাঁকাল, টাকে হাত বুলিয়ে তোষামোদের সুরে বলে চলল:

'আপনি এই কাজের জন্য কোন ইউরোপীয়কে সুপারিশ করতে পারেন কি? ওদের নীতিবোধের কোন বালাই নেই, ওদের এতে কিছু আসে যায় না! হয়ত অন্য দেশ থেকে বসবাসের জন্য যে সমস্ত গরিব বেচারিরা এসেছে তাদের কাউকে, অ্যাঁ? আমি হপ্তায় দশ ডলার দেব, কেমন? নিগ্রো মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা আমি নিজে করব।... মোটের ওপর সব কাজই আমি নিজে করব — তাকে কেবল দেখতে হবে যেন বাচ্চাকাচ্চা পয়দা হয়।... আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।... সময়মতো নানা রকম জঞ্জালের স্তূপ দিয়ে দক্ষিণের স্টেটগুলোর এই ব্যাপার

যদি চাপা দেওয়া না যায় তাহলে কী কেলেঙ্কারী বেধে যেতে পারে একবার ভেবে দেখুন! নীতিধর্মের জয়ের স্বার্থে তাড়াতাড়ি না করে উপায় নেই।...'

...সে যখন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল তখন তার মাথার খুলিতে লেগে আমার হাত ছড়ে যেতে ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে হাতটা আমি জানলার শার্সির গায়ে ঠেকালাম।

দেখতে পেলাম যে জানলার নীচে দাঁড়িয়ে আমার উদ্দেশে কী যেন সব ইশারা করছে।

'কী চাই আপনার?' জানলা খুলে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি টুপি নিতে ভুলে গেছি!' সে বিনীত ভাবে বলল।

মেঝে থেকে গোল টুপিটা তুলে নিয়ে আমি রাস্তায় ছুঁড়ে দিলাম। জানলাটা বন্ধ করার সময় শুনতে পেলাম তার ব্যবসাদারী প্রশ্ন:

'আচ্ছা যদি হপ্তায় পনেরো ডলার করে দিই? মজুরীটা কিন্তু ভালোই!'

১৯০৬

জীবনের হর্তাকর্তা

'চল আমার সঙ্গে, সত্যের উৎসে যাই চল!' হেসে এই কথা বলে শয়তান আমাকে নিয়ে এলো কবরখানায়।

আমি যখন তার সঙ্গে সঙ্গে কবরের ওপরে বসানো সমস্ত পুরানো পাথর আর ঢালাই লোহার চাঁইয়ের মাঝখান দিয়ে সরু সরু পথ ধরে যাচ্ছিলাম তখন সে ক্লান্ত স্বরে কথা বলছিল — মনে হচ্ছিল যেন এক বৃদ্ধ অধ্যাপক, নিষ্ফল জ্ঞান প্রচার করতে করতে যাঁর বিরক্তি ধরে গেছে।

সে আমাকে বলছিল, 'তোমার পায়ের তলায় আছে আইনের স্রষ্টারা, যাদের তৈরি আইনের পথে তুমি চলছ; তুমি তোমার পায়ের জুতোর সোল দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছ সেই ছুতোর ও কামারদের দেহভস্ম, যারা তোমার ভেতরকার পশুটার জন্য খাঁচা বানিয়েছিল।'

একথা বলতে বলতে সে মানুষের প্রতি জ্বালাধরা অবজ্ঞার হাসি হাসল; তার বিষণ্ণ চোখের নিরুত্তাপ দৃষ্টি সমাধির ঘাস আর সমাধিস্তম্ভের গায়ের ছাতলার ওপর সবুজ-সবুজ দীপ্তি ছড়িয়ে দিল। মৃতদের উর্বর জমি

আমার পায়ের সঙ্গে ভারী চাপ চাপ হয়ে লেগে যাচ্ছিল, তার ফলে পার্থিব জ্ঞানীগুণীদের সমাধির ওপরকার স্মৃতিস্তম্ভগুলোর মাঝখানে, পায়ে-চলা-পথের ওপর দিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল।

'ওহে মানুষ, যারা তোমার ভেতরকার মনটাকে গড়ে তুলেছেন কৃতজ্ঞতাভরে তাদের দেহাবশেষের উদ্দেশে মাথা নোয়াও না কেন?' শয়তানের কণ্ঠস্বর যেন শরৎকালের স্যাঁতসেঁতে দমকা বাতাসের মতন ঝাপটা দিল, তার কণ্ঠস্বর আমার দেহে কাঁপুনি জাগিয়ে তুলল, আমার হৃৎপিন্ড একটা ব্যাকুল বেদনায় ছেয়ে গেল। মৃত লোকদের প্রাচীন সমাধির মাথার ওপর গাছপালার ডাল ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছিল; ঠান্ডা আর ভিজে ভিজে ডালপালা আমার মুখে এসে লাগছিল।

'উপযুক্ত সম্মান দেখাও জালিয়াতদের। ছোটখাটো ধূসর চিন্তাভাবনার ঘন মেঘ - তোমার বুদ্ধির ফুটো পয়সা -- তাদেরই ফলন। তোমার অভ্যাস, তোমার সংস্কার, যা যা নিয়ে তুমি জীবনধারণ করছ সবই তাদের সৃষ্টি। তাদের ধন্যবাদ জানাও। মৃতরা বিপুল উত্তরাধিকার রেখে গেছে তোমার জন্য!'

হলুদ পাতা ধীরে ধীরে আমার মাথার ওপর ঝরে পড়ছিল, নেমে আসছিল আমার পায়ের নীচে। কবরখানার জমি টাটকা খাবার — শরৎকালের মৃত ঝরা পাতা টেনে নিতে নিতে লোভীর মতো চুকচুক আওয়াজ তুলল।

'এই যে এখানে শায়িত আছে এক দর্জি -- মানুষের আত্মাকে সে পরাত কুসংস্কারের ছাইরঙা ভারী আঙরাখা। একবার দেখতে চাও কি তাকে?'

আমি নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। শয়তান একটা সমাধির ওপরকার ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো, ছাতলা ধরা ফলকের গায়ে লাথি মেরে বলল:

'ওহে বইওয়ালা! উঠে এসো...'

ফলকটা উঠে গেল, কাদামাটির বুকে ভারী দীর্ঘশ্বাসের আলোড়ন তুলে অগভীর সমাধির গহ্বরটা খুলে গেল — ঠিক যেন পোকায় খাওয়া একটা মনিব্যাগ। সেখানকার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো খিটখিটে গলার আওয়াজ।

'বারোটার পর মড়াকে কে জাগায়?'

শয়তান বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, 'দেখলে ত? জীবনের আইনকানুন যারা তৈরি করেছে পচে যাবার পরও নিজেদের ওপর তাদের কী গভীর বিশ্বাস!'

'ও, প্রভু আপনি!' কবরের এক প্রান্তে এসে বসতে বসতে কঙ্কাল বলল।

তারপর দায়সারা গোছের ভঙ্গিতে শয়তানের উদ্দেশে ফাঁকা খুলি নেড়ে অভিবাদন জানাল।

'হ্যাঁ, আমিই!' উত্তরে শয়তান বলল। 'এই যে আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।... তুমি যাদের জ্ঞানের কথা শিখিয়েছ সেই মানুষজনের মাঝখানে থেকে থেকে ও বোকা বনে গেছে, এখন সে রোগের ছোঁয়াচ থেকে আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের আদি উৎসের কাছে এসেছে...'

আমি রীতিমতো সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে জ্ঞানীপুরুষের দিকে তাকালাম। তার খুলির হাড়ে মাংসের নামগন্ধ ছিল না, কিন্তু আত্মতৃপ্তির ভাব তার মুখ থেকে তখনও মুছে যায় নি। প্রতিটি অস্থিখন্ড, তারা যে এক ধরনের অতি নিখুঁত ও অনন্যসাধারণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, এই চেতনায় অস্পষ্ট দীপ্ত।...

'পৃথিবীতে থাকতে তুমি কী কাজ করেছিলে আমাদের বল!' শয়তান জানতে চাইল।

পাঁজরের গায়ে ভিখিরীর ছেঁড়া ঝুলঝুলে বস্ত্রখণ্ডের মতো কালো কালো মাংস, আর শবাচ্ছাদন বস্ত্রের যেটুকু অবশেষ ঝুলছিল মৃত ব্যক্তি জাঁক করে, সগর্বে তার অস্থিসার হাত দিয়ে সেগুলো ঠিকঠাক করে নিল। তারপর সগর্বে তার অস্থিসার ডান হাতটা কাঁধের সমান উঁচুতে তুলে আঙুলের নগ্ন সন্ধিগুলি দিয়ে কবরখানার অন্ধকারের দিকে নির্দেশ করে শান্ত ও উদাসীন কণ্ঠে বলতে শুরু করল:

'আমি দশটা বড় বড় বই লিখে অশ্বেতকায় জাতির ওপর শ্বেতকায় জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বিরাট ধারণা লোকের মনে সঞ্চার করে দিয়েছি...'

শয়তান বলল, 'সত্যের ভাষায় অনুবাদ করলে শোনায় এই রকম: যারা তাদের নিজেদের করোটিকে শান্তিতে আরামদায়ক উষ্ণতার মধ্যে রাখতে চায় তাদের জন্য আমি, এক বন্ধ্যা চিরকুমারী সারা জীবন ধরে আমার বুদ্ধির ভোঁতা ছুঁচ চালিয়ে বহু ব্যবহারে জীর্ণ ধ্যানধারণার শতচ্ছিন্ন উল থেকে নেহাৎই বাজে কতকগুলো টুপি বুনেছি।...'

'আপনার ভয় হচ্ছে না যে ও অসন্তুষ্ট হতে পারে?' আমি এক ফাঁকে মৃদুস্বরে শয়তানকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আরে না!' সে বলল। 'জ্ঞানী লোকেরা যখন বেঁচে থাকে তখনও সত্যি কথায় তেমন কান দেয় না।'

জ্ঞানী পুরুষ বলে চলল, 'কেবল শ্বেতকায় জাতিই এমন জটিল এক সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছে, উদ্ভাবন করতে পেরেছে সদাচারের এত সব

কঠোর মূলনীতি। এটা যে তার ত্বকের বর্ণ আর রক্তের রাসায়নিক উপাদান সংযোগের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে একথা আমি প্রমাণও করেছি...'

'ও এটা প্রমাণ করেছে!' শয়তান সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে তার কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলল। 'নৃশংস হওয়ার অধিকার যে তার জন্মগত এ বিষয়ে একজন ইউরোপীয়র চেয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী আর কোন বর্বর দেখা যায় না...'

মৃত ব্যক্তি বলে চলেছে, 'খ্রীষ্টধর্ম আর মানবতাবাদ শ্বেতকায়দের সৃষ্টি...'

শয়তান তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'শ্বেতকায়, অর্থাৎ যারা হল গিয়ে দেবদূতদের জাতি এবং গোটা পৃথিবীটা যাদের অধিকারে থাকা উচিত। ঠিক এই কারণেই তারা এত উৎসাহভরে পৃথিবীকে রাঙায় তাদের প্রিয় রঙে — রক্তের লাল রঙে...'

'তারা সৃষ্টি করেছে সুসমৃদ্ধ সাহিত্য, চমকপ্রদ যন্ত্রপাতি,' মৃত ব্যক্তি তার আঙুলের অস্থি ঠকঠকিয়ে গুনতে গুনতে বলল।

'গন্ডা তিনেক ভালো ভালো বই আর অসংখ্য মারণাস্ত্র...' শয়তান হাসতে হাসতে বলল। 'এই জাতির মধ্যে ছাড়া আর কোথায় জীবন এতটা খন্ডবিখন্ড শুনি? শ্বেতকায়দের মধ্যে ছাড়া আর কোথায়ই বা এত নীচে নামানো হয়েছে মানুষকে?'

'আচ্ছা এমনও ত হতে পারে যে শয়তানের সব কথা সত্যি নয়?'

'ইউরোপীয়দের শিল্পকলা এক অপরিমেয় শীর্ষে পেঁাছেছে,' শুষ্ক ও উদাস কণ্ঠে বিড়বিড় করে কঙ্কাল বলল।

আমার সঙ্গী বলে উঠল, 'বরং বল, শয়তানের হয়ত ভুল করার ইচ্ছে আছে! কারণ সব সময় সত্যি বলাটা বড় একঘেয়ে। কিন্তু লোকে জীবনধারণ করে স্রেফ আমার অবজ্ঞার পুষ্টিসাধনের জন্য।... ইতরতা ও মিথ্যাচারের বীজ পৃথিবীতে সুপ্রচুর ফসল ফলায়। যারা ঐ বীজ ছড়ায় তাদের একজনকে এই যে তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছ। ওদের সকলের মতো এও নতুন কিছুর জন্ম দেয় নি, শুধু পুরনো মৃতদেহগুলির গায়ে নতুন নতুন শব্দের বস্ত্র চাপিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে।... পৃথিবীতে কী করা হয়েছে? মুষ্টিমেয় লোকের জন্য তৈরি হয়েছে কিছু কিছু প্রাসাদ, অসংখ্য লোকের জন্য — কলকারখানা আর গির্জা। গির্জায় খুন করা হয় আত্মাকে, কলকারখানায় — দেহ, আর এর উদ্দেশ্য হল প্রাসাদগুলি যেন অটুট থাকে।... লোকজনকে কয়লা আর সোনাদানা তুলে আনার জন্য

পৃথিবীর অতল গর্ভে পাঠানো হচ্ছে, তাদের সেই কলংকজনক শ্রমের পারিশ্রমিক হিসাবে তারা পাচ্ছে সীসে আর লোহার মশলা দেয়া রুটির টুকরো।'

'আপনি কি সমাজতন্ত্রী?' শয়তানকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি চাই সঙ্গতি!' উত্তরে সে বলল। 'মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে অখণ্ড সত্তা। সেই মানুষ যখন নিজেকে ভেঙে তুচ্ছ ছোট ছোট টুকরো করে ফেলে, নিজেকে দিয়ে অন্যের লোলুপ হাতের হাতিয়ার বানায়, তখন আমার বিশ্রী লাগে। আমি দাস চাই না -- দাসত্ব আমার মনকে আঘাত করে।... আমার এই মনোভাবের জন্যই আমি স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হই। যেখানে কর্তৃত্বব্যঞ্জক কেউ আছে সেখানে আত্মার দাসত্ব অবধারিত, সেখানে ধাঁক ধাঁক করে গজায় মিথ্যাচারের প্রচুর ছাতলা।... পৃথিবী বেঁচে থাকুক — বেঁচে থাকুক তার সব কিছু নিয়ে! সারাদিন ধরে তার সর্বাঙ্গ দাউদাউ করে জ্বলুক, থাকলই বা রাতের বেলায় শুধু তার ভস্মাবশেষ। একদিন প্রেমে পড়া সব মানুষের একান্ত দরকার।... প্রেম এক আশ্চর্য স্বপ্নের মতো — মাত্র একবারই আসে; কিন্তু এই একবারের মধ্যেই নিহিত আছে অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অর্থ।'

কংকালটা কালো পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল — বাতাস তার শূন্য অস্থিপঞ্জরের ভেতরে ঢুকে নাকি কান্নার মৃদু সুর তুলছিল।

'ওর হয়ত ঠাণ্ডা লাগছে, কষ্টও হচ্ছে,' আমি শয়তানকে বললাম।

'বাড়তি সব কিছু থেকে মুক্ত হয়েছে এমন একজন বৈজ্ঞানিককে দেখতে আমার বেশ লাগে। তার কংকাল -- তার ধারণার কংকাল।... আমি দেখতে পাচ্ছি কী মৌলিক ছিল সেই ধারণা।... ওর পাশে পড়ে আছে সত্যের বীজবপনকারী আরও একজনের দেহাবশেষ। তাকেও জাগানো যাক। জীবদ্দশায় তারা সকলে শান্তিতে ও স্বস্তিতে থাকতে ভালোবাসে; ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি আর জীবনের নীতি-নিয়ম উদ্ভাবনের জন্য খাটে — সদ্যঃপ্রসূত ধ্যানধারণার বিকৃতি ঘটিয়ে সেগুলোর জন্য ছোট ছোট আরামের কফিন বানায়। কিন্তু মরার সময় তারা চায় লোকে যেন তাদের ভুলে না যায়।... কম্প্রাচিকোস্ উঠে পড় হে! এই যে আমি একজন লোককে নিয়ে এসেছি — সে তার ভাবনাচিন্তার জন্য কফিন চায়।'

আবার আমার সামনে মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠল একটা খালি, শূন্যগর্ভ করোটি -- দন্তহীন, হলুদ বর্ণের; কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মতৃপ্তিতে চকচক করছে। সম্ভবত সে বহুকাল হল মাটির নীচে শুয়ে আছে -- তার অস্থিতে

এতটুকু মাংসের চিহ্ন নেই। সে তার নিজের কবরের ওপরকার পাথরের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। কালো পাথরের ওপর তার পাঁজর উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের উর্দির ডোরার মতো ফুটে উঠেছে।

'ও নিজের ধারণাগুলোকে কোথায় রাখে?' আমি জানতে চাইলাম।

'হাড়গোড়ের ভেতরে রে ভাই, হাড়গোড়ের ভেতরে! ওদের ধারণাগুলো হল গেঁটে বাত বা সন্ধি বাতের মতো — পাঁজরার গভীরে ভেদ করে।'

'আমার বই কেমন কাটছে প্রভু?' কঙ্কাল চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'এখনও পড়ে আছে প্রফেসর!' শয়তান উত্তর দিল।

'লোকে কি পড়া ভুলে গেল নাকি?' একটু ভেবে প্রফেসর বলল।

'না, আজেবাজে জিনিস আগের মতোই পড়ে — বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে... কিন্তু যে-সমস্ত আজেবাজে জিনিস একঘেয়ে, সেগুলোকে লোকের দৃষ্টিতে পড়ার জন্য কখন কখন বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়।...' তারপর আমার দিকে ফিরে শয়তান বলল, 'স্ত্রীলোক যে মানুষ নয় এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রফেসর সারা জীবন স্ত্রীলোকের করোটির মাপ নিয়ে কাটিয়েছে।... সে শত শত করোটির মাপ নিয়েছে, দাঁত গুনে দেখেছে, কানের মাপ নিয়েছে, মৃত মস্তিষ্কের ওজন নিয়েছে। মৃত মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা ছিল প্রফেসরের সবচেয়ে প্রিয় কাজ — তার সমস্ত বই এর সাক্ষ্য বহন করছে। আপনি পড়েছেন কি?'

'শুঁড়িখানার ভেতর দিয়ে মন্দিরে আমি যাই না,' আমি উত্তর দিলাম। 'তাছাড়া বই পড়ে মানুষ সম্পর্কে কী করে চর্চা করা যায় আমি জানি নে — বইপুথির মানুষ সব সময় ভগ্নাংশ হয়, আর অঙ্কে আমি কাঁচা। কিন্তু আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতে, দাড়ি ছাড়া ও স্কার্ট পরা মানুষ প্যাণ্টলুন পরা দাড়ি গোঁফওয়ালা মানুষের চেয়ে ভালোও নয় খারাপও নয়।'

শয়তান বলল, 'হ্যাঁ, মাথার চুলের পরিমাণ ও পোশাকপরিচ্ছদ নির্বিশেষে নীচতা ও মূর্খতা মস্তিষ্কে ভর করতে পারে। কিন্তু তা হলেও বলব, স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রশ্নটা আকর্ষণীয় ভাবে রাখা হয়েছে,' এই বলে শয়তান যথারীতি হেসে উঠল। সে সব সময় হাসে — আর এই জন্য তার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাওয়া যায়। কবরখানায় এসেও যে হাসতে পারে — বিশ্বাস করুন — সে জীবনকে ভালোবাসে, মানুষকেও ভালোবাসে।...

সে বলে চলল, 'যাদের কাছে শুধু ঘরনী ও বাঁদী হিশেবে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন তারা জোর দিয়ে বলে থাকে স্ত্রীলোক মনুষ্যপদবাচ্য নয়। আবার আরেক দল লোক আছে যাদের নারী হিশেবে তাকে ব্যবহারে যেমন কোন

আপত্তি নেই, তেমনি তার কর্মক্ষমতাকে ব্যাপক কাজে লাগাতেও তারা আগ্রহী। এই শ্রেণীর লোকেরা দাবি করে যে স্ত্রীলোক সর্বত্র পুরুষ মানুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করার অর্থাৎ কিনা পুরুষের জন্য কাজ করার সম্পূর্ণ উপযোগী। বলাই বাহুল্য, এই দুই দলের কেউই কোন মেয়েকে ধর্ষণ করার পর তাদের সমাজে তাকে প্রবেশাধিকার দেবে না -- তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যেহেতু তারা তাকে স্পর্শ করেছে অতএব সে চিরকালের জন্য অপবিত্র হয়ে গেল।... না, নারীসংক্রান্ত সমস্যাটি বড় মজার! লোকে যখন সরল বিশ্বাসে মিথ্যে কথা বলে, আমার বেশ লাগে — তখন তারা দেখতে হয় শিশুদের মতো, তখন আশা করা যায় যে যথাসময় তারা বড় হয়ে উঠবে।...'

শয়তানের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ভবিষ্যৎ মানুষের খোসামোদসূচক কিছু বলার কোন ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু যেহেতু বর্তমানের মানুষ সম্পর্কে আমি নিজে এমন অনেক কথা বলতে পারি যা আদৌ খোসামোদের পর্যায়ে পড়ে না এবং আমার মনের মতো এরকম একটা সহজ কাজে শয়তানকে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানোর কোন ইচ্ছা যেহেতু আমার নেই, তাই আমি তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম:

'আচ্ছা লোকে যে বলে শয়তান নিজে যেখানে যাবার ফুরসৎ পায় না সেখানে স্ত্রীলোককে পাঠায় --- একথা কি সত্যি?'

শয়তান না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল:

'সে রকম ঘটে... যদি হাতের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিমান ও ইতর পুরুষ না পাওয়া যায়...'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে খলতার সঙ্গে আপনার আর প্রেম নেই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খলতা আর নেই!' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। 'থাকার মধ্যে আছে শুধু নীচতা! কোন এক কালে খলতা ছিল এক সুন্দর শক্তি। কিন্তু এখন... এমনকি মানুষকে খুন করতে হলে তাও করা হয় ইতর ভাবে — প্রথমে মানুষের হাত বাঁধা হয়। দুর্বৃত্ত নেই — আছে শুধু জল্লাদেরা। জল্লাদ ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নয় — বলা যায় সে হল ভীতির শক্তি আর আশঙ্কার ঠেলায় চালিত হাত আর কুঠার মাত্র।... মানুষ তাদেরই মারে যাদের সে ভয় পায়।...'

দুটো কঙ্কাল তাদের যার যার কবরের ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অস্থির ওপর নিঃশব্দে খসে খসে পড়ছে শরতের ঝরাপাতা।

তাদের পঞ্জরাস্থির তন্ত্রীতে বাতাস হতাশ বেদনার সুর তুলছে, শূন্য করোটির ভেতরে তুলছে গুঞ্জন। চোখের গভীর কোটর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে গভীর অন্ধকার — আর্দ্র, সুরভিত অন্ধকার। ওরা দু'জনেই কাঁপছে। ওদের দেখে আমার করুণা হল।

'ওরা ওদের নিজেদের জায়গায় চলে যাক না!' শয়তানকে আমি বললাম।

'আচ্ছা, তুমি দেখি কবরখানায় এসেও মানবতাবাদী!' সে উল্লসিত হয়ে বলল। 'বটে। মৃতদেহের মাঝখানে মানবতাবাদ অনেক বেশি শোভনীয়— এখানে মানবতাবাদ কাউকে অসন্তুষ্ট করতে পারে না। কলকারখানায়, শহরের চত্বরে আর রাস্তায় ঘাটে, জেলখানায় আর খনিতে — জ্যান্ত লোকজনের মাঝখানে মানবতাবাদ হাস্যকর, এমনকি হয়ত বা ক্রোধেরও সঞ্চার করে। কিন্তু এখানে তাদের নিয়ে হাসাহাসি করার কেউ নেই — মৃতরা চিরকাল গম্ভীর প্রকৃতির হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে মানবতাবাদের কথা শুনতে তাদের ভালোই লাগে — হাজার হোক, তাদের এ সন্তান মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে।... যে যাই বলুক না কেন, সকলের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে ছোটখাটো একদল মানুষের উদাসীন নিষ্ঠুরতা, মানুষের ওপর পীড়নের নিদারুণ বিভীষিকা -- এসব গোপন রাখার উদ্দেশ্যে জীবনের রঙ্গমঞ্চে যারা এই অন্তর্দৃশ্য অবতারণার চেষ্টা করে তাদের মূর্খ বলা চলে না।...'

এই বলে শয়তান হো হো করে হেসে উঠল। তার সে হাসি ছিল নিদারুণ সত্যের কটু হাসি।

অন্ধকার আকাশে তারারা মিটমিট কাঁপছে, অতীতের সমাধিগুলোর ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো পাথর। কিন্তু মাটির ভেতর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ, নিশীথের নিস্তব্ধতার আলিঙ্গনবদ্ধ নগরের ঝিমন্ত রাস্তার ওপর বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে মৃতদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস।

'বেশ কিছু মানবতাবাদী এখানে শয্যা গ্রহণ করেছে,' সে তার চারপাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ইঙ্গিত করে সমাধিগুলি দেখিয়ে বলল। 'তাদের কেউ কেউ আবার সত্যি সত্যি আন্তরিকও ছিল। জীবনে এমন অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে যেগুলো বেশ মজার, কিন্তু সবচেয়ে হাস্যকর সম্ভবত এটি।... তাদের পাশে পরম বন্ধু ভাবে ও শান্তিতে শয্যা নিয়ে আছে আরেক ধরনের জীবনের শিক্ষাদাতারা — এরা হল তারা, যারা হাজার

হাজার মৃত মানুষের যত্নে ও কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা মিথ্যার প্রাচীন ইমারতের নীচেকার বনিয়াদ মজবুত করার চেষ্টা করেছিল।...'

দূরের কোন্ এক জায়গা থেকে যেন ভেসে এলো গানের আওয়াজ।... দুটো-তিনটে ফুর্তির চিৎকার কাঁপতে কাঁপতে কবরখানার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেল। সম্ভবত অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কবরের দিকে চলেছে কোন এক হুল্লোড়ে।

'এই যে এই ভারী পাথরটার নীচে সগর্বে পচছে এক জ্ঞানী পুরুষের দেহাবশেষ, যে শিখিয়েছিল যে সমাজ হল একটা জীবন্ত প্রাণীর মতন... বানর না শুয়োর -- ঠিক কোনটার মতন -- এখন আর মনে করতে পারছি নে। যারা নিজেদের সেই প্রাণীর মস্তিষ্ক বলে বিবেচনা করে তাদের পক্ষে এটা ভালোই! প্রায় সব রাজনীতিবিদ আর দুর্বৃত্তদলের সর্দাররা এই তত্ত্বের সমর্থক। আমি যদি মস্তিষ্ক হই, যদি আমার খুশিমতো হাত নাড়াতে পারি তাহলে আমি আমার একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত মাংসপেশীর যে কোন সহজাত বাধা যখন তখন দমন করারও ক্ষমতা রাখি -- অবশ্যই রাখি! আর এখানে যার দেহাবশেষ আছে সে লোকটা মানুষকে ডাক দিয়েছিল পেছনে যাবার — মানে সেই যখন মানুষ চার হাত পায়ে হাঁটত আর পোকামাকড় ধরে খেত। সে উঠে-পড়ে প্রমাণ করতে যায় যে ঐ সময়টা ছিল মানুষের জীবনে সবচেয়ে সুখের কাল। ভালো ফ্রককোট গায়ে দিয়ে দু'পায়ে হাঁটাচলা করে এদিকে লোকজনকে তাদের পূর্বপুরুষদের মতো ফের লোমশ হওয়ার মন্ত্রণাদান মৌলিক বলতে হয় বৈ কি! কবিতা পড়া, গানবাজনা শোনা, মিউজিয়মে যাতায়াত করা, দিনে শত শত মাইল ভ্রমণ করা, আবার অন্য দিকে কিনা সকলের জন্য বনের সহজসরল জীবনযাত্রা আর চারপায়ে হামা দিয়ে বেড়ানোর শিক্ষা প্রচার করা -- সত্যি বলতে গেলে কি, মন্দ নয়! আর এই এখানে যে লোকটা আছে সে এই বলে লোকজনকে সান্ত্বনা দিয়ে বেড়াত এবং তাদের জীবনযাত্রার সমর্থনে এই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে অপরাধীরা মানুষ নয় -- তারা অসুস্থ ইচ্ছাশক্তি, এক বিশেষ ধরনের সমাজবিরোধী জীব! তারা প্রকৃতিগত ভাবে আইন ও নৈতিকতার শত্রু, অতএব তাদের সঙ্গে ব্যবহারে কোন ভদ্রতার বালাই না রাখাই উচিত। অপরাধের একমাত্র দাওয়াই হল মৃত্যু। বুদ্ধিমানের মতো কথা বটে! আগে থাকতে কাউকে সমস্ত দোষের স্বাভাবিক আধার ও অশুভ শক্তির একটি জীবন্ত বাহক বলে ধরে নিয়ে সকলের যাবতীয় অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া — আদৌ কি বোকার কাজ? সংসারে সব সময়

এমন কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবেই যে লোক আত্মার বিকার সাধনকারী কুৎসিত জীবনব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকে। জ্ঞানী পুরুষেরা ভালো যুক্তি ছাড়া নাক পর্যন্ত ঝাড়েন না। হ্যাঁ, কবরখানাগুলো শহরের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত করে তোলার নানা রকম ধারণার এক ভান্ডার বিশেষ।...'

শয়তান চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। দানবীয় কঙ্কালের আঙুলের মতো সাদা রঙের একটা গির্জা মৃতদের প্রাচুর্যপূর্ণ ফসলখেত থেকে নক্ষত্রের মৌন মিলনক্ষেত্র অন্ধকার আকাশের দিকে নীরবে উঁচিয়ে আছে।... জ্ঞানের উৎসমুখের ওপর ছাতলার আঙরাখায় জড়ানো পাথরের ঘন ভিড় ঘিরে রেখেছে এই চিমনিটিকে, যেখান থেকে মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে মানুষের অভিযোগ ও প্রার্থনার ঝাঁঝাল ধোঁয়া। একটা পচা তেল-তেল গন্ধে ভরপুর বাতাস ধীরে ধীরে গাছের ডালপালা দোলাচ্ছে, শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। নিঃশব্দে সেগুলো খসে খসে এসে পড়ছে জীবনস্রষ্টাদের আবাসস্থলের ওপরে।...

'আমরা এখন মড়াদের একটা ছোটখাটো কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করব। এটা হবে শেষ বিচারের মহলা!' ঢিবি আর পাথরের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা-পথের ওপর দিয়ে আমার আগে আগে পা ফেলে চলতে চলতে শয়তান বলল। 'বুঝলে কিনা, শেষ বিচারের দিন আসবে! সে দিন আসবে এখানে, এই পৃথিবীতে, আর তা হবে মানবজাতির পরম সুখের দিন! সেই দিন আসবে তখনই, যখন লোকে উপলব্ধি করতে পারবে মানুষকে ছিঁড়ে অর্থহীন কতকগুলো মাংস আর হাড়ের নগণ্য টুকরোয় পরিণত করে জীবনের শিক্ষাদাতা আর আইনপ্রণেতারা তাদের বিরুদ্ধে কী গুরুতর অপরাধই না করেছে! মানুষের নামে এখন যা চলেছে সে সব হল খন্ড খন্ড অংশ -- অখন্ড মানব এখনও সৃষ্টি হয় নি। জগৎ যে-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে তার ভস্মস্তূপের ভেতর থেকে সে আবির্ভূত হবে, সমুদ্র যেমন সূর্যকিরণকে গ্রাস করে তেমনি ভাবে জগতের অভিজ্ঞতাকে গ্রাস ক'রে সে পৃথিবীর মাথার ওপর আরও একটা সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকবে। আমি তা দেখতে পাব। যেহেতু আমি মানুষকে সৃষ্টি ক'রে থাকি, আমি তাকে সৃষ্টি করব।'

বুড়ো যেন একটু বড়াই করছে; তাছাড়া এমন কাব্যিক মেজাজও শয়তানের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমি অবশ্য তাকে ক্ষমা করে দিলাম। কী আর উপায়? শয়তান যে শয়তান, তারও পিটে-গড়া মজবুত আত্মার ওপর নিজের বিষাক্ত অম্লরস ঢেলে জীবন তাকে বিকৃত করে। তাছাড়া মানুষ

মাত্রেরই মাথা গোল, কিন্তু তাদের ভাবনাচিন্তা অমার্জিত, আর সকলেই আয়নায় নিজেকে সুন্দর দেখে।

কতকগুলো সমাধির মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শয়তান প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে হাঁক দিল:

'এখানে জ্ঞানী আর সৎ মানুষ কে আছে?'

এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর হঠাৎ আমার পায়ের নীচের মাটি তোলপাড় করে উঠল — যেন নোংরা বরফের স্তূপ এসে কবরখানার ঢিবিগুলোকে ঢেকে দিল। মনে হল যেন হাজার হাজার বিজলী ভেতর থেকে মাটি খুঁড়ে ওপরে তুলেছে, কিংবা পৃথিবীর গর্ভে কোন এক বিশাল দানব অস্থির হয়ে পাশ ফিরল। আমাদের চারপাশের সব কিছুর ওপর ফুটে উঠল নোংরা হলুদ-হলুদ রং। সর্বত্র বাতাসে দোল-খাওয়া শুকনো ঘাস-ডাঁটার মতো দুলছে কঙ্কাল আর কঙ্কাল। হাড়ে হাড়ে ঘষা লেগে পরস্পরের সন্ধিতে সন্ধিতে আর সমাধিশিলার গায়ে ধাক্কা লেগে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল, ধাক্কাধাক্কি করে কঙ্কালগুলো পাথরের ওপর উঠে এলো। সর্বত্র ড্যান্ডেলিয়ান ফুলের মতো ঝলক দিচ্ছে রাজ্যের খুলি। পাঁজরের হাড়গোড়ের একটা মজবুত বেড়াজাল আঁটসাঁট খাঁচার মতো আমাকে ঘিরে ধরল। কুৎসিত ভাবে হাঁ-করা শ্রোণীচক্রের ভারে তাদের পায়ের নলী প্রচন্ড থরথর করে কাঁপতে লাগল, একটা মৌন অস্থিরতায় চারদিকে সাড়া পড়ে গেল।...

নৈর্ব্যক্তিক আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল শয়তানের শীতল হাসি।

সে বলল, 'দেখ, দেখ, ওরা সক্কলে বেরিয়ে এসেছে — কেউ বাদ যায় নি! এমনকি শহরে জড়বুদ্ধি বলে সকলে যাদের জানত, তারাও! পৃথিবীর বমি-বমি লাগছিল, সে তাই তার পেটের ভেতর থেকে উগরে দিয়েছে মানুষের মৃত জ্ঞান।...'

ভিজে-ভিজে কোলাহলটা দ্রুত বাড়তে লাগল ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে উঠোনের এক কোণে ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবর্জনার যে স্তূপটা জমিয়ে রেখেছে কেউ যেন হ্যাংলার মতো অদৃশ্য হাতে তার মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

হাজার হাজার ভাঙা টুকরো চারধার থেকে শয়তানকে কোণঠাসা করে ফেলছিল। সেগুলোর ওপর শয়তান তার ডানা প্রশস্ত করে মেলে দিয়ে বলল:

'পৃথিবীতে কত সৎ আর জ্ঞানী লোকই না ছিল তাহলে!'

'তোমাদের মধ্যে মানুষের সবচেয়ে বেশি ভালো করেছে কে?' সে জোরে জিজ্ঞেস করল।

একটা বড় কড়ায় টক ননীতে ব্যাঙের ছাতা সাঁতলালে যেমন ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ হয় তেমনি চারপাশের সকলে ফোঁসফোঁস করে উঠল।

'দয়া করে আমাকে সামনে আসতে দিন!' কে একজন করুণ স্বরে চিৎকার করে উঠল।

'প্রভু এই যে আমি, আমি এখানে! আমিই প্রমাণ করেছিলাম যে সমাজের সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি হল শূন্য।'

'আমি ওর চেয়েও এগিয়ে আছি!' দূরের কোন এক জায়গা থেকে আরেক জন আপত্তি তুলে বলল। 'আমি শিখিয়েছি যে সমগ্র সমাজ হল শূন্যের সমষ্টি, আর সেই কারণে দল যা বলে জনসাধারণের উচিত তা মেনে চলা।'

'আর দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে ব্যষ্টি - সেই নেতা আমি!' গুরুগম্ভীর স্বরে চেঁচিয়ে বলল অন্য এক জন।

'আপনি হতে যাবেন কেন?' কয়েকটি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমার মামা ছিলেন রাজা!'

'আচ্ছা, মহামহিম আপনার সেই মামারই বুঝি অকালে মাথাটা কাটা গিয়েছিল?'

'রাজাদের মাথা চিরকালই যথাসময়ে কাটা পড়ে,' একদা যে অস্থিপঞ্জর সিংহাসনে বসেছিল তার উত্তরাধিকারী অস্থিপঞ্জর সগর্বে উত্তর দিল।

'আচ্ছা!' কে যেন খুশি হয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল। 'আমাদের মধ্যে একজন রাজা আছে দেখছি! যে কোন কবরখানায় কিন্তু এটা দেখা যায় না।...'

ভিজে-ভিজে ফিসফিসানি আর হাড়ে হাড়ে ঘষাঘষির আওয়াজ একসঙ্গে মিলে ডেলা পাকিয়ে উত্তরোত্তর আরও ঘন ও ভারী হয়ে উঠতে লাগল।

'এদিকে তাকাও দেখি, রাজা-রাজড়ার হাড় নাকি নীল রঙের হয় — একথা কি সত্যি?' তড়বড় করে জিজ্ঞেস করল একটা মেরুদণ্ড-বাঁকা ছোটখাটো কঙ্কাল।

স্মৃতিস্তম্ভের ওপর সওয়ার হয়ে বসে ছিল একটা কঙ্কাল। সে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুরু করল:

'আজ্ঞা হয়ত বলি...'

'কড়ার জন্যে সেরা প্রলেপ — আমারই আবিষ্কার!' তার পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি হলাম সেই স্থপতি...'

কিন্তু একটা চওড়া ও বেঁটেখাটো কঙ্কাল তার হাতের খাটো খাটো হাড় দিয়ে সকলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে দিতে সমস্ত মৃত কণ্ঠস্বরের খস্‌খস্‌ আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল:

'হে আমার খ্রীষ্টসম্পর্কিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আমিই কি তোমাদের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক নই? তোমাদের জীবনের দুঃখবেদনার ঘর্ষণে তোমাদের অন্তরে যে কড়া পড়ে, নম্র সান্ত্বনাবাণীর প্রলেপ দিয়ে আমিই কি তা সারিয়ে তুলি নি?'

'দুঃখকষ্ট বলে কিছু নেই!' কে যেন বিরক্ত হয়ে বলল। 'সব আছে শুধু কল্পনায়।'

'...সেই স্থপতি, যে নীচু দরজা বার করেছিল...'

'আর আমি বার করি মাছি মারার জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ!..'

'...লোকে যাতে বাড়িতে ঢোকার সময় আপনা থেকে বাড়ির কর্তার সামনে মাথা নোয়ায় তার জন্য...' একটা ঘ্যানঘেনে গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'অগ্রগণ্যতা কি আমারই পাওয়া উচিত নয়, ভ্রাতৃবৃন্দ? তোমাদের চিত্ত যখন দুঃখেবেদনায় বিকল হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে স্থান লাভের জন্য ব্যাকুল, তখন আমিই কি পার্থিব বস্তুমাত্রেরই অসারতা সম্পর্কে আমার চিন্তার মধু ও দুগ্ধ তোমাদের চিত্তকে পান করাই নি?'

'যা আছে তা চিরকাল থাকবে!' কে যেন চাপা গলায় গুঞ্জন তুলল।

এক ঠ্যাঙওয়ালা একটা কঙ্কাল একটা ছাইরঙা পাথরের ওপর বসে ছিল। সে তার পায়ের নলী তুলে টান করল, তারপর কেন যেন চেঁচিয়ে বলল:

'ঠিক কথা! একশ' বার!'

কবরখানা একটা বাজার হয়ে দাঁড়াল প্রত্যেকে যার যার মালের গুণ গাইছে। অবদমিত কোলাহলের একটা ঘোলা নদী, নোংরা আত্মম্ভরিতা ও শ্বাসরোধী আত্মশ্লাঘার বন্যাস্রোত নিস্তব্ধতার অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য প্রান্তরে এসে মিলছে। যেন পচা জলাভূমির মাথার ওপর এক ঝাঁক মশা পাক খেয়ে খেয়ে গান গাইছে, গুনগুন, পিন্‌পিন্‌ আওয়াজ করছে, যত রাজ্যের বিষে, কবরে সমস্ত বিষবাষ্পে বাতাস ভরিয়ে তুলেছে। সকলে শয়তানের চারধারে ভিড় করে আছে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে, তাদের চোখের কালো কালো কোটর স্থির হয়ে আছে তার মুখের ওপর - যেন সে পুরনো মালের এক খদ্দের। একের পর এক মৃত চিন্তা উজ্জীবিত হয়ে উঠে শরৎকালের হতভাগ্য পাতার মতো বাতাসে পাক খেয়ে চলেছে।

শয়তান তার সবুজ চোখের দৃষ্টিতে এই প্রবল উচ্ছ্বাস লক্ষ করতে লাগল, তার দৃষ্টি থেকে অস্থির স্তূপের ওপর ঝরে পড়তে লাগল নিরুত্তাপ কাঁপা-কাঁপা অনুপ্রভ আলো।

একটা কঙ্কাল মাটিতে তার পায়ের কাছে বসে ছিল। হাতের অস্থি করোটির ওপরে তুলে সমান তালে শূন্যে নাচাতে নাচাতে সে বলল:

'প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের হওয়া উচিত একজন পুরুষের অধিকারভুক্ত...'

কিন্তু তার ফিসফিস আওয়াজের মধ্যে অন্য এক আওয়াজ এসে প্যাঁকিয়ে গেল, সে যে কথাগুলো বলছিল সেগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে অন্য সব কথার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল।

'কেবল মৃত ব্যক্তিই জানে সত্য কী!..'

আরও সব কথা ধীরে ধীরে ঘুরপাক খেতে লাগল:

'পিতা, আমি বলেছি, সে হল একটা মাকড়সাবিশেষ...'

'এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন বিভ্রান্তিজনিত বিশৃঙ্খলা, ঘোর অন্ধকার!'

'আমি তিন তিনবার বিয়ে করেছিলাম, আর তিন বারই - আইনমাফিক...'

'সারা জীবন ধরে সে অক্লান্ত ভাবে বুনে চলেছে পারিবারিক সৌভাগ্যের সূক্ষ্ম সুতো...'

'.. আর প্রত্যেকবারই একজন নারীকে...'

এমন সময় কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হল এক কঙ্কাল — তার হলুদ রঙের ঝাঁঝরা হাড়গুলো তীক্ষ্ন ক্যাঁচকোঁচ আর্তনাদ তুলল। শয়তানের চোখের দিকে আধা খসে-পড়া মুখ তুলে সে জানাল:

'আমি মারা গেছি উপদংশ রোগে হ্যাঁ, তাই বটে! কিন্তু তাহলেও নৈতিকতার ওপরে আমার ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল! আমি যখন দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী অসতী তখন আমি নিজে এই দুষ্কর্মের জন্য আদালত ও সমাজের ওপর তার বিচারের ভার তুলে দিই।...'

কিন্তু চারদিক থেকে অন্যান্য কঙ্কালের অস্থির ঠেলাঠেলিতে তাকে ধাক্কা খেয়ে সরে যেতে হল। ফের চিমনির ভেতরকার বাতাসের মৃদু হু-হু ধ্বনির মতো শোনা গেল বহু কণ্ঠের পাঁচমিশালী ধ্বনি।

'আমি একটা ইলেকট্রিক চেয়ার আবিষ্কার করেছি! তাতে যন্ত্রণা না দিয়ে মানুষকে মারা যায়।'

'আমি মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি পরপারে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অনন্ত স্বর্গসুখ...'

'পিতা তার সন্তানকে জীবন ও খাদ্য দান করেন... কোন মানুষ তখনই মানুষ হয় যখন সে পিতৃত্বের অধিকারী হয়, তার আগে পর্যন্ত সে পরিবারের একজন সদস্য ছাড়া আর কেউ নয়...'

ডিমের আকারের এক করোটির মুখের ওপর খণ্ড খণ্ড মাংস ঝুলছিল। অন্য সকলের মাথার ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে সে বলল:

'আমি প্রমাণ করেছি যে শিল্পকে সমাজের সামগ্রিক মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ও দাবি মেনে চলতে হবে...'

আরেকটি করোটি ভাঙা গাছের আকারে তৈরি একটা স্মৃতিস্তম্ভের ওপর বসে ছিল। সে আপত্তির সুরে বলল:

'স্বাধীনতার অস্তিত্ব একমাত্র নৈরাজ্য হিশেবেই থাকা সম্ভব!'

'শিল্প হল জীবনে ও শ্রমে ক্লান্ত আত্মার এক চমৎকার ওষুধ...'

'আমিই বলেছিলাম যে কর্মই জীবন!' দূর থেকে ভেসে এলো।

'ওষুধের দোকানে যে সব সুন্দর সুন্দর বাক্সে ওষুধের বড়ি পাওয়া যায় বইপুথিও সেই রকম সুন্দর হওয়া চাই...'

'সব লোকের কাজ করা উচিত, কিছু কিছু লোকের উচিত কাজের ওপর নজর রাখা। ...শ্রমের ফল ভোগ করবে তারাই যারা তাদের নিজ মর্যাদায় ও নিজ গুণে সেই যোগ্যতা অর্জন করেছে...'

'শিল্পকে হতে হবে সুন্দর ও মানবদরদী।... আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন তার কাজ হবে আমাকে অবসরের গান গেয়ে শোনানো।...'

শয়তান এই বারে মুখ খুলল। সে বলল:

'আমি কিন্তু ভালোবাসি স্বাধীন শিল্পকে, যে শিল্প সৌন্দর্যের বেদী ছাড়া আর কারও সেবা করে না। বিশেষ করে ভালোবাসি তখন, যখন এক সুকুমারমতি কিশোরের মতো কালজয়ী সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রবল তৃষ্ণায় আকুল হয়ে সে তাকে উপভোগ করে, জীবনের দেহ থেকে বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদ খুলে ফেলে... আর তখন জীবন তার সামনে দেখা দেয় এক জরাগ্রস্ত ভ্রষ্টার চেহারা নিয়ে — তার চামড়া ঝুলে পড়েছে, তার সর্বাঙ্গে বলিরেখা আর দুষ্ট ক্ষত। উন্মত্ত ক্রোধ, সুন্দরের জন্য আকুলতা এবং জীবনের বদ্ধ জলাভূমির প্রতি ঘৃণা — এই আমি ভালোবাসি শিল্পে।... নারী আর শয়তান — এরাই হল একজন ভালো কবির বন্ধু।...'

ঘণ্টা-মিনার থেকে তামার ধাতব আওয়াজ আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ল. একটা বিরাট পাখির মতো অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য থেকে লীলায়িত ভঙ্গিতে স্বচ্ছ ডানা ঝটপট করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে উড়তে লাগল মৃত নগরীর মাথার ওপর।... সম্ভবত কোন চৌকিদার ঝিমোতে ঝিমোতে হাতের ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে, ভুল করে, আলস্যভরে ঘণ্টার দড়ি ধরে টান দিয়ে বসেছে। ধাতব আওয়াজটা দেখতে দেখতে বাতাসের মধ্যে গলে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার শেষ শিহরণের রেশ মিলিয়ে যাবার আগে রাতের ঘণ্টা জেগে সচকিত হয়ে উঠে নতুন করে এক তীক্ষ্ন আওয়াজ তুলল। গুমোট বাতাসে কাঁপন উঠল, তামার ধাতব শিহরণের করুণ গুঞ্জন ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল অস্থিপঞ্জরের মর্মরধ্বনি, বিশুষ্ক কণ্ঠের খস্‌খস্‌ আওয়াজ।

আবার আমি শুনতে পেলাম মূর্খের বিরক্তিকর, একঘেয়ে প্রলাপ, নিষ্প্রাণ ইতরতার যত চটচটে কথা, বিজয়ী মিথ্যাচারের প্রগল্‌ভ কণ্ঠস্বর, বিরক্ত আত্মম্ভরিতার অসন্তোষ। লোকে যে-সমস্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে শহরে বসবাস করে তাদের সবগুলো প্রাণ ফিরে পেল, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এমন একটিও ছিল না যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। ঝনঝন করে বেজে উঠল সবগুলি মরচে ধরা বেড়ি, যা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে জীবনের প্রাণপুরুষ; কিন্তু যে তড়িৎ-শিখা সগর্বে মানুষের অন্ধকার অন্তরাত্মাকে আলোকিত করে তোলে তার উদ্ভাস একবারও দেখা গেল না।

'যারা আসল নায়ক তারা কোথায় গেল?' আমি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলাম।

'তারা বিনয়ী, তাদের সমাধি বিস্মৃত। জীবদ্দশায় তারা উৎপীড়িত, আর এখন, কবরখানায় মৃতদের অস্থিপঞ্জর তাদের দাবিয়ে রেখে দিয়েছে!' এই বলে তেলতেলে পচাগলা গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে সে ডানা ঝাপটাল। গন্ধটা যেন কালো মেঘের মতো চাপ বেঁধে আমাদের ঘিরে রেখেছিল, তার মাঝখানে ক্রিমিকীটের মতো কিলবিল করছিল মৃতদের একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, ধূসর কণ্ঠস্বর।

চর্মকার বলল তার ওয়ার্কশপের সকলের মধ্যে সে-ই প্রথম লোক যে তার উত্তর পুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারে — ছুঁচলো ডগার জুতো তারই মস্তিষ্কপ্রসূত। এক বিজ্ঞানী তার কেতাবে বিভিন্ন ধরনের এক হাজার মাকড়সার বৃত্তান্ত লিখেছে বলে দাবি করল যে সে হল সবচেয়ে

বড় বিজ্ঞানী। যে লোকটা দ্রুত গোলা ছোঁড়ার উপযোগী কামান উদ্ভাবন করেছে সে বেশ জোর দিয়ে তার চারপাশের সকলকে শান্তির জন্য তার এই আবিষ্কারের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করছিল। এদিকে কৃত্রিম দুগ্ধ আবিষ্কর্তা তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে বিরক্তিভরে ঘ্যান ঘ্যান করে চলছিল। হাজার হাজার লিকলিকে ভিজে সপসপে দড়ি মস্তিষ্ককে কষে বেঁধে সাপের কামড়ের মতো কেটে বসে যাচ্ছিল। মৃতরা সবাই বিষয় তাদের যা-ই হোক না কেন - কথা বলছিল কিন্তু কট্টর নীতিবাগীশের মতো; তারা যেন জীবনের বন্দীশালায় এককেটি কাজপাগল কারারক্ষী।

'যথেষ্ট হয়েছে!' শয়তান গর্জন করে উঠল। 'আমার ঘেন্না ধরে গেল! মড়াদের এই কবরখানায় আর শহরে, জ্যান্ত মানুষদের কবরখানায় যা সব কান্ডকারখানা দেখছি তাতে আমার ঘেন্না ধরে গেল।... তোমরা হলে কিনা সত্যের প্রহরী! এক্ষুনি চলে যাও কবরের নীচে!'

ক্ষমতার ওপর কোন প্রভুর বিতৃষ্ণা ধরে গেলে যেমন হয়, তার লৌহকঠিন চিৎকারের মধ্যেও ফুটে উঠল তেমনি ভাব।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে হলুদ ও ছাইরঙা দেহাবশেষের সেই পুঞ্জটা হঠাৎ হিস হিস শব্দ করে উঠল, ঘূর্ণিবায়ুতাড়িত ধুলোর মতো ঘুরপাক খেয়ে ফুঁসতে লাগল। পৃথিবী হাজার হাজার অন্ধকার মুখগহ্বর মেলে ধরল, তারপর একটা পরিতৃপ্ত শুয়োরের মতো মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে আলস্যভরে ফের নিজের উগরে দেওয়া খাবার গিলে ফেলল, আবার পরিপাক করতে লাগল।... এক নিমিষে সব অদৃশ্য হয়ে গেল, পাথরগুলো নড়েচড়ে উঠে আবার যার যার জায়গায় শক্ত হয়ে গেঁথে গেল। থাকার মধ্যে রয়ে গেল একটা শ্বাসরোধী গন্ধ, তার ভিজে-ভিজে ভারী হাত কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসছে।

শয়তান একটা কবরের ওপর বসে পড়ে হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকিয়ে তার কালো কালো দুই হাতের লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে মাথা চেপে ধরল। তার চোখের দৃষ্টি দূরের অন্ধকারে, পাথর আর কবরের ভিড়ের মধ্যে এসে স্থির হয়ে ঠেকে গেল।... তার মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে তারার মালা। আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, তামার ঘণ্টার ধাতব ধ্বনি তার বুকে ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে রজনীকে জাগিয়ে দিচ্ছে।

'দেখলে ত?' সে আমাকে বলল। 'এই সমস্ত মূর্খতার ছাতা-ধরা, ডাহা মিথ্যা আর আঠাল ইতরতার বিষঢালা, অনিশ্চিত, পঙ্কিল জমির বুকে গড়ে উঠেছে জীবনচর্চার এক অন্ধকার, চাপা ইমারত — একটা খোঁয়াড়।

মৃতরা তোমাদের সকলকে খেদিয়ে নিয়ে সেখানে পুরে রাখছে ভেড়ার পালের মতো।... মানসিক জড়তা ও ভীরুতা নমনীয় পাত দিয়ে বেঁধে তোমাদের এই কারাদুর্গকে সুরক্ষিত করে রাখছে। মৃতরাই চিরকাল তোমাদের জীবনের আসল প্রভু। জীবন্ত লোকজন তোমাকে শাসন করলে কী হবে তাদের প্রেরণা দিচ্ছে সেই মৃতরা। সমাধি হল জীবনবেদের উৎসস্থল। আমি বলি, তোমরা যাকে কান্ডজ্ঞান বল তা আসলে মৃতদেহের রসে পুষ্ট একটা ফুল। মৃতব্যক্তি মাটির নীচে তাড়াতাড়ি পচলেও জীবিত মানুষের মনোভূমিতে সে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। মৃত ধ্যানধারণার বিশুষ্ক ও সূক্ষ্ম ধূলিকণা স্বচ্ছন্দে জীবিতদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। ঠিক এই কারণেই তোমাদের সমস্ত জ্ঞানপ্রচারক আত্মিক মৃত্যুর প্রচারকমাত্র।'

শয়তান মাথা তুলল, তার সবুজ চোখজোড়া দুটি শীতল তারার মতো আমার মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রইল।

'পৃথিবীতে সবচেয়ে জোর গলায় কী প্রচার করা হয়ে থাকে? লোকে কিসের ধ্রুব প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চায় পৃথিবীর বুকে? জীবনকে খন্ডবিখন্ড করার নিয়ম; লোকের জন্য অবস্থাভেদের বৈধতা এবং তাদের জন্য মানসিক ঐক্যের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। সকলের মনের এক একাকার রূপ, একটা বর্গক্ষেত্র যাতে জীবনের মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভুর খেয়ালখুশি অনুযায়ী লোকজনকে স্বচ্ছন্দে যে-কোন জ্যামিতিক ছাঁচের মধ্যে ইটের মতো গাঁথা যায়। পদানতকারীদের বুদ্ধির নৃশংস ও মিথ্যাচারী আত্মপ্রকাশের সঙ্গে পদানতদের তিক্ত উপলব্ধির মিটমাট ঘটানোর এই আহ্বান ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় প্রতিবাদের সৃজনী চেতনা বিনাশের হীন আকাঙ্ক্ষা থেকে এর জন্ম। এই বাণী মানুষের স্বাধীন আত্মার জন্য মিথ্যার পাথর সাজিয়ে সমাধি-গুহা তৈরি করার একটা ইতর পরিকল্পনা মাত্র।...'

ফরসা হয়ে আসতে লাগল। সূর্যের আগমন-আশঙ্কায় পান্ডুর আকাশের গায়ে তারাগুলো আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছে। কিন্তু শয়তানের চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল।

'জীবনকে সুন্দর আর পূর্ণ করে তোলার জন্য মানুষের কাছে কোন্ বাণী প্রচার করা উচিত? সব মানুষের জন্য সমান অবস্থা আর আলাদা আলাদা মন। তাহলে জীবন হবে একটা ফুলের ঝাড়ের মতো -- প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা থেকে তার মূল আহরণ করবে

শক্তি। তখন জীবন হবে সকলের পক্ষে সাধারণ সৌহার্দের উপলব্ধি আর ঊর্ধ্বে আরোহণের সমবেত চেষ্টার ভিত্তিতে জ্বলে ওঠা এক ধ্বনির আলোর মতো।... তখন ধ্যানধারণার সংঘাত বাধবে, কিন্তু মানুষ চিরকালের জন্য মানুষের বন্ধু থাকবে। ভাবছ এটা অসম্ভব? — কিন্তু আমি বলছি এটা ঘটবেই, যেহেতু এখনও ঘটে নি!'

'এই যে দিন শুরু হচ্ছে!' পুবের দিকে চেয়ে শয়তান বলে চলল। 'কিন্তু মানুষের ঠিক হৃদয়-মন্দিরেই যখন রজনী নিদ্রা যায় তখন সূর্য আনন্দের বারতা বয়ে আনে কী করে? সূর্যকে উপভোগ করার মতো সময় মানুষের নেই, বেশির ভাগ মানুষ চায় স্রেফ রুটি — একদল মানুষ ব্যস্ত থাকে রুটি কত কম দেওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে; আরেক দলও ঐ রকম ব্যস্ত ভাবে জীবনের চাঞ্চল্যের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকে, সব সময় মুক্তির সন্ধান করে বেড়ায়, কিন্তু অন্নসংস্থানের অবিরাম সংগ্রামের মাঝখানে তাকে আর খুঁজে বার করতে পারে না! হতভাগ্য তারা মরিয়া হয়ে, নিঃসঙ্গতার ফলে তিতবিরক্ত হয়ে, যার সঙ্গে আপস করা সম্ভব নয় তার সঙ্গে আপসে আসার চেষ্টা করে। এই ভাবে মানবসন্তান স্থূল মিথ্যার পাঁকে ডুবে যায় — গোড়ায়, না জেনেশুনে — আদৌ লক্ষ করতে পারে না যে নিজের প্রতি নিজে বিশ্বাসঘাতকতা করছে; কিন্তু পরে জ্ঞাতসারে — নিজের বিশ্বাসের প্রতি, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বেইমানি করতে তার বাধে না।...'

শয়তান উঠে দাঁড়াল, সজোরে ঝটপটিয়ে তার ডানা ছড়াল।

'আমিও আমার প্রত্যাশার পথ ধরে এগোতে থাকব অপূর্ব সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যতের দিকে।...'

এই বলে ঘণ্টাধ্বনির বিষণ্ণ সঙ্গীতকে অনুসরণ করে — তামার ঘণ্টার মুমূর্ষু ধাতব ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সে উড়ে চলে গেল পশ্চিমের দিকে।...

জনৈক মার্কিনীকে আমি আমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলি। আমার মনে হয়েছিল লোকটা বোধহয় অন্যান্যদের তুলনায় মানুষের অনেক কাছাকাছি। আমার বৃত্তান্ত শুনে সে প্রথমে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, তারপর উল্লসিত হয়ে মৃদু হেসে বলল:

'ও হ্যাঁ, বুঝেছি! শয়তান ছিল কোন এক সৎকার সমিতির দাহ-চুল্লীর দালাল! অবশ্যই তাই! সে যা যা বলেছে তাতে শবদেহ পোড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ পাচ্ছে।... মানতেই হবে লোকটা চমৎকার এজেণ্ট! নিজের কোম্পানীর সেবা করার জন্য কিনা স্বপ্নে পর্যন্ত লোকের কাছে দেখা দেয়!'

১৯০৬

প্রবন্ধ

কোন এক মার্কিন পত্রিকার প্রশ্নতালিকার উত্তর*)

আপনারা প্রশ্ন করেছেন:

'আপনাদের দেশ আমেরিকাকে ঘৃণা করে কি এবং আমেরিকার সভ্যতা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

এ ধরনের প্রশ্ন যে করা হয় এবং এমন আকারে করা হয় — স্রেফ এই ঘটনার মধ্যেই মার্কিন স্বভাবসুলভ বিশ্রী রকমের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন ইউরোপীয় 'টাকা করার' খাতিরে এরকম কোন প্রশ্ন করতে পারে একথা ধারণায়ই আনতে পারি না। অনুমতি দেন ত বলি, আপনার প্রথম প্রশ্নের — এবং সেই সঙ্গে আরও সব প্রশ্নেরও প্রসঙ্গে বলতে হয় যে আমার দেশের ১৫ কোটি নাগরিকের তরফ থেকে উত্তর দেবার অধিকার আমার নেই, যেহেতু আপনাদের দেশ সম্পর্কে তাদের মনোভাব কী -- একথা তাদের জিজ্ঞেস করার সুযোগ আমার নেই।

আমার ধারণা, আপনাদের পুঁজিপতিরা যাদের রুধিরকে ডলারে পরিণত করছে তাদের দেশে পর্যন্ত --- ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলিতে, চীনে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে যে এক কোটি অশ্বেতকায় লোক আছে তাদের মধ্যেও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এমন একটি মানুষেরও সাক্ষাৎ মিলবে না যে তার জনগণের পক্ষ থেকে বলার অধিকার রাখে: 'হ্যাঁ আমার দেশ, আমার জাতির লোকেরা আমেরিকাকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে পুরো মার্কিন জাতিটাকে -- যেমন কোটিপতিদের, তেমনি শ্রমিকদের, যেমন শ্বেতকায়দের, তেমনি অশ্বেতকায়দের; ঘৃণা করে নারী ও শিশুদের, তার প্রান্তর ও নদনদীকে, অরণ্য ও পশুপাখিকে, আপনাদের দেশের অতীত ও বর্তমানকে, তার জ্ঞানবিজ্ঞানকে, মনীষীদের, তার

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

অসাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যাকে, এডিসনকে, লুথার বারবাঙককে, এডগার অ্যালেন পো, ওয়াল্‌ট হুইটম্যান, ওয়াশিংটন ও লিংকনকে, থিওডর ড্রাইজার, ইউজিন ও'নিল ও শের্‌উড অ্যান্ডারসনকে, প্রতিভাবান সমস্ত শিল্পীকে, জ্যাক লন্ডনের মানস-পিতা ব্রেট হার্টকে, ঘৃণা করে থোরো ও এমার্সনকে— এক কথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা যা আছে সব কিছু এবং যারা যারা এদেশে বাস করে তাদের সকলকে।'

আমি ভরসা করে বলতে পারি, আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে মানুষ ও তার সংস্কৃতির প্রতি এত প্রচন্ড ঘৃণার সঙ্গে, এরকম উন্মাদের মতো আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে — এত দূর নির্বোধ কেউ আছে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য, আপনারা যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতা আখ্যা দিয়ে থাকেন, তা আমার মনে প্রীতির উদ্রেক করতে পারে না। আমার মনে হয় আপনাদের সভ্যতা আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত সভ্যতা; তার কারণ এই যে ইউরোপীয় সভ্যতার যত বিচিত্র ধরনের ও কলঙ্কজনক কুশ্রীতা থাকতে পারে আপনাদের সভ্যতার মধ্যে তার পৈশাচিক বৃদ্ধি ঘটেছে। শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যে বিদ্বেষের বীজ আছে তার ফলে ইউরোপের যে অধঃপতন ঘটেছে তা রীতিমতো বেদনাদায়ক ঠিকই; তথাপি আপনাদের যারা লাখোপতি ও কোটিপতি, যারা আপনাদের দেশকে অবক্ষয়ের অলঙ্কারে ভূষিত করছে, তাদের মতো অর্থহীন ও ক্ষতিকর কোন কিছুর আত্মপ্রকাশ ইউরোপে এখনও অসম্ভব। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে বস্টনের সেই হত্যাকান্ড? — ধনী পরিবারের দুই বালক আরেকটি বালককে খুন করে স্রেফ কৌতূহল চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে! আপনাদের 'মবারির' ফলে, আপনাদের কৌতূহলের ফলে আপনাদের দেশে এরকম আরও কত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে বলতে পারেন? ইউরোপও তার নাগরিকদের অধিকারহীনতা ও অসহায় অবস্থার জন্য বড়াই করতে পারে বৈ কি! কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে এখনও সাক্কো-ভাঞ্জেত্তি হত্যাকান্ডের*[1] মতো কলঙ্কের পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে নি। ফ্রান্সে 'ড্রেইফুস মামলা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল — তাও অত্যন্ত লজ্জাজনক; তবু ফ্রান্সে এমিল জোলা ও আনাতোল ফ্রাঁস নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষকে তাঁদের পক্ষে আনতে পেরেছিলেন। জার্মানিতে যুদ্ধের পর কু-ক্লুক্‌স-ক্ল্যান গোছের একটা বস্তুর — খুনিদের একটা সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল বটে, কিন্তু সেখানে তাদের ধরা হয়, ধরে বিচার করাও হয়; অথচ আপনাদের দেশে ওটা রেওয়াজ নয়। কু-ক্লুক্‌স-

ক্ল্যান খুন করে চলেছে, অশ্বেতকায় লোকজন আর নারীদের ওপর অত্যাচার ক'রে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু তার জন্য কোন শাস্তি হয় না, যেমন ভাবে সোশ্যালিস্ট শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন করেও স্টেট গভর্ণররা শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

ইউরোপে কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের মতো ন্যক্কারজনক ব্যাপার নেই, যদিও সে ভুগছে অন্য একটি কলঙ্কজনক ব্যাধিতে - ইহুদি-বিদ্বেষে; প্রসঙ্গত, আমেরিকাও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।

অপরাধ ইউরোপেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এখনও, আপনাদের সংবাদপত্রের কথা মানলে -- চিকাগোয় যা ঘটছে, অর্থাৎ স্টক এক্সচেঞ্জ ও ব্যাঙ্কের গুন্ডাবদমাশ ছাড়াও বোমা ও রিভলভার হাতে সেখানে দুর্বৃত্তদের যে অবাধ রাজত্ব চলছে -- সে পর্যায়ে ইউরোপ পেঁছুতে পারে নি। সুরাপান নিষেধাজ্ঞার ফলে আপনাদের দেশে যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, ইউরোপে তা অকল্পনীয়। শহরের মেয়র ইংরেজি ক্লাসিক প্রকাশ্যে দাহ করছেন - যা করেছিলেন চিকাগোর মেয়র -- এও অকল্পনীয়।

'Nation' পত্রিকার সম্পাদক উইলার্ডের কাছ থেকে আমেরিকায় যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে বার্ণার্ড শ যেমন শ্লেষাত্মক জবাব দিয়েছিলেন, আমার মনে হয় আর কোন দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলে তিনি সেই অধিকারই পেতেন না।

সব দেশের পুঁজিপতি একই রকম বিশ্রী ও মনুষ্যত্বহীন একটা জাত, কিন্তু আপনাদের এরা আরও খারাপ। তাদের অর্থলালসা যেন আরও বেশি মূর্খতার পর্যায়ে যায়। প্রসঙ্গত, 'বিজনেসম্যান' কথাটাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে 'বায়ুগ্রস্ত' বলে অনুবাদ করে থাকি।

পুরো ব্যাপারটা কী রকম বোকামি আর লজ্জার একবার ভেবে দেখুন দেখি! - আমাদের এত সুন্দর এই যে গ্রহটাকে আমরা এত কষ্ট করে সাজাতে ও সমৃদ্ধ করে তুলতে শিখেছি আমাদের এই পৃথিবীটা, বলতে গেলে পুরোপুরিই কিনা মুষ্টিমেয়, লোভী এমন একটা গোষ্ঠীর লোকজনের হাতের মুঠোয়, যারা টাকাকড়ি ছাড়া আর কিছুই বানাতে জানে না! ঐশ্বর্যপূর্ণ সৃজনী শক্তিকে - আমাদের সংস্কৃতিকে, আমাদের 'দ্বিতীয় প্রকৃতিকে' যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের -- বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, কবি আর শ্রমিকদের রক্ত ও মস্তিষ্ককে এই স্থূলবুদ্ধির লোকগুলো পীতবর্ণের ধাতুচক্রে এবং চেক-এর কাগজের ফালিতে পরিণত করে।

টাকা ছাড়া আরও কী সৃষ্টি করে পুঁজিপতিরা? নৈরাশ্যবাদ, ঈর্ষা, লোভ ও ঘৃণা — সে ঘৃণা এমন যে তার ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু

তাদের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অসংখ্য সাংস্কৃতিক সম্পদও ধ্বংস হতে পারে। আপনাদের অতিস্ফীতি রোগগ্রস্ত এই সভ্যতা আপনাদের চরম ট্র্যাজিডির বিপদ সূচনা করছে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্যই এই মত পোষণ করি যে সংস্কৃতির দ্রুত অগ্রগতি আর খাঁটি সভ্যতা একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা, অন্যের শ্রমে জীবনধারণকারী পরজীবীদের হাতে না থেকে সম্পূর্ণ ভাবে শ্রমজীবী জনগণের হাতে থাকে। আর বলাই বাহুল্য, আমার পরামর্শ এই যে পুঁজিপতিদের সামাজিক ভাবে বিপজ্জনক একদল লোক বলে ঘোষণা করা হোক, রাষ্ট্রের স্বার্থে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক, এই লোকগুলোকে সমুদ্রের মাঝখানে কোন এক দ্বীপে রেখে আসা হোক — সেখানে তারা শান্তিতে মরুক গে। এটা হবে সামাজিক সমস্যার খুব মানবিক সমাধান, আর তা 'মার্কিন আদর্শবাদের' সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপও খায় বটে; সামগ্রিক ভাবে 'জাতির ইতিহাস' নামে যা আখ্যাত সেই নাটক ও ট্র্যাজিডির অভিজ্ঞতা এখনও যাদের হয় নি, এই আদর্শবাদকে তাদের হাস্যকর রকমের সরল আশাবাদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

১৯২৭-১৯২৯

বুর্জোয়া প্রেস প্রসঙ্গে*)

পুরনো হাবিজাবি জিনিসের বাজারে গেলে তৎক্ষণাৎ লোকের গতকালের জীবনযাত্রার ছবি দেখতে পাওয়া যায়; এদিকে খবরের কাগজে প্রকাশিত ঘটনা আর বিজ্ঞাপন থেকে বেশ ভালো করে আমরা জানতে পারি লোকের আজকের জীবনযাত্রার খবর। খবরের কাগজের কথা যখন আমি বলি তখন আমি ইউরোপ ও আমেরিকার 'সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিতে' আধুনিক 'জনশিক্ষার' যে-সমস্ত 'মুখপত্র' আছে তাদের কথা ভেবেই বলি। আমার বিবেচনায় বাবুদের অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে তাদের চাকরবাকরদের মুখের বিবরণ শোনা যেমন উপকারী, বুর্জোয়া প্রেসের খবর শোনাও তেমনি উপকারী। কোন সুস্থ সবল লোক ব্যাধি সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করে না, তার সেরকম আগ্রহ বোধ করা উচিতও নয়, কিন্তু একজন চিকিৎসক ব্যাধি নিয়ে চর্চা করতে বাধ্য। ডাক্তার ও সাংবাদিকের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে; তারা দু'জনেই

রোগের উপসর্গ ও চরিত্র নির্ণয় করে। আমাদের সাংবাদিকরা বুর্জোয়া সাংবাদিকদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে - সামাজিক রোগবিকারের সাধারণ কারণগুলি তাদের কাছে সুপরিচিত। এই কারণে রোগীর আর্ত চিৎকার ও কাতরানিকে ডাক্তার যে-দৃষ্টিতে দেখেন, বুর্জোয়া প্রেসের সাক্ষ্যের প্রতি একজন সোভিয়েত সাংবাদিককেও তেমনি মনোযোগী হতে হবে। আমাদের দেশে যদি সে রকম কোন প্রতিভাবান লোক থাকত, যে-কোন 'সংস্কৃতি কেন্দ্রের' সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে সে যদি দোকান, রেস্তোরাঁ ও প্রমোদগৃহের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এবং লোকসমাগম, অভ্যর্থনা সভা ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবরণের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারত, সে যদি এই মালমশলার পুরোটাকে ঘষামাজা করতে পারত (অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে জন ডস্ পাসোস 'ম্যানহাটন ট্রান্সফার' নামে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচনা করেছেন), তাহলে আমরা বর্তমান কালের বুর্জোয়া সমাজের 'সাংস্কৃতিক জীবনের' এক চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর চিত্র পেতে পারতাম।

বুর্জোয়া প্রেসে রোজ কী ধরনের খবর থাকে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত মে মাসে সেখানে যে-সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল সেগুলোর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

'সংশোধনাগারের ছাত্রদের বিদ্রোহ' - সংশোধনাগার থেকে ১৪ টি বালক পলায়ন করে, অশ্বারোহী পুলিশ কর্তৃক ১২ জন ধৃত হয়, বাকি দু'জনের সন্ধান পাওয়া যায় নি। 'অল্পবয়স্কের উপর উৎপীড়নের আরও একটি ঘটনা', 'সন্তানঘাতিনী জননী' - গ্যাস প্রয়োগে দুই শিশুসন্তান হত্যা; কারণ — অনাহার। 'গ্যাসের বিষক্রিয়ার আরও একটি ঘটনা' স্বামী-স্ত্রী, বুড়ি শাশুড়ি, তিন বছরের মেয়ে, বুকের শিশুসন্তান - মোট পাঁচজনের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু। 'ক্ষুধার তাড়নায় হত্যা,' 'আরও একজন স্ত্রীলোক খণ্ডখণ্ড', 'জেলখানায় অভ্যস্ত' - পাঁচবছর কারাদণ্ড ভোগের পর একজন লোক জেলখানা থেকে ছাড়া পায়; কিন্তু ছাড়া পেয়ে সে পুলিশের কাছে গিয়ে জানায় যে সে অসুস্থ, কাজ করার ক্ষমতা তার নেই, ভিক্ষে করারও ইচ্ছে নেই, তাই অনুরোধ জানাচ্ছে তাকে যেন আবার জেলে পোরা হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 'ন্যায়বিচার' অনুযায়ী এটা সম্ভব নয়, তাই জেলখানায় 'অভ্যস্ত' লোকটিকে দোকানের শো কেস-এর কাচ ভেঙে, পুলিশের সঙ্গে মারদাঙ্গা বাধিয়ে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হল। 'ভিখারি লাখপতি' - আশি বছর বয়সে এক বুড়ো ভিখিরি মারা গেলে তার জিনিসপত্রের মধ্যে

৫০ লক্ষ ক্রোন পাওয়া যায়। '২ কোটি পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি রেখে ৮৯ বছর বয়সে লর্ড এশটনের পরলোকগমন।' 'মন্স্টার ট্রায়াল' — শহরের জল সরবরাহ পাইপে পানীয় জল দূষিত হওয়ার ফলে লিয়নে ৩০০ জন লোকের মৃত্যু হয়। 'তাসের খেলায় বিপুল লোকসান।' 'গতকাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক হত্যাকান্ড ঘটে, দুর্বৃত্তরা নিরাপদে আত্মগোপন করে।' 'নিরাপদে' শব্দটি এক্ষেত্রে কিন্তু শ্লেষ হিশেবে গ্রহণ করলে চলবে না, সাফল্যের জন্য সহানুভূতি বলে ধরতে হবে।

এর পর আছে কম বেশি বড় বড় প্রতারণা ও উৎকোচ গ্রহণের ঘটনা, যৌন ব্যভিচার এবং পরিণামে আত্মহত্যা ও হত্যাকান্ড। বলাই বাহুল্য, এক মাস সময়ের মধ্যে কাগজে যা যা ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে আমি এখানে তার তুচ্ছ একটা অংশের উল্লেখ করলাম --- আর যা বাকি রইল তার শতকরা নব্বই ভাগ এই একই রকমের অপরাধমূলক ও বিকৃতির ঘটনা। এগুলি সব পরিবেশিত হয় অত্যন্ত সংক্ষেপে নীরস ও বর্ণহীন ভাষায়। সাংবাদিক যাতে তার ভাষায় খানিকটা সজীবতা ও বর্ণবৈচিত্র্য সঞ্চার করতে পারে সেই জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা হল আরও একটি স্ত্রীলোক খন্ডখন্ড করে হত্যা করা — বিশেষত স্যাডিস্ট কায়দায়; কিংবা আরও যেটা চাই তা হল ড্যুসেলডর্ফের খুনি, ক্যুর্টেন নামে জনৈক শ্রমিক ৫৩টি অপরাধের দায় স্বীকার করার পর হঠাৎ শুষ্ক কণ্ঠে তদন্তকারী পুলিশ-অফিসারকে বলে বসল, 'আচ্ছা আমি যদি এখন বলি এই সমস্ত ঠক-জোচ্চোরির কোনটাই আমি করি নি তাহলে আপনি কী বলবেন?' প্রশ্নটা 'চাঞ্চল্যকর' কিন্তু বুর্জোয়া দেশগুলিতে পুলিশের কাজ অমনিতেই দস্তুরমতো চাঞ্চল্যকর হয়ে উঠছে, তাই ক্যুর্টেনের প্রশ্নে সোভিয়েত পাঠকের অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত যেটা বোঝা যায় না তা হল এই যে এসব ছাপা হয় কেন? ঘটনার কোন ভাষ্য বুর্জোয়া প্রেসে দেওয়া হয় না। বুঝতে বাকি থাকে না, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অভ্যস্ত, কেউ এতে বিক্ষুব্ধ হয় না, উদ্বেগ বোধ করে না। আগেকার দিনে, যুদ্ধের আগে*) হলে বিক্ষুব্ধ হত। তখনকার দিনে স্পর্শকাতর কোন কোন ব্যক্তি 'সমাজদেহের ব্যাধি' সম্পর্কে টক-ঝাল-মিষ্টি মেশানো রচনা লিখত, নানা রকমের এমন সমস্ত উপলব্ধি প্রকাশ করত, যেগুলোর আড়ালে কখন কখন থাকত অস্বাভাবিক ঘটনার ফলে বিচলিত 'সংস্কৃতিবান' লোকজনের উদ্বেগ — কিন্তু তার চেয়েও বেশি — বিরক্তি।

আজকাল মামুলী জীবনের নাটকে বুর্জোয়া প্রেসের আর আগ্রহ দেখা যায় না, কারণ এই যে গন্ডায় গন্ডায়, শ'য়ে শ'য়ে নানারকমের চুনোপুঁটি

লোকের প্রত্যহ প্রাণনাশ বহুকাল হল স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে জীবনধারার কোন অদলবদল হয় না, যারা আনন্দফুর্তি করে, সুখেশান্তিতে কাল কাটাতে চায় তাদেরও কোন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে না এর ফলে। জমকাল সিনেমাহলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার চেয়েও বেশি -- জমকাল হোটেল-রেস্তোরাঁ, যেখানে জ্যাজের বাজনা কাঁপিয়ে তুলছে দালানের দেয়াল আর সিলিং। 'নষ্ট জীবনীশক্তি' পুনরুদ্ধারের ওষুধপত্রের বিজ্ঞাপন প্রাচুর্য আর যৌন ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কথার ফুলঝুরি ভরা অপূর্ব সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

আপনারা হয়ত বলবেন, কিন্তু ১৯১৪ সালের আগেও ত এই চাঞ্চল্যকর জিনিস ছিল! ছিল, তবে এমন কান-ফাটানো নয়। কিন্তু এখন, দেখেশুনে মনে হয় বুর্জোয়া 'সংস্কৃতি কেন্দ্র' যেন সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে এসেছে:

দিন দিন আয়ু যায়,
দিনগুলি দ্রুত ধায়,
অতএব দিবারাতি
এসো আরও সুখে মাতি!

কোন এক শুঁড়িখানার পাদপীঠ থেকে একজন লোক এই কথাগুলি প্রচার করেছিল। লোকটার ঠ্যাঙদুটো ছিল সরু সরু, পেটটা বিরাট, গালে পুরু রুজমাখা, নিয়মিত মাদকদ্রব্যসেবনের ফলে চোখের দৃষ্টি ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা।

আপনারা বলবেন আমি বড় বেশি রং চড়াচ্ছি তাই না? সে রকম কোন ইচ্ছে আমার নেই, যেহেতু আমি জানি যে পচাগলা জিনিস রোগ ছড়ায়। জীবনের রং নিজে থেকেই উত্তরোত্তর গাঢ় আর উজ্জ্বল হতে থাকে। তার কারণ হয়ত এই যে জীবনের তাপমাত্রা উঠছে, আর বুর্জোয়াদের আমোদফুর্তি দুঃসাহসী আনন্দের ফলে জ্বরবিকারের পর্যায়ে উঠছে। আমাদের ভাষায় দুঃসাহসী কথাটা সব সময় ভালো অর্থে প্রযুক্ত হয় না, অনেক সময়ই এর অর্থ 'বেপরোয়া'। বুর্জোয়ারা তাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, আগে থাকতে বুঝতে পারে, হতাশাকে ঢাকার উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবনকে আমোদফুর্তিতে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আমার ধারণা, আমেরিকা ও ইউরোপের সংবাদপত্রকর্মীদের সঙ্গে আমার খারাপ পরিচিতি নেই। আমার মতে, তারা হল কারখানার দিনমজুরের

মতো -- কষ্টসাধ্য ও উৎসাহহীন কাজের ফলে মানুষ সম্পর্কে মনে মনে তারা সুগভীর উদাসীনতা অনুভব করে; তারা যেন অনেকটা মানসিক রোগের হাসপাতালের চাকরবাকরদের মতো, যারা ডাক্তার এবং রোগী -- সকলকেই সমান পাগল বলে ভাবতে অভ্যস্ত। বাস্তব জীবনের অতি বিচিত্র নানা ঘটনাকে তারা যে এমন নিরাবেগ, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে পারে এই উদাসীনতাই তার কারণ।

কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া যাক:

'গতকাল হ্যান্স মুলার নামে এক ব্যক্তি বাজি রেখে এগারো মিনিটে ৭২টি সসেজ খায়।'

'১৯২৮ সালে প্রুশিয়ায় ৯৫৩০ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে -- তাদের মধ্যে ৬৬৯০ জন পুরুষ, ২৮৪০ জন স্ত্রীলোক। আত্মহত্যার ৬৪১৩টি ঘটনা ঘটে শহরে, ৩১১৭টি -- গ্রামে।'

'সিলেসিয়ার লিওয়েনবার্গ শহরের মিউনিসিপ্যালিটি তার আয় বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বিড়ালের ওপর কর চাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নগর প্রশাসনদপ্তর উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মিউনিসিপ্যালিটি অন্য এক পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: শহরের পার্কের ভেতরকার ছায়াপথগুলির নানা জায়গায় ফাঁদ পেতে রাখা হয় ছাড়া বেড়াল ঘোরাফেরা করতে গিয়ে ফাঁদে পড়ে। ধৃত জন্তু পর দিন তিন মার্ক মুক্তিপণের বিনিময়ে তার প্রভুকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'

'হামবুর্গের অদূরবর্তী নিন্‌ডর্ফ পল্লীতে আদালতের পেয়াদারা সেচ সমিতির বকেয়া চাঁদার দরুন সম্পত্তি ক্রোক করতে এলে কৃষকদের কাছ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সশস্ত্র কৃষকদের ভয়ে আমলারা সরে যেতে বাধ্য হয়।'

'বার্লিনের উপকণ্ঠে এক 'নিশাচর ভূতের' আবির্ভাব ঘটেছে। সে নিয়মিত ভাবে স্থানীয় যাজকের কাছে আসে। ভূত ইতিমধ্যে তার 'ইতর স্পর্শে' তিন তিনবার যাজকমশাইয়ের ঘুম ভাঙিয়েছে। পুলিশ ডাক পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে যাজকের বাড়ির জানলার নীচে একটা টুপি পায় — ওটা সম্ভবত 'ভূতেরই' হারানো টুপি।'

'বব্ ছাঁটা মহিলাদের কি প্রার্থনাসভায় প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত? বেশ কয়েকজন বিশপ এই প্রশ্নটি তোলার পর ২৪ মে তারিখে ভ্যাটিকানে তা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয়। কার্ডিনালদের কলেজ প্রশ্নটির সম্মতিসূচক উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, বব্ চুল খ্রীষ্টীয় নীতিজ্ঞানের বিরোধী নয়।'

গত বছর খবরের কাগজেরই কে একজন লোক যেন জানান যে পুলিশী তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে ফ্রান্সে বছরে প্রায় চার হাজার স্ত্রীলোক অন্তর্ধান করে। সম্প্রতি ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে 'নারী ব্যবসায়ীদের' একটা দলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলির পতিতালয়ে ২৫০০ জন তরুণীকে বিক্রি করে। 'নারী ব্যবসায়ীদের' এরকম আরও একটি সংস্থা পোল্যাণ্ডে কাজ করত। আ. লোন্দ্র্ নামে জনৈক ফরাসী সাংবাদিক দাসব্যবসায়ের এই বিভাগটি নিয়ে ভালোমতো চর্চা করেছেন। তার 'অপরাধজনক ব্যবসা' বইটি গত বছর 'ফেডারেশন পাবলিশিং হাউস' কর্তৃক আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক - তরুণী মেয়েদের প্রতারণা করা ও তাদের অপহরণ করার নানা কৌশল এবং আর্জেণ্টিনার পতিতালয়গুলিতে তাদের কাজের বিশদ বর্ণনা এতে আছে; কিন্তু এই বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষামূলক যে দিকটা তা এই যে ঘৃণা উদ্রেক করার মতো একটি শব্দও এখানে নেই।

বইয়ের দশের পৃষ্ঠাতে লোন্দ্র্ এই রকম একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

'আর্মান - একজন নারী ব্যবসায়ী দালাল।... সে কী নিয়ে কারবার করে আমি জানি, আমি যে কী কাজ করি সে তা জানে। সে আমাকে বিশ্বাস করে, আমিও তাকে বিশ্বাস করি। কাজের লোকদের মধ্যে যেমন সম্পর্ক হয়ে থাকে।'

বাস্তবিকই, কাজের লোকদের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে, যদিও কাজটা হল মনুষ্যত্বহীন ও ইতর।

কিন্তু এখানে লোন্দ্র্-এর মানসিকতা বুঝিয়ে বলার জন্য জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের কথার হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

'পুলিশ যখন কোন লোককে আদালতে বা জেলখানায় নিয়ে যায় তখন লোকটা দোষী না নির্দোষ সে কথা ভাবা পুলিশের কাজ নয়। আমিও সমাজের আদালতের সামনে সেই রকমই লোকজনকে এনে দাঁড় করিয়ে দিই — আগেকার ঘটনা এবং পরেই বা কী ঘটতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কাজ নয়।'

১৯০৬ সালে একদল সাধুপ্রকৃতির মার্কিনী যখন নূ্য ইয়র্কে একটা ছোটখাটো কলহদৃশ্যের অবতারণা করে কথাটা তখনই আমি শুনতে পাই। দুটো হোটেল থেকে আমাকে বার করে দেওয়া হয়েছে। আমি তাই এরপর

কী ঘটে দেখার জন্য তল্পিতল্পা নিয়ে রাস্তায় এসে আশ্রয় নিলাম। জনা পনেরো রিপোর্টারের একটা দল আমাকে ছেঁকে ধরল। তাদের নিজস্ব মার্কিনী ধরনে দেখতে গেলে তারা ছিল চমৎকার লোক, তারা আমার প্রতি 'সমবেদনা' প্রকাশ করল, এমনকি মনে হল এই বিশ্রী ঘটনায় তারা যেন কিছুটা বিক্ষুব্ধও। তাদের মধ্যে বিশেষ করে একজন ছিল সুশ্রী চেহারার — বিশাল গড়নের এক ছোকরা, কাঠের মতো মুখের ভাব, দুটো পুতির মতো নীল রঙের গোল গোল একজোড়া মজার চোখ অসাধারণ জ্বলজ্বল করছে। সে ছিল একজন বিখ্যাত ব্যক্তি - সে তার খবরের কাগজের ফরমাস অনুযায়ী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যানিলার জেলখানা থেকে এক জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী তরুণীকে উদ্ধার করে আনে। স্পেনীয়দের হাতে বন্দী এই তরুণীটির মাথার ওপর মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝুলছিল। যা হোক, এই ছোকরা আন্দাজ করল যে হোটেল সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীটা যাতে আরও বেশ কিছু দূর গড়ায় তার জন্য আমার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। 'ওয়াকিং ডেলিগেট' উপন্যাসের লেখক, তরুণ সাহিত্যিক লেরোয় স্কট এবং 'ফাইভ ক্লাব'-এ তার আর যাঁরা বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের সকলকে সে এই কাজে 'সাহায্য করতে' বলল। পরে দেখা গেল কাজে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা তাঁদের নেই, তবে লাভের মধ্যে লাভ হল এই যে আমাকে ওঁরা রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন ওঁদের 'ক্লাবে', অর্থাৎ একটা ফ্ল্যাটে, যেখানে পাঁচজন উঠতি লেখক 'কমিউন' করে থাকেন আর ঘরসংসার দেখাশোনা করেন স্কটের স্ত্রী জনৈক রুশ ইহুদী। সন্ধ্যায় 'ক্লাবের' প্রশস্ত প্রবেশ-কক্ষে ফায়ার প্লেসের সামনে তরুণ লেখকেরা এসে সমবেত হত, রিপোর্টাররাও আসত। আমি তাদের রুশ সাহিত্য ও রুশ বিপ্লব এবং মস্কো অভ্যুত্থানের বিবরণ দিতাম (বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটিভুক্ত জঙ্গী সংগঠনের সদস্য ন. ইয়ে. বুরেনিন, স্কটের স্ত্রী এবং ম. ফ. আন্দ্রেয়েভা আমার কথাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতেন)। খবরের কাগজের লোকেরা আমার বক্তব্য শোনে, নোট করে, শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্পষ্টাস্পষ্টি আক্ষেপ করে বলে:

'দারুণ ইন্টারেস্টিং বটে, কিন্তু আমাদের কাগজে চলবে না।'

আমি জানতে চাইলাম, যে-ঘটনা খুব সম্ভব নবযুগের ভবিষ্যতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সূচনা করতে চলেছে সে সম্পর্কে সত্যি কথা পাঠকদের অবহিত করার বাধাটা তাদের কাগজের কোথায় থাকতে পারে।

কিন্তু আমার প্রশ্নটাকে তারা এমন সরল ভাবে নিল যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তারা আমাকে বলল:

'আমরা সকলে আপনার পক্ষে, কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নেই। এখানে বিপ্লবের জন্য কোন টাকা পাবেন না উপার্জনও করতে পারবেন না। এখানে যখন পত্রপত্রিকায় সংবাদ বেরোয় যে রুজভেল্ট*) আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, তখন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন -- ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আপনার খেল খতম! আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পত্রিকায় যে ছবি ছাপা হয়েছে সেটা আন্দ্রেয়েভার নয়, আমরা জানি যে আপনার প্রথমা স্ত্রী আর সন্তানদের কোন আর্থিক অনটন নেই, কিন্তু এর স্বরূপ প্রকাশ করা আমাদের সাধ্য নয়। এখানে কেউ আপনাকে বিপ্লবের জন্য কাজ করতে দেবে না।'

কিন্তু ব্রেশ্‌কোভ্‌স্কায়াকে দিচ্ছে কেন?*)

এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু তারা চুপ করে রইল। কিন্তু তারা ভুল বলেছিল কাজ আমি করতে পেরেছিলাম, শুধু যতটা করতে পারব বলে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে কম। (অবশ্য এই প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই)।

অতঃপর যে-সমস্ত আলোচনা হয় তাতে সাংবাদিকরা আমাকে নু্য ইয়র্কের প্রেসের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। সেই ক্ষমতার প্রমাণ ছিল এই রকম: কোন এক খবরের কাগজ কোন ধনী ও প্রভাবশালিনী লোকহিতৈষিণীর নামে এই মর্মে অভিযোগ আনে যে মহিলা বেশ কতকগুলি পতিতালয় চালান - দারুণ চাঞ্চল্যকর সংবাদ এটা! কিন্তু দু'দিন পরে ঐ একই খবরের কাগজ ২৫ জন পুলিশের লোকের ছবি কাগজের পৃষ্ঠায় ছেপে জানাল যে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া, মাননীয়া ভদ্রমহিলাটি ত নয়ই, বরং ঐ পুলিশের লোকেরাই গোপন বেশ্যাবৃত্তির সংগঠক।

'কিন্তু পুলিশের লোকদের কী হল?'

'কী আবার হবে? - তাদের বেশ ভালোমতো ক্ষতিপূরণ দিয়ে ছাঁটাই করে দেওয়া হল। তারা অন্য স্টেটে গিয়ে কাজ পেয়ে যাবে।'

আরও একটি ঘটনা: একজন সেনেটরকে লোকের চোখে হেয় করা দরকার। খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল যে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর তেমন বনিবনা নেই, তাঁর ছেলেমেয়েরা — যারা কলেজের ছাত্রছাত্রী — সৎমার বিরুদ্ধে অস্ত্র বাগিয়েই আছে। বৃদ্ধ ও তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতিবাদ কাগজে ছাপা হয় বটে, কিন্তু কাগজ এ নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। রিপোর্টাররা তাঁর বাসস্থান ঘিরে ফেলে।

১৯৩০

আমেরিকার নিগ্রো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী সন্ত্রাস*[)]

পুঁজিপতিরা ও তাদের বশংবদ ভৃত্যরা — সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও ফাশিস্তরা, চার্চিল ও কাউট্স্কিরা, সামাজিক বিপর্যয়ের ভয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট বৃদ্ধেরা, বড় বড় পরগাছা হওয়ার জন্য আগ্রহী সুচতুর যুবজনেরা, 'কলমবাজ ঠক আর প্রেসের বাটপারের' দল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবদান — রাজ্যের যত দুপেয়ে গলিত পদার্থ, মনুষ্যদেহধারী যত সব হিংস্র সরীসৃপ, যারা না থাকলে পুঁজিবাদ টিকতে পারত না — তারা সকলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে থাকে যে বলশেভিকরা 'সংস্কৃতি ধ্বংস করতে' চাইছে। বুর্জোয়া প্রেসের মালিকেরা তাদের প্রেসের কাছে স্লোগান রেখেছে: 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থ সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম!'

বলাই বাহুল্য, যার জন্য সংগ্রাম করা যেতে পারে এমন বস্তু পুঁজিবাদীদের আছে বৈ কি! সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী জনসাধারণের ওপর, শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের হয়ে ছোটখাটো মামুলি কাজ ক'রে যারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সেই পেটি বুর্জোয়াদের ওপর সংখ্যালঘু পরগাছাদের অপরিসীম ও একচ্ছত্র ক্ষমতার পক্ষে নানা রকম যুক্তি ও কৈফিয়ত প্রদর্শনের জন্য যে-সমস্ত সংস্থা সম্পূর্ণ অবাধে কাজ ক'রে চলেছে — সেগুলিই হল তাদের 'সংস্কৃতি'। তাদের সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা হল স্কুল — যেখানে মিথ্যে কথা বলা হয়, গির্জে — যেখানে মিথ্যে কথা বলা হয়, পার্লামেন্ট — যেখানে ঐ একই ব্যাপার, প্রেস — যেখানে মিথ্যে আর কুৎসা রটনা করা হয়; তাদের সংস্কৃতি — পুলিশ, যে পুলিশকে শ্রমিকদের ওপর মারধোর করার, শ্রমিকদের খুন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাদের সংস্কৃতি বৃদ্ধি পেতে পেতে উঠে গেছে এক অবিশ্বাস্য শীর্ষদেশে — যারা চায় না যে তাদের ওপর লুঠতরাজ চলুক, চায় না ভিখারী হয়ে থাকতে, যারা চায় না অকালে স্বাস্থ্য হারিয়ে তাদের স্ত্রীরা তিরিশেই বুড়িয়ে যাক, তাদের শিশুরা অন্নাভাবে মারা যাক, তাদের মেয়েরা অন্নসংস্থানের জন্য পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করুক, যারা চায় না শ্রমজীবী জনসাধারণের সৎ পরিবেশের মধ্যে বেকারত্বের ফলে অপরাধ ছড়াতে থাকুক — তাদের বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রত্যহ, অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পর্যায়ে সেই সংস্কৃতির বৃদ্ধি ঘটেছে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক জীবনে বস্তুতপক্ষে যা প্রাধান্য লাভ করে, যা মুখ্য, তা হল রাস্তায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্ঘর্ষ, ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা, বেকারত্বের ফলে ছোটখাটো চুরিচামারির ঘটনাবৃদ্ধি, পতিতাবৃত্তির বিস্তার। এগুলো অতিশয়োক্তি নয় -- সমস্ত বুর্জোয়া কাগজের বিবরণীতে এই ধরনের ঘটনার ঝুড়ি-ঝুড়ি সাক্ষাৎ মিলবে। 'সংস্কৃতিবান' পুঁজিবাদী দুনিয়া শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, এই যুদ্ধ উত্তরোত্তর আরও বেশি রক্তক্ষয়ী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের লুঠতরাজ করার এবং সেই অপরাধের শাস্তি এড়িয়ে যাবার অধিকার লাভের জন্য যুদ্ধ সংক্ষেপে এই হল সোভিয়েত দেশের বাইরে সমস্ত দুনিয়ার আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনের মূলকথা। ক্ষুধাপীড়িত ও দরিদ্র মানুষদের বিরুদ্ধে অন্নতৃপ্ত ও ধনী মানুষদের যুদ্ধ এত দূর গড়ায় যে বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে উঠে পড়ে লাগতে দেখে তাকে দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে তার সবচেয়ে সক্রিয় লোকজনকে সেখান থেকে ছিনিয়ে বার করে আনা হয়, তাদের জেলে পোরা হয় অথবা খুন করা হয়। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তারা শ্রমিক জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করে - যেমন ঘটেছিল সাক্কো-ভাঞ্জেত্তি হত্যার বেলায়।

দুই ইতালীয় শ্রমিক তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পরও কবে তাদের ইলেকট্রিক চেয়ারে পুড়িয়ে মারা হবে তার জন্য সাত বছর অপেক্ষা করে থাকে। বিনা দোষে অপরাধী সাব্যস্ত দু'জন মানুষকে হত্যা করার বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের মানবতাবাদীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল; কিন্তু তাদের ঐ প্রতিবাদ মার্কিন কোটিপতিদের কঠিন অনড় মুখে বিন্দুমাত্র রেখাপাত মাত্র করতে পারে নি। বর্তমানে, এই মুহূর্তে আমেরিকার স্কট্‌সবোরো শহরে ঐ রকম আরও একটি নাটক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। স্কট্‌সবোরোতে আটজন নিগ্রো কিশোরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। তারাও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাদের পরস্পরের মধ্যে চেনাশোনা নেই, দৈবাৎ পুলিশ তাদের ধরেছে। কিন্তু তাহলে কী হবে, বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে নিগ্রোদের ভয় দেখানোর জন্য; এই হত্যাকাণ্ড --- 'নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা'। এর কারণ, নিগ্রো জনসাধারণ উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, শ্বেতকায় মেহনতী জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামে তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। তিন কোটি নিগ্রো জনসাধারণের মধ্যে — শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে— এই ভয়ে তাদের লড়াইয়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছে না বুর্জোয়ারা। এর জন্য যে অস্ত্র তারা প্রয়োগ করছে তা হল শ্বেত সন্ত্রাস।

আলাবামার ক্যাম্প হিল্-এ যে নৃশংস ঘটনা ঘটে গেল তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই মামলার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো শ্রমজীবীদের পক্ষে এবং তাদের ওপর নিগ্রহের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রচারাভিযানের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে।

এ বছর আলাবামার টেলাপুসা কাউন্টিতে নিগ্রো ভাগচাষীরা তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছে। জঙ্গী ধরনের এই সংগঠনটি স্কট্সবোরো প্রচারাভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। দু'সপ্তাহ আগে স্কট্সবোরো মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য উক্ত সংগঠন কোন এক গির্জায় তার সদস্যদের একটি সভা আহ্বান করে। জমিদারেরা ৪০০ পুলিশ ও সশস্ত্র ফাশিস্তদের সমাবেশ ঘটায় — তারা এসে গির্জার ওপর হামলা করে। হামলার সময় সংগঠনের নেতা র‍্যাল্ফ গ্রে গুরুতর আহত হন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বাড়িতে বয়ে নিযে যায়। ফাশিস্ত গুণ্ডাদল যখন জানতে পারল যে র‍্যাল্ফ এখনও জীবিত, তখন তারা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে, তারপর জোর করে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে, ডাক্তার যখন তাঁর আঘাত পরীক্ষা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর বিছানাতেই তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলে। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত লোকদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে ফাশিস্তরা নিগ্রোদের বহু কুটির তছনছ করে ফেলে। চারজন নিগ্রোকে ধরে বনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে লিঞ্চ করা হয়। ৫৫ জন নিগ্রোকে 'হত্যার' অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ জন ভারপ্রাপ্ত কর্মীর বিরুদ্ধে প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। ফাশিস্ত গুণ্ডাদের দলপতি শেরিফ ইয়াং গুরুতর আহত হয়।

হার্লান কাউন্টির (কেণ্টুকি) জেলখানার কথাই ধরা যাক না। ইস্ট কেণ্টুকির কয়লাখনি অঞ্চলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এর অবস্থান। এই এলাকাটি এক দিকে যেমন দেশের বড় বড় কর্পরেশনের ঐশ্বর্যের উৎস, তেমনি খনিমজুরদের, তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানসন্ততিদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর কারণও বটে। প্রায় ১০০ জন খনিমজুরকে এই জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে পোরা হয়েছে। তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আছে, তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝুলছে। অনেকের বিরুদ্ধে 'গুণ্ডাদলে লিপ্ত থাকার'

অভিযোগ আনা হয়েছে, কারও কারও ওপর সভায় ভাষণ দিয়েছিল বলে 'অপরাধজনক সিণ্ডিকালিজমের' দোষ আরোপ করা হয়েছে। খনিমজুরেরা তাদের দারিদ্র অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তিন মাস আগে ধর্মঘট করে। গভর্ণর স্যাম্প্সন তাদের বিরুদ্ধে পুলিশদল নামিয়ে দেন, খনির মালিকেরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা প্রয়োগ ক'রে ধর্মঘট দমনের ভার দিয়ে সশস্ত্র ফাশিস্ত, শেরিফ আর পুলিশদের গুণ্ডাবাহিনী ধর্মঘটীদের ওপর লেলিয়ে দেয়। ফলে ৩১ জন লোক নিহত হয়: নিহতদের মধ্যে ১৮ জন খনিমজুর, ১৩ জন সৈন্য ও ফাশিস্ত গুণ্ডা। খনিমজুরেরা ছয়টা কামান ও গোলাবারুদ হস্তগত করে, তারা কোম্পানির খাবারের দোকান ভেঙে তাদের অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের জন্য খাবারদাবার দখল করে।

১৮ জন খনিমজুরের ওপর মৃত্যুদণ্ডের এবং ৫০ জনের ওপর কঠোর কারাদণ্ডের খাঁড়া ঝুলছে। খনিমজুরদের ১৬টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খনিমজুরদের পরিবারের লোকজনকে এখনও তাদের বাড়িঘর থেকে তাড়ানো হচ্ছে।

পেন্সিলভানিয়ায়, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও ওহাইওতে যে ৪০,০০০ খনিমজুরের ধর্মঘট চলছে, তাদের অধিকাংশই নিগ্রো। ৬ জুলাইয়ে যে ৬০০ খনিমজুরকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদেরও অধিকাংশ নিগ্রো। গ্রেপ্তারের সময় তাদের ওপর মারধোর ও নির্যাতন করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিপ্লব-সহায়তা সমিতির মার্কিন শাখা স্কট্সবোরো মামলাকে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করেছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো জনসাধারণের ওপর শাসকশ্রেণীর নির্মম শোষণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোকিত হয়ে ধিক্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বিপ্লব-সহায়তা সমিতির মার্কিন শাখা ৯০ দিনের জন্য দণ্ডের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার যে দাবি জানিয়েছে তা বিশ্বের সর্বত্র বিপুল সমর্থন অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং আরও বহু দেশ থেকে স্কট্সবোরোর আটজন নিগ্রো ছেলের মুক্তির দাবি করে হাজার হাজার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। জার্মানি ও কিউবায় অবস্থিত মার্কিন দূতস্থান হাজার হাজার বিক্ষোভকারী শ্রমিক অবরোধ করে রাখে।

স্কট্সবোরোর আটজন নিগ্রো বালক এখনও কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের চোখের সামনে ইলেকট্রিক চেয়ার। আর কারারক্ষী প্রতি দিন তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে অচিরে তাদের ওতে বসিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে।

'বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযানকে অবশ্যই জোরদার করে তুলতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে শ্বেত সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক বিপ্লব-সহায়তা সমিতির কাগজের একটি সংখ্যাও, একটি প্রচারপত্রও যেন তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের আহ্বান ছাড়া প্রকাশিত না হয়, কোন মিটিং, কোন বিক্ষোভ মিছিলই যেন ঐ বক্তব্য বাদ দিয়ে অনুষ্ঠিত না হয়।' (আন্তর্জাতিক বিপ্লব-সহায়তা সমিতির সকল শাখা ও সংগঠনগুলির প্রতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন থেকে)।

সব দেশের প্রলেতারিয়েতরা যখন তাদের ভ্রাতাদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তার মানে অবশ্যই এই নয় যে হত্যা থেকে পুঁজিবাদীদের বলে কয়ে বিরত করতে পারবে -- এমন বিশ্বাস তাদের আছে। কোন পুঁজিবাদী 'মানবিক' হতে পারে না, মানুষের ভেতরে যে পশুত্ব আছে এ ছাড়া মানবিক সমস্ত কিছু তার অপরিচিত। শ্রমিকদের কাছ থেকে ডলার নিঙড়ে তা যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসর্গ করে তা হলে বুঝতে হবে এ কাজ সে করছে নিজের ক্ষমতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটানোর উদ্দেশ্যে। তার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা শেখানো হয় না, আর কেউ যদি ছাত্রদের কাছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করে তাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হল এই সব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, কিন্তু তার একান্ত জানা উচিত যে যারা খুনে তারা খুন না করে পারে না, আর তারা প্রলেতারিয়েতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরই খুন করবে। পুঁজিপতি তার নিজের ডলারের স্বার্থ দেখে, তার কাছে সব সময় মানুষের চেয়ে ডলারের দাম বেশি তা সে মানুষ যে-ই হোক না কেন। প্রলেতারিয়েতের জানা উচিত যে রোজা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবখ্‌নেখ্‌টকে সৈন্যরা খুন করে নি, তাঁদের খুন করেছে পুঁজিবাদীরা, লেনিনকে কোন অর্ধোন্মাদ স্ত্রীলোক গুলি করে নি — গুলি করেছিল একটা নির্দিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির যান্ত্রিক হাতিয়ার - নীচ প্রকৃতির, অমানবিক, কূপমণ্ডূক চিন্তার হাতিয়ার।

প্রলেতারিয়েতের জানা উচিত যে তার আর পুঁজিবাদীর মধ্যে কোন রকম বোঝাপড়া -- 'আপস' বা যুদ্ধবিরতি চলতে পারে না। এটা জানার সময় এসেছে। ভালো করে মনে রাখা দরকার যে ১৯১৪ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রলেতারিয়েতদের

পুঁজিবাদীদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল, ৩ কোটি জীবনের বিনিময়ে এর মূল্য শোধ করতে হয় শ্রমিকদের। ভুলে গেলে চলবে না সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদেরই আরও একজনকে -- 'রক্তপিপাসু কুকুর' নোস্‌কে'কে। মোট কথা, শ্রমিক শ্রেণীর নানা ধরনের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক ও বদমায়েসরা তার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত অপরাধ করেছে সেগুলো ভুলে গেলে চলবে না। অতীতের রক্তাপ্লুত কদর্যতার যাতে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য এর কোনটাই ভুলে গেলে চলবে না। এসব মনে রাখা কঠিন কিছু নয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যালিস্টদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের ওপর এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ইউরোপের পুঁজিবাদীরা যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করছে সেগুলোর ওপর ভালো করে নজর রাখলেই যথেষ্ট।

ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের বোঝা উচিত যে তারা যখন কোন সামরিক উপকরণ তৈরির কারখানায় কাজ করছে তার মানেই হল তারা নিজেদের প্রাণনাশের জন্য রাইফেল, মেশিনগান ও কামান বানাচ্ছে। ব্যক্তিগত ভাবে পুঁজিপতিরা নিজেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে না। তারা যদি যুদ্ধ করবে বলে ঠিক করে থাকে তাহলে যে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক তাদের নিজেদের দেশে পুঁজিবাদ ধ্বংস করেছে তাদের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের শ্রমিক ও কৃষকদের লড়াইয়ের ময়দানে মরার জন্য ঠেলে পাঠাবে। পুঁজিবাদী যুদ্ধ মানেই শ্রমিক শ্রেণীর আত্মহত্যা।

পুঁজিপতিরা যখন একেকজন শ্রমিককে হত্যা করে তখন প্রতিটি খুনের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদ করা উচিত; প্রতিবাদ করা উচিত এই কারণে যে এর ফলে তার ভেতরে আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংহতি বোধ লালিত হয় -- এই বোধ গভীর ও বিকশিত হয়ে ওঠা ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বড় বেশি দরকার। কিন্তু বিশ্বব্যাপী আরও একটি শ্রমিক ও কৃষক নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য পুঁজিপতিদের যে-কোন চেষ্টার বিরুদ্ধে তাকে অবশ্যই হতে হবে আরও বেশি সংহত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রতিবাদমুখর।

এই ধরনের নিধনযজ্ঞ নিবারণ করার সবচেয়ে যথার্থ এবং বস্তুত অনেকটা সহজসাধ্য উপায় হল সোশ্যালিস্ট শ্রমিকদের দলে দলে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া। তৃতীয় আন্তর্জাতিকই শ্রমিকদের প্রকৃত নেতা, যেহেতু তা হল শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক। এই আন্তর্জাতিক তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই আন্তর্জাতিক অপরিহার্য বলে স্বীকার করে

কেবল একটি যুদ্ধ — বিশ্বসুদ্ধ পুঁজিপতি দলের বিরুদ্ধে যারা অন্যের শ্রমে জীবন ধারণ করে তাদের সকলের বিরুদ্ধে সকল দেশের প্রলেতারিয়েতের যুদ্ধ।

১৯৩১

আপনারা যাঁরা 'সংস্কৃতির কারিগর', তাঁরা কাদের দলে আছেন?

(মার্কিন সংবাদদাতাদের প্রশ্নের উত্তরে)*)

আপনারা লিখেছেন: 'আপনি হয়ত সমুদ্রের আরেক পার থেকে আপনার অপরিচিত লোকদের লেখা বার্তা পেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছেন।'

না, আপনাদের চিঠি পেয়ে আমি অবাক হই নি। এরকম চিঠি আমি প্রায়ই পেয়ে থাকি। আর আপনারা যে আপনাদের এই বার্তাটিকে 'মৌলিক' আখ্যা দিয়েছেন, সেখানেও আপনারা ভুল করছেন — গত দু-তিন বছর হল বুদ্ধিজীবীদের শঙ্কাকুল আর্তস্বর অভ্যস্ত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা স্বাভাবিক: বুদ্ধিজীবীদের কাজ চিরকালই, প্রধানত হয়েছে বুর্জোয়াদের অস্তিত্বকে অলঙ্কৃত করা, ধনীদের, তাদের জীবনের হীন প্রকৃতির দুঃখে সান্ত্বনাদান। পুঁজিবাদীদের পরিচর্যাকারিণী ধাত্রী - বুদ্ধিজীবীরা - তাদের বেশির ভাগই যে কাজ করেছে তা হল বুর্জোয়াদের বহুকালের জীর্ণ ও মলিন, শ্রমজীবী জনগণের প্রচুর রক্তে মাখামাখি দর্শন ও ধর্মের পোশাক প্রবল উৎসাহভরে সাদা সুতোয় রিফু করা। কাজটা কঠিন হলে কী হবে, খুব একটা প্রশংসনীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ নিষ্ফলই বলতে হয়; অথচ আজও, বলতে গেলে দিব্যদৃষ্টিতে ঘটনার পূর্বাভাস লক্ষ করা সত্ত্বেও তারা সেই কাজের ধারা অব্যাহত রাখছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা যখন চীন ভাগ-বাঁটোয়ারার কাজে নামে, তার অনেক আগেই জার্মান দার্শনিক স্পেংলার তার 'মানুষ ও যন্ত্রবিজ্ঞান' বইয়ে বলে গেছেন যে নিজেদের জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাগ 'অশ্বেতকায় জাতিদের' দিয়ে ইউরোপীয়রা ঊনবিংশ শতাব্দীতে মস্ত ভুল করেছে। স্পেংলারকে এ ব্যাপারে সমর্থন করছেন আপনাদের মার্কিন ঐতিহাসিক হেণ্ড্রিক ভ্যান লোন। তিনিও মনে করেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা দিয়ে কৃষ্ণকায় ও

পীতবর্ণের জাতিকে সজ্জিত করা ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের 'সাতটি মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুলের' একটি।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভুল তারা শোধরাতে চায়। ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদীরা জাপানী ও চীনাদের টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে পরস্পরকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করছে, আবার সেই সঙ্গে সুযোগ বুঝে একেবারে মোক্ষম মুহূর্তটিতে যাতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে নিজেদের বজ্রমুষ্টি দেখিয়ে সাহসী খরগোসের সঙ্গে মিলে নিহত ভালুকের ছালচামড়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করার কাজে নামা যায়, সেই উদ্দেশ্যে প্রাচ্যে তাদের রণতরীও পাঠাচ্ছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মত এই যে ভালুকটাকে মারা সম্ভব হবে না। তার কারণ স্পেংলার ও ভ্যান লোন এবং তাঁদের মতো আরও যাঁরা বুর্জোয়াদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইউরোপ-আমেরিকার 'সংস্কৃতির' আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভূরি ভূরি তর্কবিচার করলে কী হবে, দু-একটা কথা উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে যান। তাঁরা ভুলে যান যে ভারতীয়, চীনা, জাপানী বা নিগ্রো - যে-ই হোক না কেন, তারা কেউই সামাজিক ভাবে অখণ্ড, একক শ্রেণী নয় বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁরা ভুলে যান যে ইউরোপ ও আমেরিকার কূপমণ্ডূকদের স্বার্থান্ধ বিষের প্রতিষেধক রূপে উদ্ভাবিত হয়েছে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা — সে শিক্ষা বিষবাষ্প দূর করে সুস্থ অবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। প্রসঙ্গত, তাঁরা সম্ভবত কথাটা সত্যি সত্যিই ভুলে যান না - আসলে কৌশলের খাতিরে চুপ করে থাকেন মাত্র; আর ইউরোপীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হল বলে দুশ্চিন্তাবশত তাঁদের যে চিৎকার-চেঁচামেচি, এর কারণ সম্ভবত বিষপ্রতিষেধকের শক্তি, এবং সে শক্তির সামনে বিষের অক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা।

সভ্যতা ধ্বংস হতে বসেছে বলে যারা চেঁচামেচি করছে তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলছে, আরও সোচ্চার হচ্ছে তাদের চিৎকার চেঁচামেচি। মাস তিনেক আগে ফ্রান্সে ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাইয়ো সভ্যতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়েছে বলে প্রকাশ্যে বিলাপ করেছেন।

তিনি এই বলে চেঁচিয়েছেন যে জগৎ প্রাচুর্য ও অনাস্থার ট্র্যাজিডিতে ভুগছে। কোটি কোটি মানুষ যখন যথেষ্ট পরিমাণে খাবার পাচ্ছে না তখন গম পুড়িয়ে দেওয়া এবং বস্তা বস্তা কফি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া — এটা কি ট্র্যাজিডি নয়? আর অনাস্থার কথা যদি বলতে হয়, তার ফলে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, চাপানো হয়েছে শান্তি চুক্তি, সে চুক্তি তবেই সংশোধিত হতে পারে যদি এই

অনাস্থা অন্তর্ধান করে। আস্থা যদি ফিরিয়ে আনা না যায় তাহলে সমস্ত সভ্যতা বিপদের সম্মুখীন হবে, কারণ জনগণ দুঃখদুর্দশার জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ী করে থাকে, তাদের মনে তাকে উচ্ছেদ করার প্রলোভন জাগতে পারে।

আজকের দিনে যারা এত খোলাখুলি ভাবে পরস্পরকে নখদন্ত দেখাচ্ছে সেই হিংস্র জন্তুদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা যে সম্ভব এমন কথা যে বলবে, সে হয় রীতিমতো ভণ্ড, নয়ত একেবারেই সরলমতি। আর 'জনগণ' বলতে যদি বোঝায় শ্রমজীবী জনগণ, তাহলে সৎ লোক মাত্রেই স্বীকার না করে পারবেন না যে ঐশ্বর্য সৃষ্টির জন্য শ্রমের বিনিময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে দুঃখদুর্দশায় শ্রমিকদের পুরস্কৃত করে তার জন্য উক্ত ব্যবস্থার নির্বুদ্ধিতাকে তারা যদি 'দায়ী করে' সেটা হবে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। প্রলেতারীয়রা ক্রমেই আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে যে আজকের দিনের বুর্জোয়া বাস্তবতা 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্কস-এঙ্গেলস কথিত উক্তিকে যেমন নির্ভুল প্রমাণ করছে তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' বলেছেন:

'বুর্জোয়াদের প্রভুত্ব করার ক্ষমতা নেই; তার কারণ এই যে তারা তাদের দাসকে দাসত্বের মধ্যেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিশ্চিতি দিতে পারে না, তার কারণ এই যে তারা তাকে এমন এক অবস্থার মধ্যে এনে ফেলতে বাধ্য হয় যেখানে তারা নিজেরা ত তার ঘাড়ে বসে খেতেই পারে না, বরং উলটে সে-ই তাদের অন্ন যোগায়। সমাজ আর বুর্জোয়াদের শাসনাধীন থাকতে পারে না; অন্য ভাবে বলতে গেলে, বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।'

কাইয়ো সেই শত শত বুড়ো মানুষদের একজন, যারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যে তাদের বুর্জোয়া নির্বুদ্ধিতা হল মানুষের ওপর চিরকালের জন্য বর্ষিত এক আশীর্বাদ, এক প্রাজ্ঞতা এবং এর চেয়ে ভালো আর কিছু মানবজাতি আর কোন কালে উদ্ভাবন করতে পারবে না, এর চেয়ে দূরে কখনও যেতে পারবে না, এর ওপরে কখনও উঠতে পারবে না। খুব একটা বেশি দিন আগেকার কথা নয় — বুর্জোয়াদের সান্ত্বনাদানকারীরা তাদের নিজেদের বিজ্ঞান অবলম্বনে অর্থনীতি বিষয়ে তাদের প্রাজ্ঞতা এবং ভিত্তির দৃঢ়তা প্রমাণ করেছে।

এখন তারা বিজ্ঞানকে তাদের ইতর ধরনের খেলা থেকে বাদ দিচ্ছে। ২৩ ফেব্রুয়ারী ঐ কাইয়োই, প্যারিসে, ভূতপূর্ব মন্ত্রীদের সামনে, পল মিলিউকভ

প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মতো, মোটের ওপর, যারা ভূতপূর্ব লোকজন, তাদের সামনে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্পেংলারকে অনুসরণ করে বলেছেন:

'যন্ত্রবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে বেকারসমস্যা সৃষ্টি করে ছাঁটাই করা শ্রমিকদের মজুরীকে অংশীদারদের বাড়তি লভ্যাংশে পরিণত করে। যে-বিজ্ঞান 'বিবেকশূন্য', 'বিবেকের' তাপ যাতে সঞ্চারিত হয় নি, সেই বিজ্ঞান মানুষের ক্ষতিসাধন করে। মানুষের উচিত বিজ্ঞানের রাশ টানা। আধুনিক কালের সংকট হল মানুষের বুদ্ধিবিবেচনার পরাজয়। কখন কখন বিজ্ঞানের পক্ষে মহামানুষের চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। তিনি এমন কতকগুলি তাত্ত্বিক বিষয় তুলে ধরেন যেগুলির সেই নির্দিষ্ট সময়ে, যখন তাদের প্রকটিত করে তোলা হয়েছে, সেই সময়ে তাৎপর্য ও অর্থ আছে -- যেমন ধরুন, কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রে। ১৮৪৮ কিংবা ১৮৭০-এর বেলায় সেগুলি ঠিক, কিন্তু ১৯৩২-এর বেলায় আদৌ নয়। মার্কস যদি এখন জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি অন্যরকম লিখতেন।'

এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা স্বীকার করছে যে তাদের শ্রেণীর বুদ্ধিবিবেচনা দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, তার কোন শক্তি নেই। বিজ্ঞানের 'রাশ টানার' পরামর্শ তিনি দিয়েছেন, কিন্তু এই বিজ্ঞান তার শ্রেণীকে মেহনতীদের জগতের ওপর তার শাসনক্ষমতা মজবুত করে তোলার জন্য কত শক্তি দিয়েছে তা তিনি ভুলে যাচ্ছেন। 'বিজ্ঞানের রাশ টানা' -- একথার অর্থ কী? তার স্বাধীন গবেষণার পথ বন্ধ করে দেওয়া? কোন এক সময় বিজ্ঞানের স্বাধীনতার ওপর গির্জার হামলার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী লড়াই করেছিল -- লড়াইয়ে প্রচণ্ড সাহস আর সাফল্যেরও পরিচয় দিয়েছিল। একালে বুর্জোয়া দর্শন ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, যেমন ছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বে — হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধর্মতত্ত্বের সেবিকা। বর্বরতার দিকে প্রত্যাবর্তনের আশংকা যে ইউরোপের আছে কথাটা কাইয়ো ঠিকই বলেছেন — আর এটা হল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী, যাঁর শিক্ষা সম্পর্কে কাইয়োর কোন ধারণা নেই -- হ্যাঁ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে জগতের অধীশ্বর, ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণী যত দিন যাচ্ছে ততই অজ্ঞতার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিগত ভাবে দুর্বল ও বর্বর হয়ে পড়ছে — এবং এখন তারা নিজেরাই, যেমন আপনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে — এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে।

বর্বরতার যুগে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা — আজকালকার বুর্জোয়াদের সবচেয়ে 'ফ্যাশনদুরস্ত' চিন্তা। স্পেংলার ও কাইয়ো এবং তাদের

মতো 'চিন্তাবিদদের' মুখে হাজার হাজার কূপমণ্ডুকের মানসিকতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। বিশ্বের সর্বত্র শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে বিপ্লবী সচেতনতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে -- এই ঘটনার দরুণ নিজেদের শ্রেণীর সম্ভাব্য বিনাশ আগে থাকতে উপলব্ধি করে তারা এত উদ্বিগ্ন। শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবাত্মক সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়ারা পারতপক্ষে বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সর্বাঙ্গীণ, আর অত্যন্ত সঙ্গতও বটে। যে শ্রম-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এত বড় বড় নীতিকথা বলে, এই প্রক্রিয়া মানবজাতির সেই সমগ্র শ্রম-অভিজ্ঞতার অনিবার্য যুক্তিযুক্ত বিকাশ। কিন্তু ইতিহাসও যেহেতু বিজ্ঞান, অতএব তারও 'রাশ টানা' দরকার কিংবা -- আরও সরল ভাবে — তার অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া দরকার। ইতিহাসকে ভুলে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন ফরাসী কবি ও একাডেমিশিয়ান পল ভালেরি তাঁর 'বর্তমান কালপরিক্রমা' গ্রন্থে। তিনি জাতিদের দুঃখদুর্দশার জন্য রীতিমতো গুরুত্বসহকারে ইতিহাসকেই দায়ী করেছেন, বলেছেন যে ইতিহাস অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিষ্ফল স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে, মানুষের মনের শান্তি হরণ করে। মানুষ বলতে তিনি অবশ্যই ধরে নিয়েছেন বুর্জোয়াদের। পৃথিবীতে অন্য লোকদের লক্ষ করার ক্ষমতা সম্ভবত পল ভালেরির নেই। যে ইতিহাস নিয়ে এই কিছুকাল আগেও বুর্জোয়াদের এত গর্ব ছিল, যার সম্পর্কে তারা ফলাও করে এত কথা লিখত, তার সম্পর্কে তিনি কিনা বললেন:

'আমাদের বুদ্ধির কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে যত দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ইতিহাস হল সবচেয়ে বিপজ্জনক। ইতিহাস স্বপ্নের প্ররোচনা দেয়, জাতিদের মাতাল করে দেয়, তাদের মনে অলীক স্মৃতির জাগরণ ঘটায়, তাদের রিফ্লেক্সকে বড় করে তোলে, তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়, তাদের মনের শান্তি নষ্ট করে, তাদের হামবড়াই ও আত্মপীড়ন বাতিকগ্রস্ত করে তোলে।'

সান্ত্বনাদাতার ভূমিকায়, দেখতেই পাচ্ছেন, উনি একজন বড় রকমের আমূল সংস্কারবাদী। উনি জানেন, বুর্জোয়ারা শান্তিতে থাকতে চায়, নিজেরা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য কোটি কোটি মানুষকে ধ্বংস করার অধিকার তাদের আছে বলে তারা মনে করে। তারা, বলাই বাহুল্য, অনায়াসে হাজার হাজার বই ধ্বংস করতে পারে -- কেননা দুনিয়ার আর সব জিনিসের মতো গ্রন্থাগারও তাদের হাতের মুঠোয়।

ইতিহাস তাদের শান্ত, নিশ্চিন্ত জীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে? ইতিহাস নিপাত যাক! ইতিহাসের ওপর যত বইপুথি আছে, সব বাজার থেকে উঠিয়ে নাও! স্কুলে ইতিহাস পড়ানো চলবে না! অতীত চর্চাকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, এমনকি অপরাধজনক বলে ঘোষণা করা হোক! ইতিহাসচর্চার দিকে যাদের ঝোঁক আছে তাদের অস্বাভাবিক বলে ঘোষণা ক'রে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক!

সবচেয়ে বড় কথা হল শান্তি! এটাই বুর্জোয়াদের সব সান্ত্বনাদাতাদের চিন্তার বিষয়। কিন্তু কাইয়োর কথায়, শান্তি অর্জন করতে হলে বিভিন্ন জাতির পুঁজিবাদী লুঠেরাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা থাকা দরকার, আর আস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেটা দরকার তা হল পরের বাড়ির দরজা - যেমন চীনের দরজা -- যেন ইউরোপের তাবৎ দোকানদার আর লুঠেরাদের লুঠতরাজের জন্য অবাধ উন্মুক্ত থাকে। এদিকে জাপানের দোকানদার আর লুঠেরারা তাদের কাছে ছাড়া আর সকলের কাছে পরের বাড়ির এই দরজা বন্ধ রাখতে চায়। তাদের যুক্তি হল এই যে চীন ইউরোপের চেয়ে তাদের অনেক কাছে, তাই ইংলণ্ডের 'জেণ্টলম্যানরা' যেখানে ভারতীয়দের ওপর লুঠপাট করতে অভ্যস্ত, সেখানে তাদের পক্ষে চীনের ওপর লুঠপাট করা সেই তুলনায় সুবিধাজনক। লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যে বিরোধের উদ্ভব তা বিশ্বব্যাপী নতুন এক হত্যালীলার বিপদাশঙ্কা প্রকট করে তুলছে। পরন্তু, প্যারিসের পত্রিকা 'গ্রেন্‌গুয়ার'-এর ভাষায়, 'সুস্থ ও স্বাভাবিক বাজার হিশেবে রুশ সাম্রাজ্য ইউরোপের হাতছাড়া হয়ে গেছে।' এরই মধ্যে 'গ্রেন্‌গুয়ার' দেখতে পেয়েছে 'অনিষ্টের উৎস'; তাই আরও বহু সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিশপ, লর্ড, হঠকারী ও ঠক-জোচ্চরদের সঙ্গে মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সর্ব ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলছে। তারপর ইউরোপে বেকার সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে নিজের অধিকার সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সচেতনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বড়ই কম -- এমনকি মনে হয় তার কোন স্থান পর্যন্ত নেই। কিন্তু আমি আশাবাদী নই। বুর্জোয়াদের মানবদ্বেষের কোন সীমাপরিসীমা নেই -- একথা জেনেই আমি মেনে নিতে রাজী আছি যে একটি উপায় আছে যা অবলম্বন করে বুর্জোয়ারা নিজেদের শান্ত নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার পথ পরিষ্কার করে নিতে পারে। ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে কোলনে এক

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছে বর্ণবৈষম্যবাদী আইনসভা প্রতিনিধি বার্গার। তার কথায়:

'হিটলার ক্ষমতায় আসার পর ফরাসীরা যদি জার্মান ভূখণ্ড দখল করতে যায় তাহলে আমরা সবগুলো ইহুদীকে কচুকাটা করব।'

বার্গারের এই ঘোষণার কথা জানতে পেরে প্রাশিয়া-সরকার ভবিষ্যতে তাকে প্রকাশ্যে ভাষণ দিতে নিষেধ করে দেন। নিষেধাজ্ঞা হিটলার-শিবিরে বিক্ষোভের ঝড় তোলে। একটি বর্ণবৈষম্যবাদী সংবাদপত্রে লেখা হয়: 'আইনবিরুদ্ধ কাজে নামার আহ্বানের জন্য বার্গারকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না: আমরা ক্ষমতায় আসার পর এমন আইন চালু করব, যার বলে ইহুদীদের আমরা কচুকাটা করে ছাড়ব।'

উক্ত ঘোষণাগুলিকে ঠাট্টা হিশেবে, জার্মান 'উইট্‌স' হিশেবে বিবেচনা করলে চলবে না। ইউরোপীয় বুর্জোয়ার বর্তমানে যে মানসিকতা, তাতে তার পক্ষে এমন আইন 'চালু করা' সম্পূর্ণ সম্ভব, যার বলে একে একে সব ইহুদী কেন যাদের সঙ্গে চিন্তায় তার মেলে না তাদের সকলকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে, সর্বোপরি যারা তার অমানবিক স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে না তাদের সকলের বিনাশ সাধন করা যেতে পারে।

এই 'দূষিত চক্রের' মধ্যে পড়ে সান্ত্বনাদানকারী বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে তাদের সান্ত্বনাদানের কুশলতা হারাতে থাকে, তখন উলটে তাদেরই সান্ত্বনার দরকার হয়ে পড়ে। এর জন্য তারা এমন লোকেরও শরণাপন্ন হয় যারা নীতিগত ভাবে ভিক্ষাদানের বিরোধী, যেহেতু ভিক্ষা দেওয়ার অর্থ ভিক্ষা করার অধিকার পাকাপাকি করা। 'সুমধুর অমৃতভাষণের' প্রতিভা, তাদের মূল প্রতিভা এখন আর বুর্জোয়া বাস্তবতার নোংরা মানবদ্বেষ ঢেকে রাখতে পারে না, সে শক্তি তাদের নেই। তাদের কেউ কেউ উপলব্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে যে দুনিয়ার ওপরে লুঠতরাজ করে করে যারা ক্লান্ত, নিজেদের হীন উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের উত্তরোত্তর তীব্র প্রতিরোধ লক্ষ করে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাদের আমোদপ্রমোদে মাতিয়ে রাখা ও সান্ত্বনা দান করা, মুনাফার প্রতি যাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন লোভ প্রচণ্ড খেপামির চরিত্র ও সমাজ-বিধ্বংসী আকার ধারণ করেছে, তাদের — সেই লোকগুলোকে আমোদ-প্রমোদে মাতিয়ে রাখা ও সান্ত্বনা দান করা শুধু যে নিষ্ফল তা-ই নয়, সান্ত্বনাদাতাদের নিজেদের পক্ষেই এখন বিপজ্জনকও বটে।

সন্তপ্ত ডাকাত ও খুনিদের সান্ত্বনাদান যে অপরাধজনক এটাও দেখানো যেতে পারে। কিন্তু আমি জানি যে সে যুক্তি কারও হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করবে না, যেহেতু সেটা হবে 'নীতিকথা', অর্থাৎ বাহুল্য বিধায় জীবন থেকে পরিত্যক্ত একটা কিছু। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে এই ঘটনাটির দিকে নির্দেশ করা যে বর্তমান কালের বাস্তবতার মধ্যে বুদ্ধিজীবী-সান্ত্বনাদাতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন এক 'মধ্যবর্তী', যুক্তি যার অস্তিত্ব মানে না।

বুদ্ধিজীবী-সান্ত্বনাদাতা জন্মসূত্রে বুর্জোয়া অথচ সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিচারে প্রলেতারীয়; তাই ধ্বংসই যার পরিণতি এবং পেশাদার গুন্ডা আর খুনিদের মতো যে নিজেও নিঃসন্দেহে ধ্বংস হওয়ার যোগ্য সেই শ্রেণীকে সেবা করার অপমানজনক ট্র্যাজিডি সম্পর্কে সে যেন সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এটা সে বুঝতে শুরু করেছে যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণী এখন আর তার সেবাকর্মের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে না। সে বেশ ঘন ঘন শুনতে পাচ্ছে তারই দলের লোকেরা বুর্জোয়াদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় বলে বেড়াচ্ছে যে বড় বেশি সংখ্যায় বুদ্ধিজীবী উৎপন্ন হয়ে গেছে। সে দেখতে পাচ্ছে যে বুর্জোয়ারা 'সান্ত্বনার জন্য' দার্শনিক আর চিন্তাবিদদের দ্বারস্থ না হয়ে আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে ঝুঁকে পড়ছে ভন্ড পন্ডিতদের দিকে, তাদের মুখে ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য। ইউরোপের যত পত্রপত্রিকা হস্তরেখাবিশারদ, জ্যোতিষী, কোষ্ঠীবিচারক, ফকির, দিব্যদ্রষ্টা, পরলোকতত্ত্ববিদ এবং আরও এমন সমস্ত ভন্ডদের বিজ্ঞাপনে বোঝাই যারা নিজেরাই বুর্জোয়াদের চেয়েও বেশি অজ্ঞ। ফোটোগ্রাফি আর সিনেমা চিত্রশিল্পের মৃত্যু ঘটাচ্ছে, শিল্পীরা ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচার জন্য আলু আর রুটি এবং মধ্যবিত্তদের পরিত্যক্ত পোশাক দিয়ে তাদের ছবি বদল করছে। প্যারিসের কোন একটি সংবাদপত্র এই রকম একটা ছোট্ট বৃত্তান্ত দিয়েছে:

'বার্লিনের শিল্পীদের মধ্যে অভাব-অনটন বড় প্রকট, আশার কোন আলোক চোখে পড়ে না। শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা গড়ে তোলো যায় কিনা এই নিয়ে কথা চলছে। কিন্তু যাদের কোন রোজগার নেই এবং রোজগারের কোন সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই সেই সব লোক তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের কী ব্যবস্থাই বা গড়ে তুলতে পারে? এই কারণে মহিলা শিল্পী আন্নট জ্যাকবির মৌলিক চিন্তাটি বার্লিনের শিল্পীমহলে আনন্দের সঞ্চার করেছে। তিনি পণ্যবিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। কয়লার ব্যবসায়ীরা মূর্তি আর ছবির বদলে শিল্পীদের কয়লা

যোগান দিক। সময়ের বদল হবে, পণ্যবিনিময় ব্যবস্থার ফলে লেনদেন করে কয়লার ব্যবসায়ী যা পেয়েছে তার জন্য তাকে পস্তাতে হবে না। দাঁতের ডাক্তাররা শিল্পীদের চিকিৎসা করুক। ডাক্তারখানার রোগীদের বসবার ঘরে ভালো ছবি কখনই ফেলনা জিনিস নয়। কসাই, গয়লা — সকলেই এই সুযোগে যেমন একটা ভালো কাজ সারতে পারে তেমনি কোন নগদ টাকা খরচ না করে খাঁটি শিল্পনিদর্শন অর্জন করতে পারে। আন্নট জ্যাকবির চিন্তা কাজে পরিণত করা ও বিকশিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বার্লিনে একটা বিশেষ ব্যুরো স্থাপিত হয়েছে।'

প্রসঙ্গক্রমে খবরের কাগজে কিন্তু উল্লেখ করা হয় নি যে সরাসরি পণ্যবিনিময়ের এই ব্যবস্থা প্যারিসেও প্রচলিত আছে।

সিনেমা ধীরে ধীরে থিয়েটারের মতো উঁচুদরের শিল্পকে ধ্বংস করছে। বুর্জোয়া সিনেমার দূষিত প্রভাবের কথা আর না হয় না-ই বললাম — সেটা অমনিতেই স্পষ্ট। যাবতীয় ভাবপ্রবণ বিষয়কে নিঃশেষে কাজে লাগানোর পর শুরু হয় অঙ্গবিকৃতির প্রদর্শনী।

মেট্রো গোল্‌ডউইন মেয়ার-এর হলিউড স্টুডিও 'ফ্রিক্‌স' নামে ছবিতে কাজ করার জন্য একটি মৌলিক দল গঠন করেছে। দলে আছে পক্ষী-বালিকা কু-কু — দেখতে অনেকটা সারসের মতন; কঙ্কাল মানুষ পি. রবিন্‌সন; মার্থা, যে জন্মেছে একটা হাত নিয়ে এবং দু'পায়ে লেস বুনতে পারে চমৎকার। স্টুডিওতে আরও যাদের পাওয়া গেছে তারা হল পিন-মাথা স্ত্রীলোক শিল্‌ৎজে, যার শরীরটা স্বাভাবিক, কিন্তু মাথাটা অস্বাভাবিক রকমের ছোট — একটা চুলের কাঁটার মতন; পুরুষের মতো গজগজে দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক ওল্‌গা; জোসেফিন-জোসেফ — অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ; একত্র জোড়া যমজ শিশু হিল্‌টন, বামন আর লিলিপুটের দল।

বার্ণাই, পোসার্ট, মোনে-সুলি বা ঐ জাতের কোন শিল্পীর আর দরকার নেই। তাদের স্থান নিচ্ছেন ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স, হ্যারল্‌ড লয়েড প্রমুখ বাজিকরেরা; আর এঁদের সকলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন একঘেয়ে রকমের ভাবপ্রবণ ও বিষাদগ্রস্ত চার্লি চ্যাপলিন — ঠিক যেই ভাবে ক্লাসিক বাজনার স্থান নিচ্ছে জ্যাজ আর স্তাঁদাল, বালজাক, ডিকেন্স ও ফ্লবেরের জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওয়ালেসদের, যারা কী ভাবে ছিঁচকে চোর আর ছোট খাটো খুনিদের ধরে পুলিশের গোয়েন্দা বড় বড় চোর বাটপার আর ব্যাপক হত্যালীলা সংগঠকদের সম্পত্তি রক্ষা করে, তার বর্ণনা দিতে দক্ষ। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা ডাক টিকিট ও ট্রাম টিকিট সংগ্রহ ক'রে, কিংবা বড় জোর

পুরনো আমলের বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবির নকল সংগ্রহ ক'রে পরম সন্তুষ্ট। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের আগ্রহের বিষয় হল কোন্ প্রণালী ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে শ্রমিক শ্রেণীর দৈহিক শক্তিকে সবচেয়ে সস্তায় ও সহজে কাজে লাগানো যায়; বুর্জোয়াদের কাছে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ততটাই যতটা তা তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে, পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করে তুলতে এবং ব্যভিচারী যৌন শক্তিকে উদ্দীপিত করে তুলতে সাহায্য করতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, পুঁজিবাদের নির্যাতনে হীনবল মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যোদ্ধার, জড় পদার্থকে শক্তিতে পরিণত করা মানুষের দেহযন্ত্রের গঠন ও বৃদ্ধির রহস্যোদ্ধার -- এক কথায়, বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য — বুর্জোয়ার বোধবুদ্ধির অগম্য। এর কোনটাই একালের বুর্জোয়ার মনে তেমন একটা আগ্রহ জাগায় না, যেমন আগ্রহ জাগায় না মধ্য আফ্রিকার অসভ্য জংলীদের মনে।

এই সব দেখেশুনে কোন কোন বুদ্ধিজীবী বুঝতে শুরু করেছে 'সংস্কৃতি সৃষ্টি' -- যাকে তারা এত দিন নিজেদের কাজ, তাদের নিজেদের 'স্বাধীন চিন্তা' ও 'স্বাধীন ইচ্ছার' ফসল বলে মনে করত -- এখন আর তাদের কাজ নয়, এবং সংস্কৃতি আর পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তরের একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিচ্ছে না। চীনের ঘটনাবলী তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ১৯১৪ সালে লুভেনের বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ধ্বংসের ঘটনা; সাংহাইয়ে জাপানী কামানের গোলার আঘাতে তুং ৎসি বিশ্ববিদ্যালয়, নৌবাহিনীর কলেজ, ফিশারী স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষিবিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়রিং কলেজ ও শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসপ্রাপ্তি এ ত এই সেদিনকার ঘটনা! সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়বরাদ্দ সঙ্কোচন এবং সেই সঙ্গে নিরন্তর অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির ঘটনা যেমন কাউকে বিক্ষুব্ধ করে না এই বর্বরোচিত কাজও তেমনি কাউকে বিক্ষুব্ধ করে না।

অবশ্য এটা ঠিক যে ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ - যদিও একটা নগণ্য অংশ - 'মধ্যাভাব বিধির'* অধীনতা মেনে নেওয়ার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করছে, কোন্ দিকে যাওয়া উচিত এই নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পুরনো অভ্যাসবশত বুর্জোয়াদের সঙ্গে

---

* প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের একটি মূলনীতি — 'হয় সত্য, নয় মিথ্যা' — এর মাঝামাঝি কিছু নেই। প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন আরিস্ততল। — অনুঃ

থেকে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধাচরণ করা, নাকি নিজেদের মানসম্মান বজায় রেখে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগ দিয়ে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করা? — এই হল তাদের প্রশ্ন। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকজন এখনও তাদের পুঁজিবাদ-সেবা নিয়েই সন্তুষ্ট আছে; এদিকে তাদের প্রভু, পুঁজিবাদ তার সেবক ও সান্ত্বনাদাতাদের নৈতিক চরিত্রের টালবাহানা লক্ষ করে, তাদের আপসমনোভাবাপন্ন কাজের অসারতা ও নিষ্ফলতা লক্ষ ক'রে খোলাখুলি নিজেদের সেবক ও সান্ত্বনাদাতাদের উপেক্ষা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে এবং এরকম ভৃত্যের কোন প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কিনা ইতিমধ্যে সে-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ছে।

মধ্যবিত্ত কূপমণ্ডূকদের সান্ত্বনা দিয়ে বিশেষজ্ঞদের লেখা কিছু কিছু চিঠি আমাকে প্রায়ই পেতে হয়। সেগুলির একটি এখানে উল্লেখ করছি। চিঠিটা এসেছে জনৈক স্‌ভেন এল্‌ভেস্টাডের কাছ থেকে:

'পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত গোর্কি,

যে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট পৃথিবীর সবগুলি দেশকে নাড়া দিয়েছে তার ফলে সারা দুনিয়া জুড়ে প্রায় হতাশার সীমান্তবর্তী এক ভয়াবহ বিভ্রান্তির রাজত্ব চলছে। বিশ্বব্যাপী এই ট্র্যাজিডি লক্ষ করে ভয়াবহ বিপর্যয়ের বলি কোটি কোটি মানুষের মনোবল জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মনে আশা ভরসা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের সর্বাধিক প্রচারসংখ্যাবিশিষ্ট 'Tidens Tegn' সংবাদপত্রের স্তম্ভে আমি কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনার প্রবৃত্ত হয়েছি। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমি বিগত দু'বছরে পৃথিবীর জনগণের জীবনে সংঘটিত ট্র্যাজিক অবস্থার ওপরে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত চেয়ে তাঁদের কাছে আবেদন করা আবশ্যক বলে মনে করছি। যে-কোন দেশের যে-কোন নাগরিকের সামনে এখন একটি বিকল্পই আছে: হয় নিষ্ঠুর ভাগ্যের কঠিন আঘাতে মৃত্যু, নয়ত সঙ্কটের সৌভাগ্যপূর্ণ সমাধানের আশা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। যে বিষাদাচ্ছন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার ভেতর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসার এই আশা প্রত্যেকেরই থাকা দরকার; আর যাঁর বাণী সকলে মন দিয়ে শুনতে অভ্যস্ত, এমন একজন মানুষের আশাবাদী মত পড়ে যে কারও অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠবে সেই আশার আলো। আপনার কাছে তাই আমার একান্ত অনুরোধ, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান। আপনার মতামত তিন চার ছত্রের বেশি

নাও হতে পারে, কিন্তু তা নিঃসন্দেহে অনেক অনেক মানুষকে হতাশা থেকে উদ্ধার করবে, তাদের ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস ও বল যোগাবে।

শ্রদ্ধান্তে

সুভেন এন্ডেস্টাড।'

এই পত্রলেখকের মতো লোকজন, যাঁরা এখনও 'দু-তিন ছত্রের' আরোগ্যশক্তির ওপর, বাক্যের শক্তির ওপর সরল বিশ্বাস হারান নি - - এরকম লোকজন সংখ্যায় এখন কম নেই। তাঁদের বিশ্বাস এতই সরল যে খাঁটি কিনা সন্দেহ হয়। দুটি তিনটি বাক্য কিংবা দু'শ' তিনশ' — কিছুতেই বুর্জোয়াদের জরাজীর্ণ জগতে নবজীবন সঞ্চারিত হবে না। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে, জাতিপুঞ্জে নিত্য হাজার হাজার বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না, আশ্বাস দিতে পারছে না, বুর্জোয়া সভ্যতার এই স্বতঃস্ফূর্ত সংকট-বৃদ্ধিকে ঠেকিয়ে রাখা যে সম্ভব এমন আশা কারও মনে সঞ্চার করতে পারছে না। রাজ্যের যত প্রাক্তন মন্ত্রী এবং আরও সব নিষ্কর্মার দল শহরের এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিজ্ঞানের 'রাশ টানার', বিজ্ঞানকে 'সুশৃঙ্খল' করে তোলার প্ররোচনা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের বকবকানি সাংবাদিকরা তৎক্ষণাৎ লুফে নেয়। এই লোকদের কাছে — এই সাংবাদিকদের কাছে 'সব সমান, সবই বহুকাল আগে ক্লান্তিকর পর্যায়ে এসে ঠেকেছে'। এদেরই একজন, এমিল লুডভিগ 'ডেইলি এক্সপ্রেস'-এর মতো গুরুগম্ভীর সংবাদপত্রে 'বিশেষজ্ঞদের ঘাড় ধরে বার করে দেবার' পরামর্শ দিয়েছে। পেটি বুর্জোয়া কূপমণ্ডুকেরা এই সমস্ত আজেবাজে ইতর জিনিস শোনে, পড়ে আর এই আজেবাজে জিনিস থেকেই গড়ে তোলে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত। তাই ইউরোপীয় বুর্জোয়াসমাজ যদি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন বলে মেনে নেয় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গত, নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা একটি নজির দেখাতে পারে — জার্মানিতে প্রতি বছর ছয় হাজার করে বিভিন্ন পদ খালি হয়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রয়োজন; অথচ জার্মানির উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রতি বছর স্নাতক বেরোয় চল্লিশ হাজার পর্যন্ত!

আপনারা, শ্রীযুক্ত ডি. স্মিথ ও টি. মরিসন মহোদয়, বুর্জোয়া সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ওপর 'সংস্কৃতি সংক্রান্ত মতামত সংগঠকের' গুরুত্ব আরোপ

করে ভুল করে থাকেন। এই সংগঠক এক পরগাছা, যার চেষ্টা হল বাস্তবতার নোংরা বিশৃঙ্খলাকে আড়াল করে রাখা; কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, আইভি-লতা বা আগাছা ধ্বংসস্তূপের আবর্জনা ও নোংরা যেমন ভালো করে ঢেকে রাখতে পারে ঠিক ততটা ক্ষমতা তার নেই। আপনাদের যে-প্রেস এক বাক্যে জোর দিয়ে বলে 'আমেরিকান -- সর্বাগ্রে আমেরিকান,' শুধু তারপরই একজন মানুষ, তার সাংস্কৃতিক ভূমিকাটা যে কী ধরনের সে-সম্পর্কে আপনাদের, মহাশয়দের ধারণা তেমন স্পষ্ট বলে মনে হয় না। জার্মানির বর্ণবৈষম্যবাদী প্রেস আবার এই শিক্ষা প্রচার করে যে বর্ণবৈষম্যবাদী — সর্বাগ্রে আর্য, একমাত্র তারপরই সে একজন চিকিৎসক, ভূতাত্ত্বিক বা দার্শনিক; ফ্রান্সের সাংবাদিকরা প্রতিপাদন করতে চায় যে ফরাসী — সর্বাগ্রে বিজেতা, তাই সকলের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া তার উচিত তাকে -- বলাই বাহুল্য, সে অস্ত্র মস্তিষ্ক নয় -- স্রেফ বাহুবল।

কোন রকম অতিশয়োক্তি না করেও বলা চলে যে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেস সোৎসাহে এবং বলতে গেলে বিশেষ করে যে কাজে ব্যাপৃত থাকে তা হল তাদের পাঠকবর্গের সংস্কৃতির স্তর নীচু করা -- অবশ্য তাদের সাহায্য ছাড়াই তা নীচু স্তরের। আপন নিয়োগকর্তা পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে, তিলকে তাল করার কৌশল চমৎকার রপ্ত থাকা সত্ত্বেও শুয়োরকে বাগে আনার কোন উদ্দেশ্য সাংবাদিকদের দেখা যায় না, যদিও তাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে শুয়োরটা উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

আপনারা লিখেছেন: 'ইউরোপে আমরা গভীর তিক্ততার সঙ্গে অনুভব করেছি যে ইউরোপীয়রা আমাদের ঘৃণা করে।' এটা খুবই 'সাবজেক্টিভ', আর সাবজেক্টিভ মনোভাবের ফলে আপনি সত্যের একটা অংশমাত্র লক্ষ করতে পারলেও তার সাধারণ চেহারাটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে গোপনই রয়ে গেল -- আপনি লক্ষ করতে পারেন নি যে ইউরোপের বুর্জোয়ারা সকলেই পারস্পরিক ঘৃণার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে। লুণ্ঠিত জার্মানরা ফ্রান্সকে ঘৃণা করে, ফ্রান্স আবার স্বর্ণমদমত্ত হয়ে ইংরেজদের ঘৃণা করে, যেমন ইতালীয়রা ঘৃণা করে ফরাসীদের, আর সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী এককাট্টা হয়ে ঘৃণা করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। ৩০ কোটি ভারতীয় ইংরেজ লর্ড আর দোকানদারদের প্রতি ঘৃণা বুকে পুষে রেখে জীবন ধারণ করছে, ৪৫ কোটি চীনা জাপানীদের ঘৃণা করে, আর সেই সঙ্গে ঘৃণা করে তাবৎ ইউরোপীয়দের, যারা আবার চীনের ওপর লুঠপাট করতে অভ্যস্ত হলেও জাপানকে ঘৃণা করার জন্য প্রস্তুত, যেহেতু জাপান চীনের ওপর লুঠতরাজ করার অধিকারকে

তার বিশেষ অধিকার বলে গণ্য করে। সকলের প্রতি সকলের এই ঘৃণা বাড়তে বাড়তে আরও গাঢ়, আরও তীব্র হয়ে উঠছে, বুর্জোয়াদের মধ্যে তা স্ফীত হয়ে একটা সপুঁজ ফোড়ার আকার ধারণা করছে। এই ফোড়া অবশ্যই ফাটবে এবং সারা দুনিয়ার জাতিদের সবচেয়ে সুস্থ আর সেরা রক্তের নদী সম্ভবত আবার বয়ে যাবে। কোটি কোটি সুস্থসবল লোক ছাড়াও যুদ্ধে ধ্বংস হবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং কাঁচামাল - যা থেকে সেই সম্পদের সৃষ্টি; আর তার ফলে মানবজাতি তার স্বাস্থ্য, ধাতু, জ্বালানি — সব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়বে। একথা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না যে বুর্জোয়া শ্রেণীর একেকটি জাতি নিয়ে যে-দল গড়ে উঠেছে, তাদের পারস্পরিক ঘৃণা যুদ্ধের ফলে চলে যাবে না।

আপনারা মনে করেন 'সমগ্র মানব সংস্কৃতিকে সেবা করার ক্ষমতা' আপনাদের আছে এবং তাকে 'বর্বরতার পর্যায়ে নামার হাত থেকে রক্ষা করা' আপনাদের অবশ্যকর্তব্য। খুবই ভালো কথা। কিন্তু একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন আপনারা নিজেদের করুন: আজ, কিংবা ধরলামই না হয় আগামীকাল — কী আপনারা করতে পারেন এই সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, যে সংস্কৃতি — প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো — কস্মিনকালে 'সমগ্র মানবের' ছিল না, এবং সে রকম হতেও পারে না জাতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির উপস্থিতিতে, যেহেতু শ্রমজীবী জনগণের প্রতি তারা বিন্দুমাত্র দায়-দায়িত্ব বোধ করে না, এক জাতিকে আরেক জাতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়?

তাই বলি, আপনারা নিজেদের জিজ্ঞেস করুন: বেকার সমস্যা, অনশনক্লিষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, শিশু পতিতাবৃত্তির হার বৃদ্ধি - সংস্কৃতি বিধ্বংসকারী এই সমস্ত ঘটনাকে মোকাবিলা করার জন্য আপনারা কী করতে পারেন? আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে জনসাধারণের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা মানে যেখান থেকে সংস্কৃতির উদ্ভব সেই মাটিই ক্ষয়ে যাওয়া? আপনারা হয়ত জানেন যে তথাকথিত 'সংস্কৃতিবান স্তর' চিরকাল এসেছে জনসাধারণের মাঝখান থেকে। এই তথ্যটা আপনাদের ভালো জানা থাকা দরকার, কেননা মার্কিনীদের এই বলে গর্ব করার অভ্যাস আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খবরের কাগজের ফিরিওয়ালাও প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদায় উঠতে পারে।

এই কথা প্রসঙ্গে আমি শুধু যেটা উল্লেখ করতে চাই তা হল ঐ

ফিরিওয়ালা বাচ্চাগুলোর দক্ষতা -- প্রেসিডেন্টদের প্রতিভা নয় — তাঁদের প্রতিভা সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

আরও একটা প্রশ্ন আছে যা নিয়ে আপনাদের একটু ভাবা উচিত: আপনারা কি মনে করেন যে পঁয়তাল্লিশ কোটি চীনাকে ইউরোপীয় ও মার্কিন পুঁজির ক্রীতদাসে পরিণত করা সম্ভব হবে, যেখানে তিরিশ কোটি ভারতীয় এখনই বুঝতে শুরু করেছে যে ব্রিটেনের ক্রীতদাস হিশেবে তাদের ভূমিকাটা আদৌ ঈশ্বরাদিষ্ট নয়? একবার ভেবে দেখুন হাজার কয়েক লুঠেরা আর হঠকারী লোক কোটি কোটি শ্রমজীবীর শক্তি ভাঙিয়ে চিরকাল শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে চায়! এটা কি স্বাভাবিক? এরকম চিরকাল ছিল, চিরকাল হয়ে আসছে; কিন্তু যেমন আছে সেরকমই হওয়া উচিত -- একথা জোর দিয়ে বলার মতো সাহস আপনাদের আছে কি? মধ্যযুগে প্লেগও প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা ছিল, কিন্তু সেই প্লেগ এখন বলতে গেলে অন্তর্ধান করেছে -- বর্তমানে পৃথিবীতে তার ভূমিকা পালন করছে বুর্জোয়ারা, তারা অশ্বেতকায় সমাজের সকলের মনে পুরো শ্বেতকায় জাতির বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞার বীজ বপন ক'রে তাদের বিষিয়ে তুলছে। আপনারা, যারা সংস্কৃতির ধ্বজাধারী, তাদের কি মনে হয় না যে পুঁজিবাদ জাতিকুলবৈষম্যমূলক যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে?

আমি 'বিদ্বেষ প্রচার' করছি এই বলে আমাকে নিন্দা করে আপনারা আমাকে 'প্রেমের বাণী' প্রচার করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। আপনারা সম্ভবত মনে করেন আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি শ্রমিকদের এই বলে চৈতন্যোদয় করতে পারি যে পুঁজিপতিদের ভালোবাস, যেহেতু তারা তোমাদের শক্তি শুষে নিচ্ছে; তাদের ভালোবাস, যেহেতু তারা তোমাদের এই ধরণীর ধনসম্পদকে বৃথা ধ্বংস করছে; ভালোবাস এই মানুষগুলোকে, যারা তোমাদের ধ্বংস করার জন্য তোমাদেরই লোহা খরচ করে মারণাস্ত্র বানায়; ভালোবাস এই পাজি বদমায়েসগুলোকে, যাদের কল্যাণে তোমাদের সন্তানসন্ততিরা অন্নাভাবে ইহলীলা সংবরণ করছে; ভালোবাস তাদের যারা নিজেদের শান্তি আর উদরতৃপ্তির জন্য তোমাদের ধ্বংসসাধন করছে; ভালোবাস পুঁজিবাদীকে, যেহেতু তার গির্জা তোমাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দিচ্ছে।

অনেকটা এরকম বাণীই প্রচার করা হয়েছে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারে, তার কথা স্মরণ করেই আপনারা খ্রীষ্টধর্মকে 'সংস্কৃতির উত্তোলনদণ্ড' বলে উল্লেখ করেন। আপনারা সময় থেকে বেশ পিছিয়ে পড়ে আছেন — 'প্রেম ও আজ্ঞানুবর্তিতা শিক্ষার' সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে সৎ লোকেরা আজ

বহুকাল হল কিছু বলেন না। আজকালকার দিনে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বুর্জোয়া শ্রেণী যখন নিজের ঘরে আর বাইরের উপনিবেশগুলিতে আজ্ঞানুবর্তিতার কথা বলে বেড়ায় এবং সেই সঙ্গে প্রবল উৎসাহে, আগের চেয়েও বেশি উৎসাহের সঙ্গে 'আগুন আর তরবারির' সাহায্যে তার ক্রীতদাসদের বাধ্য করে তাকে ভালোবাসতে, তখন এই প্রভাবের কথা বলা সাজে না, বলা সম্ভব নয়। আজকালকার দিনে, আপনাদের অবিদিত নেই, তরবারির স্থান নিয়েছে মেশিনগান, বোমা, এমনকি 'ঊর্ধ্বলোকের দৈববাণী'। প্যারিসের একটি সংবাদপত্র জানাচ্ছে:

'আফ্রিদিদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইংরেজরা মাথা খাটিয়ে এমন একটা পদ্ধতি বার করে যাতে তাদের বড় রকমের লাভ হয়। এক দল বিদ্রোহী দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মাঝখানে কোন এক উপত্যকাভূমিতে আত্মগোপন করে। হঠাৎ তাদের মাথার ওপরে নীচু হয়ে এরোপ্লেন উড়তে দেখা গেল। আফ্রিদিরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক চেপে ধরল। কিন্তু এরোপ্লেন বোমা ফেলল না। বোমার বদলে সেখান থেকে ঝরে পড়তে লাগল কথা। আকাশবাণী বিদ্রোহীদের মাতৃভাষায় তাদের অস্ত্রত্যাগের অনুরোধ জানায়, ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিরর্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকতে বলে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আকাশবাণীর ফলে হতচকিত হয়ে বিদ্রোহীরা সত্যি সত্যি লড়াই থামিয়ে দিয়েছে।

'দৈববাণী নিয়ে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি মিলানেও করা হয়েছে। ফাশিস্ত মিলিশিয়া প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে সারা শহরের লোকজন শুনতে পায় ফ্যাসিবাদের সংক্ষিপ্ত প্রশস্তিসূচক দৈববাণী। জেনারেল বালবোর ভাষণ শোনার অভিজ্ঞতা মিলানবাসীদের থাকায় তারা ঐ আকাশবাণীর মধ্যে তার গম্ভীর মোলায়েম কণ্ঠস্বর চিনতে পারে।'

সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের এবং অসভ্যদের পদানত করে রাখার জন্য তাঁর কণ্ঠস্বরকে কাজে লাগানোর একটা সাধারণ উপায় খুঁজে পাওয়া গেছে। আশা করা যেতে পারে যে ঈশ্বর একদিন সান ফ্রান্সিসকো বা ওয়াশিংটনের মাথার ওপরে জাপানী টানে ইংরেজি ভাষায় কথা বলবেন।

আপনারা আমাকে 'মহিমান্বিত ব্যক্তিদের, গির্জার গুরুদের' দৃষ্টান্ত দেবেন। ভাবলে বড় হাসি পায় যে এটা আপনাদের মনের কথা। কী ভাবে, কোন্ ধাতুতে এবং কেন গির্জার এই মহা মহা ব্যক্তিরা তৈরি হয়েছেন সে কথা না হয় আমরা না-ই বললাম। কিন্তু এই লোকগুলোর ওপর নির্ভর করার আগে তারা যে কতটা মজবুত তা আপনাদের পরীক্ষা করে দেখে

নেওয়া উচিত ছিল। 'গির্জার মামলা' বিচার করতে গিয়ে আপনারা 'মার্কিন আদর্শবাদের' যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ফেলেন তার জন্ম একমাত্র গভীর অজ্ঞতার জমিতেই হওয়া সম্ভব। বর্তমান ক্ষেত্রে, খ্রীষ্টীয় গির্জার ইতিহাস প্রসঙ্গে, আপনাদের অজ্ঞতার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে মানুষের বুদ্ধিবিবেচনা ও বিবেকের ওপর অত্যাচারের একটা সংস্থা হিশেবে গির্জা যে কী বস্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সেটা টের পেতে হয় নি, ইউরোপবাসীদের মতো এত প্রবল ভাবে সেই অত্যাচার তাদের ভোগ করতে হয় নি। ধর্ম মহাসঙ্গীতিগুলিতে এই 'মহিমান্বিত ধর্মগুরুদের' ধর্মান্ধতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থান্ধতার সঙ্গে যে-সমস্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধত, তার পরিচয় আপনাদের নেওয়া উচিত ছিল। আপনারা বিশেষ করে অনেক কিছু জানতে পারতেন এফেসুসের ধর্মপরিষদের ভণ্ডামির ঘটনা থেকে, আপনাদের উচিত ছিল হেরেসির ইতিহাসের ওপর কিঞ্চিৎ পাঠগ্রহণ করা; খ্রীষ্টধর্মের প্রথম যুগে 'হেরেটিকদের' উচ্ছেদের ঘটনা, ইহুদীনিধন, আল্‌বিগেন্‌স ও টাবোরাইটদের উচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে - মোটের ওপর খ্রীষ্টের গির্জার রক্তক্ষয়ী নীতির সঙ্গে আপনাদের পরিচিত হওয়া উচিত ছিল। যারা স্বল্পশিক্ষিত, তারা কৌতূহল বোধ করবে ধর্মবিচারসভার ইতিহাসে -- তবে হ্যাঁ, আপনার স্বদেশবাসী ওয়াশিংটন লি'র রচিত বিবরণীতে নয় - ঐ লেখা ধর্মবিচারসভার সংগঠক ভ্যাটিকানের সেন্সরব্যবস্থা অনুমোদিত। ব্যাপারটা খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে যদি এই সব ঘটনার পরিচয়গ্রহণের পর আপনার প্রত্যয় হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘুর শাসনক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করার জন্য চার্চের ফাদাররা প্রবল উৎসাহে কাজ করে গেছে, আর তারা যে হেরেসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তার কারণ আর কিছুই নয় -- হেরেসিদের উদ্ভব শ্রমজীবী জনসাধারণের ভেতর থেকে, তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তিবশে গির্জার ধ্বজাধারীদের কপটতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল ওরা প্রচার করছে ক্রীতদাসের ধর্ম --- এমন এক ধর্ম, যাকে প্রভুরা ভুল বুঝে না থাকলে কিংবা ক্রীতদাসদের সামনে ভয় না পেলে কস্মিনকালে গ্রহণ করত না। আপনাদের ঐতিহাসিক ভ্যান লুন তাঁর 'ইতিহাসের মারাত্মক ভুল' প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন যে গির্জার উচিত ছিল সুসমাচারের শিক্ষার জন্য সংগ্রাম না করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তাঁর কথায়: সবচেয়ে মারাত্মক ভুল এক সময়ে করেছিলেন টাইটাস — জেরুসালেম ধ্বংস করে। এর ফলে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত

ইহুদীরা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তারা যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করল তারই মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম পরিণতি লাভ করল, তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে লাগল; আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারা যেমন, রোম সাম্রাজ্যের পক্ষে খ্রীষ্টধর্ম তার চেয়ে কোন অংশে কম মারাত্মক ছিল না।

বস্তুতই তাই, এটা ঘটনা — খ্রীষ্টীয় গির্জা সুসমাচারের সরল, অকপট কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছে — এ-ই হল তার 'ইতিহাসের' মোদ্দা কথা।

আজকালকার দিনে গির্জা কী করছে? গির্জা, অবশ্যই, সর্বোপরি চালিয়ে যাচ্ছে পুজো অর্চনা। ইয়র্কশায়ারের আর্চবিশপ, ক্যাণ্টেরবেরির আর্চবিশপ — ইনি সেই, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদ গোছের কিছু একটা প্রচার করেছিলেন — এই দুই আর্চবিশপ এক নতুন স্তব রচনা করেছেন, যার মধ্যে ইংরেজদের রসিকতার সঙ্গে তাদের ভণ্ডামির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রচনাটা মস্ত বড় — অনেকটা 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ' ধাঁচে লেখা। আর্চবিশপরা ঈশ্বরকে আহ্বান করছেন এই ভাবে:

'ক্রেডিট আর সাচ্ছন্দ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের সরকারের নীতি প্রসঙ্গে — তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ভবিষ্যতে ভারত শাসনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে — তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আসন্ন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন প্রসঙ্গে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে — তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ব্যবসাবাণিজ্য, ক্রেডিটের প্রতি আস্থা ও পারস্পরিক হিতাকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে — আমাদের দৈনন্দিন রুটি অদ্য আমাদের দাও। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য সকল শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা প্রসঙ্গে — আমাদের দৈনন্দিন রুটি অদ্য আমাদের দাও। আমরা যদি আমাদের জাতিদম্ভের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আমাদের সাধ্যমতো অন্যদের সাহায্য করার বদলে তাদের ওপর প্রভুত্ব করে বেশি তৃপ্তি পেয়ে থাকি তাহলে আমাদের সে অপরাধ মার্জনা করো। আমরা যদি আমাদের কর্মপ্রবর্তনার ক্ষেত্রে স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকি এবং নিজেদের ও নিজ শ্রেণীর স্বার্থকে আর সকলের স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের সে অপরাধ মার্জনা করো।'

ভীতসন্ত্রস্ত দোকানদারদের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রার্থনা বটে! এর মধ্যে তারা বার দশেক ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়েছে যে তিনি যেন তাদের 'অপরাধ'

মার্জনা করেন, কিন্তু একবারও একথা বলে নি যে অপরাধ করা থেকে তারা নিবৃত্ত থাকবে। কেবল একটি ক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের কাছে 'ক্ষমা' প্রার্থনা করেছে:

'অন্যদের সেবা করার ক্ষমতা না দেখিয়ে তাদের ওপর শাসন করার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পেয়ে আমরা যে প্রবল জাতিদম্ভের কবলিত হয়েছি সে জন্য হে প্রভু, আমাদের ক্ষমা করো!'

এই পাপকর্মের জন্য আমাদের ক্ষমা করো, কিন্তু পাপ না করে পারছি না আমরা — এই হল তাদের কথা। কিন্তু ইংলণ্ডের বেশির ভাগ যাজক ক্ষমাপ্রার্থনার এই পত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করেন; সম্ভবত এটা তাঁদের কাছে অস্বস্তিকর ও অবমাননাকর মনে হয়েছিল।

এই স্তবটি ২ জানুয়ারী লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালে ইংরেজদের ঈশ্বরের সিংহাসন সমীপে 'উৎসর্গ করার' কথা ছিল। স্তবটি যে সমস্ত ধর্মযাজকের মনঃপূত হয় নি ক্যাণ্টেরবেরির আর্চবিশপ তাঁদের ইচ্ছে না হলে সেটি পাঠ না করার অনুমতি দিয়েছেন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, কতদূর ইতর ও অর্থহীন প্রহসনের পর্যায়ে পেঁছেছে খ্রীষ্টিয় গির্জা, কী হাস্যকর ভাবে ধর্মযাজকেরা তাদের ঈশ্বরকে একজন উঁচুদরের দোকানদার এবং ইউরোপের সেরা দোকানদারদের সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেনের একজন অংশীদারের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে! কিন্তু শুধু ইংরেজ ধর্মযাজকদের সম্পর্কেই বলা ঠিক হবে না -- ভুলে গেলে চলবে না যে ইতালীয়রা 'হোলি গোস্ট ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করেছে, আর ফ্রান্সে ম্যুলেজে শহরে ১৫ ফেব্রুয়ারীতে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে দেশান্তরী রুশীদের প্যারিস্ সংবাদপত্র জানাচ্ছে:

'আদালত-কর্তৃপক্ষের হুকুমে আবে এজির পরিচালনাধীন 'ক্যাথলিক ইউনিয়ন পাবলিশিং হাউস'-এর বইয়ের দোকানের ম্যানেজার ও সেল্‌সম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বইয়ের দোকানে জার্মানি থেকে আমদানী করা অশ্লীল ফোটোগ্রাফি ও বই বিক্রি হত। 'পণ্যদ্রব্য' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কতকগুলি বই কেবল বিষয়বস্তুর দিক থেকেই অশ্লীল নয়, সেগুলিতে ধর্মের ওপরেও কাদা ছোঁড়া হয়েছে।'

এ ধরনের ঘটনার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, আর তাদের সবগুলি থেকে শুধু একটি জিনিসই বেরিয়ে আসে: গির্জার পৃষ্ঠপোষক ও প্রভু পুঁজিবাদ যে যে রোগে মরতে বসেছে, তার সেবাদাসীটিও সেই সমস্ত রোগে আক্রান্ত। যদি আমরা ধরেও নিই যে, কোন এক সময় বুর্জোয়া

শ্রেণী 'গির্জার নৈতিক কর্তৃত্বকে গ্রাহ্য করত', তাহলে মানতেই হবে যে সে কর্তৃত্ব ছিল আত্মার ওপর 'পুলিশী খবরদারি' -- শ্রমজীবী জনগণের ওপর অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে যারা মদত দিচ্ছে সেই রকম একটি সংস্থার কর্তৃত্বমাত্র। গির্জা 'সান্ত্বনা দান করেছে' — এই কথা বলবেন ত? অস্বীকার করছি না। কিন্তু এই সান্ত্বনা হল বুদ্ধিবিবেচনাকে নাশ করার অন্যতম উপায়।

না, দরিদ্রকে বলা, ধনীকে ভালোবাস, শ্রমিককে বলা, মালিককে ভালোবাস — এমন বাণী প্রচার করা আমার বৃত্তি নয়। সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বেশ ভালো করে জানি এবং দীর্ঘকাল হল জানি যে জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে ঘৃণার পরিবেশ, আমি দেখতে পাচ্ছি সে ঘৃণা আরও গাঢ় হয়ে আসছে, আরও সক্রিয় ও মঙ্গলজনক হয়ে উঠছে।

হে 'মানবতাবাদীরা', আপনারা, যাঁরা 'বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হতে চান,' তাঁদের বোঝার সময় এসেছে যে জগতে ঘৃণা আছে দু'জাতীয়: একটার উদ্ভব লুঠেরাদের মধ্যে, তাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য তাদের ভীতি থেকে, ভবিষ্যতে লুঠেরাদের ধ্বংস যে অনিবার্য এই আশঙ্কায়। আরেকটা যে ঘৃণা -- প্রলেতারিয়েতের ঘৃণা — তার উদ্ভব বাস্তব অবস্থার প্রতি প্রলেতারিয়েতের প্রবল বিতৃষ্ণা থেকে; আর তা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে শাসনক্ষমতার অধিকার সম্পর্কে তার আত্মসচেতনতায়। এই দুই ঘৃণাবোধ বৃদ্ধি পেয়ে যে রকম শক্তির পর্যায়ে পেণছেছে তাতে কারও এবং কোন কিছুরই সাধ্য নেই যে তাদের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দিতে পারে, যে শ্রেণীদেহ এই ঘৃণার বাহক তাদের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত ছাড়া আর কিছুই, প্রলেতারীয়দের বিজয় ছাড়া আর কিছুই, ঘৃণা থেকে জগৎকে মুক্ত করতে পারে না।

আপনারা লিখেছেন: 'অন্য অনেকের মতো আমরাও মনে করি যে আপনাদের দেশে শ্রমিকদের একনায়কত্বের ফলে কৃষক সম্প্রদায় নির্যাতিত।' আমি আপনাদের পরামর্শ দিই কি অনেকের মতো না ভেবে ভাবার চেষ্টা করুন তাদের মতো -- যারা সংখ্যায় আপাতত, এখনও তেমন একটা বেশি নয় — অর্থাৎ স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের মতো, যারা ইতিমধ্যে বুঝতে শুরু করেছে যে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা এক উত্তুঙ্গ শীর্ষদেশ, যেখানে পেণছুতে গেলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সততার সঙ্গে সামাজিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করতে হয়, আর এই শিক্ষার উচ্চভূমি থেকেই সামাজিক ন্যায়বিচারের, সংস্কৃতির নব নব রূপের সোজা পথ স্পষ্ট চোখে পড়ে। যার আগাগোড়া

ইতিহাস খেটে-খাওয়া মানবজাতির ওপর — শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণের ওপর নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পীড়নের দীর্ঘ ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়, নিজের ওপর একটু জোর খাটিয়ে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও — ভুলে যাবার চেষ্টা করুন সেই শ্রেণীর সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা। একটু জোর খাটিয়ে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন — তাহলেই বুঝতে পারবেন, আপনাদের শ্রেণী আপনাদের শত্রু। কার্ল মার্কস পরম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, এমন কথা মনে করা ঠিক হবে না যে মিনার্ভা দেবীর মতো জুপিটারের ললাটদেশ থেকে এই ধরাধামে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। না, এককালে নিউটন ও ডারউইনের তত্ত্ব যেমন ছিল বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার মহাপ্রতিভাসম্পন্ন সিদ্ধান্ত, কার্ল মার্কসের শিক্ষাও সেই রকম। লেনিন মার্কসের চেয়ে সহজ, কিন্তু শিক্ষাগুরু হিশেবে কোন অংশে কম জ্ঞানী নন। তাঁরা প্রথমে আপনাদের দেখাবেন, আপনারা যে শ্রেণীর সেবা করছেন তার শক্তি ও গৌরবের অধ্যায়, দেখাবেন কী ভাবে অমানুষিক অত্যাচারের আশ্রয় নিয়ে রুধিরস্রোত, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের ওপর সে গড়তে শুরু করেছে এবং গড়ে তুলেছে তার নিজের পক্ষে সুবিধাজনক এক 'সংস্কৃতি'; তার পর তাঁরা দেখাবেন এই সংস্কৃতির পচনের প্রক্রিয়া। এরও পরে, তার বর্তমান পচনের রূপ আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন — কেননা সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আমার কাছে আপনি যে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে ঠিক এই প্রক্রিয়ার জন্যই আপনার উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।

'নির্যাতনের' প্রসঙ্গ ধরা যাক। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব একটা সাময়িক জিনিস, যে কোটি কোটি মানুষ এক কালে প্রকৃতি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস ছিল, তাদের নতুন করে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিজেদের দেশের এবং দেশের সমস্ত ধনসম্পদের একচ্ছত্র অধিপতিতে পরিণত করার জন্য এর একান্ত আবশ্যক। যখন সমস্ত মেহনতী জনগণ, সমস্ত কৃষক সম্প্রদায় একই রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় জীবনযাপন করার পর্যায়ে আসবে এবং প্রতিটি ব্যক্তির সামনে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার ও চাহিদা অনুযায়ী পাবার সুযোগ দেখা দেবে তখন প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে। একে আপনারা এবং 'আরও অনেকে' যে 'নির্যাতন' বলে মনে করেন সেটা আপনাদের বোঝার ভুল, তবে প্রায়শঃই, তা মিথ্যাচার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির বিরুদ্ধে অপবাদ। শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক কাজকে — তার দেশের পুনর্জন্ম ঘটানোর এবং দেশের মধ্যে অর্থনীতির নব নব রূপ সংগঠনের

কাজকে মসীলিপ্ত করে দেখানোর উদ্দেশ্যেই, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সামাজিক প্রক্রিয়া চলছে, শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুরা তার ওপর 'নির্যাতন' কথাটি আরোপ করে থাকে।

আমার মতে, একে বলা চলে বাধ্য করা, যার অর্থ আদৌ নির্যাতন নয়; কেননা, ধরুন না কেন আপনি যখন শিশুকে লেখাপড়া শেখান তখন সেটাকে নিশ্চয়ই নির্যাতন বলা যায় না? সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি কৃষক সম্প্রদায়কে সামাজিক ও রাজনৈতিক লেখাপড়া শেখাচ্ছে। আপনাদের, বুদ্ধিজীবীদেরও কিছু একটা বা কেউ একজন বাধ্য করছে 'হাতুড়ি আর নেহাইয়ের মাঝখানে' আপনাদের জীবনের যে ট্র্যাজিডি, তাকে উপলব্ধি করতে; আপনাদেরও কেউ একজন সামাজিক ও রাজনৈতিক বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ ধরিয়ে দিচ্ছে -- আর এই কেউ একজন, বলাই বাহুল্য, আমি নই।

সব দেশেই কৃষক সম্প্রদায় -- কোটি কোটি চুনোপুঁটি মালিকানা স্বত্বাধিকারীরা লুঠেরা ও পরগাছা বৃদ্ধির অনুকূল জমি হয়ে দেখা দেয়। পুঁজিবাদ তার যাবতীয় কুশ্রীতা নিয়ে এই জমিতে বড় হয়ে উঠেছে। কৃষকের সমস্ত দক্ষতা ও প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যায় তার দীনদরিদ্র বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করার মধ্যে। ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীর সাংস্কৃতিক নির্বুদ্ধিতা যে একজন কোটিপতির সাংস্কৃতিক নির্বুদ্ধিতার সম্পূর্ণ সমান স্তরের, আপনাদের, বুদ্ধিজীবীদের তা ভালো করে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারা উচিত। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের আগে কৃষক সম্প্রদায় সপ্তদশ শতাব্দীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবেশে বাস করত --- এটা ঘটনা। এমনকি দেশত্যাগী রুশীরাও, সোভিয়েত শাসনক্ষমতার প্রতি যাদের বিষোদ্‌গার ইতিমধ্যে হাস্যকর রকমের বিকট আকার ধারণ করেছে, তারাও এই ঘটনা অস্বীকার করতে সাহস পাবে না।

কৃষক সম্প্রদায়কে অর্ধবর্বর চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, কোন ধূর্ত জোতদার, জমিদার বা পুঁজিপতির শিকার হতে হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত, নিঃশেষিত যে জমি তার নিঃস্ব মালিকের মুখের অন্ন যোগাতে পারে না, সেখানে --- জমিতে সার দেবার, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের এবং কৃষিব্যবস্থা বিকাশের ক্ষমতা যে অশিক্ষিত জমি মালিকের নেই --- তার জমিতে, হাড়ভাঙা খাটুনি করে কৃষক সম্প্রদায়কে বেঁচে থাকতে হবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। আমার মতে, যেহেতু ম্যালথাসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রচ্ছন্ন আছে

গির্জার ধর্মান্ধ চিন্তা অতএব সেই বিষাদাচ্ছন্ন তত্ত্বকে সমর্থন করা কৃষক সম্প্রদায়ের উচিত নয়। কৃষক সম্প্রদায়, ব্যাপক হারে, তার বাস্তব অবস্থা ও অপমানজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও যদি সচেতন না হয় তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য হবে তার মধ্যে এই চেতনা সঞ্চার করা — এমনকি তাকে এটা বুঝতে বাধ্য করতে হবে। কিন্তু তার কোন দরকার হবে না, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষক সম্প্রদায় ১৯১৪-১৯১৮ সালের হত্যালীলার যন্ত্রণা ভোগ করেছে, অক্টোবর বিপ্লবের ফলে তার জাগরণ ঘটেছে — এখন আর তাই সে অন্ধ নয়, বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা তার আছে। যন্ত্রপাতি ও সার তাকে সরবরাহ করা হচ্ছে, সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার তার সামনে উন্মুক্ত, প্রতি বছর কৃষক পরিবারের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইঞ্জিনীয়র, কৃষিবিদ, চিকিৎসক হয়ে বেরিয়ে আসছে। কৃষক সম্প্রদায় বুঝতে শুরু করেছে যে শ্রমিক শ্রেণী তার পার্টির মধ্য দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে ওঠে এক একক প্রভু, যার মাথা ১৬ কোটি আর হাত ৩২ কোটি — আর এটাই সবচেয়ে বড় কথা, এ কথাটাই তার বোঝা উচিত। কৃষক সম্প্রদায় দেখতে পাচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা যা করা হচ্ছে তা ক্ষুদ্র সম্পদশালী গোষ্ঠীর জন্য নয় — সকলের জন্য; কৃষক সম্প্রদায় দেখতে পাচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র সেই কাজই করা হচ্ছে যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক, দেখতে পাচ্ছে যে দেশের ছাব্বিশটি 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ইনস্টিটিউট' তার জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির জন্য, তার শ্রম হালকা করার জন্য কাজ করছে।

কৃষকেরা যুগ যুগ ধরে যেমন অপরিচ্ছন্ন গ্রামে বসবাস করে এসেছে এখন তার বদলে তারা বসবাস করতে চায় কৃষিনগরীগুলিতে, যেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আছে ভালো ভালো স্কুল আর ক্রেশ এবং তাদের নিজেদের জন্য থিয়েটার, ক্লাব, লাইব্রেরী ও সিনেমা। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা এবং সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে রুচিবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকেরা যদি এ সব বুঝতে না পারত তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পনেরো বছরে এমন বিপুল সাফল্য অর্জন করত না। শ্রমিক ও কৃষকদের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলেই অর্জিত হয়েছে এ সাফল্য।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে শ্রমিক জনসাধারণ — যান্ত্রিক শক্তি মাত্র — ব্যাপক ভাবে তারা তাদের শ্রমের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ। আপনাদের দেশে মালিকের পদে অধিষ্ঠিত আছে জাতীয় সম্পদ ও শক্তি যারা দু'হাতে লুঠছে সেই সব ট্রাস্ট্র আর সংস্থা, শ্রমজীবী জনগণের শোষক পরগাছা।

তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে, টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, একে অন্যকে পথে বসানোর মতলব করে, আর এই ভাবে গড়ে তোলে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতারণার যত নাটক - কিন্তু এখন, শেষ পর্যন্ত তাদের নৈরাজ্যবাদ দেশকে টেনে নিয়ে গেছে এক অদৃষ্টপূর্ব সংকটের দিকে। কোটি কোটি শ্রমিক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, জাতির স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটছে, শিশুমৃত্যুর হার বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে চলছে — সংস্কৃতির ভিত্তি, তার সজীব মানবশক্তি নিঃশেষিত হয়ে ঝরে পড়ছে। তৎসত্ত্বেও বেকারদের প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের জন্য ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করে যে লা ফলেট-কোস্টিগান বিল আপনাদের সিনেটে আনা হয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেছে; এদিকে 'ন্যু ইয়র্ক আমেরিকান' যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বকেয়া বাড়ি ভাড়ার দরুন ১৯৩০ সালে ১৫৩,৭৩১ জন বেকার ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়, ১৯৩১ সালে অনুরূপ ঘটনা ঘটে ১৯৮,৭৩৮টি। এই বছর জানুয়ারীতে, ন্যু ইয়র্কে প্রতিদিন শত শত বেকার ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে ফ্ল্যাট থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যারা প্রভুত্ব করছে, আইন প্রণয়ন করছে, তারা শ্রমিক, সেই সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের এক অংশ, যাদের চেতনা এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে যে তারা জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা, খেতের কাজ সামাজিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে, উপলব্ধি করতে পারছে যে যারা কলকারখানায় কাজ করছে সেই সব কর্মীর ধাঁচে তাদের নিজেদের মানসিকতাকে গড়ে তুলতে হবে, তাদের নতুন করে জন্ম নিতে হবে, অর্থাৎ তাদের হতে হবে দেশের খাঁটি প্রভু, একমাত্র প্রভু। যৌথকর্মপন্থী কৃষক আর কমিউনিস্টদের সংখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম যুগযুগান্তরের দাসসুলভ অস্তিত্ব ও তজ্জনিত কুসংস্কার এবং ভূমিদাস প্রথার উত্তরাধিকার থেকে যত মুক্তি পাবে সেই সংখ্যাও তত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আইন প্রণয়ন করা হয় নীচ থেকে; মেহনতী জনসাধারণ তার স্রষ্টা, তাদের প্রাণোচ্ছল কর্মপরিস্থিতি থেকে তার উৎসার। শ্রমিক ও কৃষকের যে শ্রম, যার মূল উদ্দেশ্য হল সমাধিকারসম্পন্ন মানুষের সমাজ গড়ে তোলা, তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পরিণতি লাভ করে, সোভিয়েত শাসনক্ষমতা ও পার্টি একমাত্র তাকেই আইনে রূপায়িত করে,

বিধিবদ্ধ করে। পার্টি একনায়ক — শ্রমিক জনসাধারণের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ব্যবস্থার সংগঠন কেন্দ্র হিশেবে যতটা হওয়া উচিত ততটাই একনায়ক। পার্টির লক্ষ্য — প্রতিটি মানুষের এবং সমগ্র জনসাধারণের প্রতিভা ও ক্ষমতাবিকাশের যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা যাতে দেওয়া যায় তার জন্য যতদূর সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে যতখানি সম্ভব কায়িক শক্তিকে মানসিক শক্তিতে পরিণত করা।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যক্তিসর্বস্বতার ওপর ভরসা ক'রে যুবসম্প্রদায়কে প্রবল উৎসাহে তার নিজের স্বার্থ ও ঐতিহ্যের ধাঁচে শিক্ষা দিয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঠিক বুর্জোয়া সমাজের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেই নৈরাজ্যবাদের চিন্তাধারা ও তত্ত্বের খুব বেশি ঘন ঘন উদ্ভব ঘটেছে এবং ঘটছে; এটাকে কিন্তু স্বাভাবিক বলা চলে না, এটা বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাদের পরিবেশ এতই অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর যে তার মধ্যে লোকে হাঁপিয়ে ওঠে, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাজের পরিপূর্ণ বিনষ্টির স্বপ্ন দেখতে থাকে। আপনারা জানেন আপনাদের যুবসম্প্রদায় শুধু যে স্বপ্ন দেখে তা নয়, সেই অনুযায়ী কাজও করে। আপনাদের এবং ইউরোপের বুর্জোয়া যুবসম্প্রদায় যে সব 'নষ্টামি' করে — যেগুলো অপরাধের সামিল — ইউরোপের পত্রপত্রিকায় প্রায়ই তার খবর থাকে। বৈষয়িক অভাব-অনটন নয়, 'জীবনের একঘেয়েমি', কৌতূহলপ্রবণতা, 'রোমাঞ্চের' আকর্ষণ — এই সমস্ত অপরাধকে জাগিয়ে তোলে; আর এ ধরনের সবগুলো অপরাধের একেবারে মূলে আছে ব্যক্তিমানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত নীচু ধারণা। শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের সবচেয়ে প্রতিভাবান সন্তানদের নিজেদের পরিমন্ডলের মধ্যে টেনে এনে তাদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে বুর্জোয়ারা যে ব্যক্তিস্বাধীনতার বড়াই করে তার সাহায্যে একজন ব্যক্তি 'কিছু কিছু ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য' — যথা স্বাচ্ছন্দ্যকর ডেরা, আরামদায়ক খোঁড়ল অবশ্যই পেতে পারে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না যে আপনাদের সমাজে হাজার হাজার প্রতিভাবান মানুষ হীন ধরনের সচ্ছলতা অর্জন করতে গিয়ে, বুর্জোয়া জীবনযাত্রার সাধারণ পরিস্থিতি তাদের পথে যে-সমস্ত বাধা সৃষ্টি করে সেগুলি অতিক্রম করতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যে গুণী লোকজনের এই রকম ব্যর্থ পরিণতির ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস তার আত্মার দেউলিয়াপনার ইতিহাস। আজকের দিনে এমন কোন্

প্রতিভা সেখানে আছে যার জন্য সে গর্ববোধ করতে পারে? রাজ্যের যত হিটলার আর হামবড়াই রোগগ্রস্ত পিগমী ছাড়া গর্ব করার মতো কিছুই নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলি নবজাগরণের যুগে প্রবেশ করছে। অক্টোবর বিপ্লব হাজার হাজার প্রতিভাবান মানুষকে প্রণোচ্ছল কর্মকাণ্ডে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সামনে যে সমস্ত লক্ষ্য আছে সেগুলি রূপায়ণের পক্ষে তাদের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন বেকারসমস্যা নেই; সর্বত্র, যে যে ক্ষেত্রে মানুষ তার উদ্যম প্রয়োগ করছে, সেখানেই শক্তির অভাব অনুভূত হচ্ছে, যদিও শক্তির এত দ্রুত বৃদ্ধি এর আগে আর কখনও দেখা যায় নি।

আপনারা, যাঁরা বুদ্ধিজীবী, যাঁরা 'সংস্কৃতির কারিগর', তাঁদের বোঝা উচিত যে শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে পেলে আপনাদের সামনে সাংস্কৃতিক সৃজনকর্মের সুবিস্তৃত সুযোগ উন্মুক্ত করে দেবে।

একবার তাকিয়ে দেখুন, ইতিহাস কী কঠিন শিক্ষাই না দিয়েছে রুশ বুদ্ধিজীবীদের! -- তারা তাদের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ নিতে অস্বীকার করল, কিন্তু তার ফল কী হল? -- এখন তারা ব্যর্থ হিংসায় জ্বলেপুড়ে প্রবাসে পচে মরছে। অচিরেই একে একে তারা সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, মানুষের স্মৃতিতে তারা বেঁচে থাকবে বিশ্বাসঘাতক হয়ে।

বুর্জোয়া শ্রেণী সংস্কৃতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, আর অবস্থাটা এমনই যে সংস্কৃতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন না হয়ে সে পারে না -- বুর্জোয়া বাস্তবতা, পুঁজিবাদী দেশগুলির বাস্তব ক্রিয়াকলাপ এই সত্যের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে। সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া পরিকল্পনাকে বুর্জোয়ারা প্রত্যাখ্যান করেছে -- এই একটা ঘটনাই একথা জোর দিয়ে বলার পক্ষে যথেষ্ট যে পুঁজিবাদীরা সমাজবিরোধী লোক, তারা পৃথিবীব্যাপী নতুন হত্যালীলা সংঘটনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরক্ষার উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে রেখে দিচ্ছে; সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হামলা করার জন্য, এই বিশাল দেশকে তাদের নিজেদের উপনিবেশে, নিজেদের বাজারে পরিণত করার বাসনায় পুঁজিবাদীরা যে রকম জোট বাঁধছে তাতে তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের পেছনে শ্রমিক শ্রেণী বহু মূল্যবান সময় ও উপকরণ ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মাণকর্মপ্রক্রিয়া যেহেতু সমগ্র মানবজাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, সেই হেতু বলা যেতে পারে, যে-বিপুল পরিমাণ শক্তি ও উপকরণ নিঃসন্দেহে মানবজাতির সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে

লাগানো যেত, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে তা ইউরোপের পংজিপতিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার খাতিরে ব্যয় করতে হচ্ছে।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে বুর্জোয়ারা ভীতসন্ত্রস্ত, প্রবল ঘৃণায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। তাদের পচাগলা পরিবেশের মধ্যে উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যক জন্ম নিচ্ছে আকাট মূর্খের দল, যাদের নিজেদেরই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কী নিয়ে তারা এত চিৎকার চেঁচামেচি করছে। তাদের একজন আবার 'ইউরোপের শাসক ও কূটনীতিক মহোদয়বৃন্দের প্রতি' এই মর্মে একটি প্রতিবেদন রেখেছে: 'তৃতীয় আন্তর্জাতিককে খর্ব করতে হলে এই মুহূর্তে ইউরোপের উচিত হবে পীতজাতিকে কাজে লাগানো।' একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে যে এই আকাট মূর্খটি তারই মতো কোন কোন 'শাসক ও কূটনীতিক মহোদয়ের' লালিত স্বপ্ন ও অভিলাষ মুখ ফসকে বলে ফেলেছে। আকাট মূর্খটি গলা ফাটিয়ে যে কথাগুলি বলল, এমন কিছু কিছু 'ভদ্রমহোদয়' থাকা আদৌ বিচিত্র নয়, যাঁরা, সত্যি সত্যিই সেই পথে ভাবছেন। ভারত, চীন ও ইন্দোচীনের ঘটনাবলী ইউরোপীয়দের প্রতি, তথা সমগ্র 'শ্বেতকায়' জাতটার প্রতি জাতক্রোধ বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়ক হতে পারে। এটা হবে তৃতীয় আরেক ধরনের ঘৃণা, তাই আপনাদের, মানবতাবাদীদের ভেবে দেখা উচিত এর কোন প্রয়োজন আপনাদের নিজেদের বা আপনাদের সন্তানসন্ততিদের আছে কিনা। জার্মানিতে 'বিশুদ্ধ জাতিতত্ত্বের' প্রচার, অর্থাৎ নামান্তরে সেই জাতিবর্ণবিদ্বেষেরই বাণী প্রচার কতটা মঙ্গলজনক হতে পারে আপনাদের পক্ষে, বলবেন কি? এর একটা দৃষ্টান্তই না হয় দেওয়া যাক:

গয়টের আসন্ন মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে গেরহার্ট হাউপ্‌টম্যান, টমাস মান, ভাল্‌টার ফন্‌-মোলো এবং সোরবোনের প্রফেসর হেন্‌রি লিখ্‌টেনবার্গারের ভাইমারে উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য টিউরিংগিয়ায় নাৎসী দলপতি জাউকেল ভাইমারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলকে নির্দেশ দিয়েছে। উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জাউকেলের অভিযোগ এই যে তাঁরা অনার্য বংশোদ্ভূত।

তাই বলি কি, আর নয়, আপনাদের মীমাংসা করতে হবে এই সাধারণ প্রশ্নটি: আপনারা যাঁরা 'সংস্কৃতির কারিগর' তাঁরা কাদের দলে আছেন? জীবনের নব নব রূপ সৃষ্টির জন্য সংস্কৃতির অদক্ষ শ্রমিকদের শক্তির সঙ্গে আছেন, নাকি মাথার দিক থেকে যে-জাতের পচন শুরু হয়ে গেছে, যে এখন কেবল জাড্যবশত কাজ করে চলেছে, তার অর্থাৎ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লুঠেরাদের জাতধর্ম বজায় রাখার জন্য আপনারা সেই শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করছেন?

চিঠিপত্র

পশ্চিম খনিমজুর ফেডারেশনের নেতা উইলিয়ম ডি. হেউড ও চার্লস ময়ের সমীপে*)

ন্যু ইয়র্ক,
এপ্রিলের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে কোন এক সময়, ১৯০৬

সোশ্যালিস্ট ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের অভিনন্দন জানাই! সাহস সঞ্চয় করুন! ন্যায়বিচার এবং সমগ্র দুনিয়ার নির্যাতিতদের মুক্তির দিন আগতপ্রায়।

সৌভ্রাত্রসহ
ভবদীয়
মাক্সিম গোর্কি

হোটেল বেলেক্লেয়ার

ন্যু ইয়র্ক সংবাদপত্র-সম্পাদকদের প্রতি*)

ন্যু ইয়র্ক,
এপ্রিলের মাঝামাঝি কোন সময়, ১৯০৬

আমার মনে হয়, আমার বিরুদ্ধে এহেন অশোভন আচরণ*) মার্কিনীদের কাছ থেকে আসা সম্ভব ছিল না — তাঁদের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা, তার ফলে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁদের শালীনতার অভাব আছে, এমন সন্দেহ আমি প্রকাশ করতে পারি না। আমার ধারণা এই কাদা ছোঁড়ায় উৎসাহ যুগিয়েছে রুশ সরকারের বন্ধুস্থানীয় কেউ।

আমার স্ত্রী — আমারই স্ত্রী, মাক্সিম গোর্কির স্ত্রী। আমি এবং সে — আমরা দু'জনেই এ প্রসঙ্গে কোন ব্যাখ্যা দিতে যাওয়াকে নিজেদের

মর্যাদাহানিকর মনে করি। অবশ্য যে-কোন লোকের আমাদের সম্পর্কে যা খুশি বলার ও ভাবার অধিকার আছে বৈ কি! তবে আমাদের আছে মানবিক অধিকার — আজেবাজে গালগল্পকে উড়িয়ে দেবার অধিকার।

লেওনিদ বরিসভিচ ক্রাসিন সমীপে*[)]

ন্যু ইয়র্ক,
মে মাসের শুরু, ১৯০৬

...এখন যখন বিষয়টার একটা গতি হতে চলেছে, তখন তার খতিয়ান গোছের একটা কিছু দিতে পারি।

এখানে আমাকে রীতিমতো আনুষ্ঠানিক জাঁকজমকের সঙ্গে হৈচৈ করে অভ্যর্থনা জানানো হয়; প্রথম ৪৮ ঘণ্টা সমস্ত ন্যু ইয়র্ক জুড়ে আমার সম্পর্কে এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা ধরনের রচনার প্রবল স্রোত বয়ে চলে।

'ওয়াল্‌র্ড'*[)] নামে সংবাদপত্র আমার সম্পর্কে যে রচনা প্রকাশ করে তাতে তারা বলেছে, আমি হলাম প্রথমত, দুই বিবাহের অপরাধে অপরাধী, দ্বিতীয়ত - নৈরাজ্যবাদী। কাগজে শিশুদের সঙ্গে আমার প্রথমা স্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে বলা হয়েছে আমি তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, এখন তারা অন্নাভাবে মরতে বসেছে। লজ্জাজনক ঘটনা। সকলে ছিটকে সরে পড়ল। তিনটে হোটেল থেকে আমি বিতাড়িত হলাম। আমি একজন মার্কিন লেখকের বাসায় ঠাঁই পেলাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম এর পর কী হতে পারে। আমার সঙ্গীদের মন মেজাজ বিগড়ে গেল। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হতে লাগল আমাকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করা উচিত। তবে এখানকার সেরা ও প্রভাবশালী কাগজগুলো — 'ট্রিবিউন', 'টাইম্‌স', 'ন্যু ইয়র্ক হেরাল্‌ড' — এ বিষয়ে চুপচাপ। যে কাগজে আমি রাশিয়া সম্পর্কে ১৫টা প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেই 'আমেরিকান'ও তাই। আমাদের প্রাণধারণ করতে হবে। আমরা চারজন, আর এখানে সব কিছু হিসাব হয় ডলারে। 'আমেরিকান'-এর প্রতি আমি যে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি তার ফলে আমি অন্যান্য কাগজের বিরাগভাজন হয়েছি, ওরা আমাকে ল্যাং মারতে লাগল।

আমার কমিটিতে আছেন রুশ ভাষায় অনূদিত সমাজতত্ত্ববিষয়ের লেখক প্রফেসর গিডিংস*[1]; শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়, ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী প্রফেসর মার্টিন; জনৈক পুঁজি সরবরাহকারী — যাঁর নামটা আমার পক্ষে উচ্চারণ করা শক্ত; কোন এক রাবার সিণ্ডিকেটের প্রধান এবং বিভিন্ন স্তরের আরও সব লোক — সবসুদ্ধ জনা পঞ্চাশেক। এঁরা যথেষ্ট চেষ্টাচরিত্র করছেন, আর তাদের দিয়ে কাজও অনেক হবে; তবে এর জন্য শরৎকাল অবধি এখানে আমার থাকা এবং ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে শেখা দরকার। প্রথম কাজটি আমি অবশ্যই করব, দ্বিতীয়টা — চেষ্টা করব। আপাতত কমিটির কাছ থেকে হাজার পঞ্চাশেক ডলার ধার নিয়ে আপনাদের পাঠানোর চেষ্টা করব। শরৎকালে এটা করে উঠতে পারব। প্রথম কিস্তি শিগগিরই পাঠাব, তবে সবটা একসঙ্গে নয়।

কমিটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দীর্ঘকালের জন্য। তার নাম হবে 'রুশজনসুহৃদ'। এখানকার খুব বড় একটা ব্যাঙ্ককে আমরা কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করছি। টাকাকড়ি পরিচালনার ভার আমার ওপরে, আমার ব্যক্তিগত রসিদে দেওয়া হবে। আমাকে অবশ্য পরে উল্লেখ করতে হবে কোন্ সংস্থার হাতে আমি টাকা তুলে দিচ্ছি। সংস্থা প্রাপ্তিস্বীকার করে রসিদ দেবে। কমিটির যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁরা জানেন সেই সংস্থাটা কী ধরনের হবে, কিন্তু তাতে তাঁরা ভীত নন, যদিও তাঁরাও... একেকজন 'নীতিবাদী'। আপনি জানেন, এখানে সব কিছু এত বেশি পরিমাণে আমেরিকান যে কেউ কোন কিছুতে সঙ্কুচিত হবার নয়। এমনকি এখানকার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরাও — রীতিমতো কট্টর প্রকৃতির লোকজন — একটু এদিক ওদিক হয়েছ কি, বুট-টুট সুদ্ধ তোমাকে আস্ত গিলে খাবে। যারা একটু পদে — তারা মার্কিনী নয় — তাদের আবার কিছুই করার সামর্থ্য নেই। এই মুহূর্তে মরিস হিল্‌কুইটের*[1] নেতৃত্বে সোশ্যালিস্টরা সকলে দাবি করছে আমি যেন অতি অবশ্য সর্বত্র সোশ্যালিস্ট হিশেবে আত্মপ্রকাশ করি।

আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি, 'বুর্জোয়ারা কি তাহলে টাকাকড়ি দেবে?' তাঁদের উত্তর: 'না, দেবে না।' 'তা-ই যদি হয়, আমি বরং সে ভূমিকায় নামব না।' 'তাহলে আমরা আমাদের পত্রপত্রিকায় আপনাকে গালিগালাজ করব।' 'আপনারা সে রকম করলে কিন্তু বুর্জোয়ারা আমাকে আরও বেশি টাকাকড়ি দেবে, কেননা তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমি সমাজতন্ত্রী নই, আমি রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য অতিমাত্রায় কাতর —এর বেশি কিছু নয়। আর আপনাদের গালাগাল? — সে সহ্য করব 'খন। জীবনে কীই না

সহ্য করতে হয়েছে আমাকে!' সকলে হো হো করে হাসে, বলে আমি মার্কিনী হতে শুরু করেছি।

শেষ পর্যন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমি বহু টাকা যোগাড় করতে পারব — এটাই হল আসল কথা।

আপনার কাছে আমার অনুরোধ -- রাশিয়ায় কী ঘটছে দয়া করে আমাকে জানান। বড় দুর্ভাগ্য — নিজেকে অন্ধের মতো মনে হচ্ছে! কোন কোন মার্কিনী -- যাঁদের বেশ কদর আছে --- কমিটিতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন স্রেফ এই কারণে যে দুমা না কিসের যেন*) সমাবেশের আয়োজন ঘটতে যাচ্ছে। আমার কাজ, এই হতচ্ছাড়া লোকগুলোকে এখন বুঝিয়ে বলা যে দুমা-টুমা ওসব কিছু নয় — রাবিশ! কিন্তু খবরের কাগজ আমি কেবল থেকে থেকে পাই, আর অন্যান্য পত্রপত্রিকা বলতে আমার কিছুই নেই। পার্টির মধ্যে কী ঘটছে কোন ধারণা নেই।

যেমন ধরুন, সাইবেরিয়ার ওপর আমার কিছু বই দরকার। আমুর ও উস্সুরি অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য আমদানীর ওপরে কোন বই বা প্রবন্ধ আমাকে দিন। আমার ভীষণ দরকার!

হেরমান আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছে, মারিয়া ফিওদরভ্নাও*)। তার ওপর দিয়ে এক চোট গেল বটে!

আমাকে চিঠি লিখবেন এই ঠিকানায়: মিঃ জন মার্টিন (অমুকের জন্য), স্টাটেন আইল্যান্ড, নু্য ইয়র্ক।

আচ্ছা এখানেই চিঠি শেষ করে শুভাকাঙ্ক্ষা জানাই। আন্তরিক ভাবে করমর্দন করি।

ফিরব — কিন্তু কোথায়? --- ডিসেম্বর-জানুয়ারী নাগাদ।

আ.

কন্স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্নিৎস্কি সমীপে*)

নু্য ইয়র্ক,
১মে ১৯০৬

বন্ধুবরেষু

আপনি জানতে চেয়েছেন কবে আমরা ইউরোপে ফিরব। আগেই

আপনাকে লিখেছি, শিগ্‌গির নয় -- অন্তত নভেম্বরের আগে নয় বলেই ত আমার ধারণা। আমার এই যাত্রা থেকে যাতে ভালো কিছু হয় তার জন্য এখানে শরৎকাল অবধি আমার থাকা একান্ত দরকার।

গরমকালে পাহাড়-এলাকায় যাব, সেখানে কাজ করব। এখন, আপনার এখানে আসার ইচ্ছে আছে কি? পাহাড়ের ওপরে একটা পুরো বাড়ি আমাদের সম্পূর্ণ অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে -- বহাল তবিয়তে থাকা যেত। একবার ভেবে দেখুন! সত্যি কথা বলতে গেলে কি, জায়গা ছেড়ে নড়ার জন্য আপনার চেষ্টা করা উচিত। আমেরিকা! যে কারও দেখার সুযোগ হয় না। কৌতূহল জাগায়, বিস্মিত হতে হয়। দারুণ সুন্দর! এত সুন্দর যে আশাই করতে পারি নি। দিন তিনেক আগে আমরা মোটরগাড়ি করে নূ্য ইয়র্কের চারধার ঘুরতে বেরিয়েছিলাম -- আপনাকে বলব কি, হাডসনের উপকূলের সৌন্দর্য যা মধুর, মনে কী গভীর দাগই যে কাটে! এমনকি, বলব, দস্তুরমতো হৃদয়স্পর্শী। আর মোটরগাড়ি এখানে এমন হুহু করে উড়ে চলে যে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে থাকতে হয় - বাতাসে মাথা বুঝি ধড় থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।

আমাকে আগের মতোই ওরা ল্যাং মারার চেষ্টা করে, কিন্তু এ ব্যাপারটায় আমি ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি -- আমি নিজেই এখন সুযোগ পেলে অন্যদের ল্যাং মারার চেষ্টা করি। এরপর যখন আমাদের দেখা হবে তখন আপনি এক মার্কিন জুয়োচোরকে দেখতে পাবেন -- সে লোকটা আমি।

আমি লিখি; সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়ি। ইংরেজি বলতে শিখছি। কিন্তু দাঁত দিয়ে পেরেক টেনে বার করতে গেলে যা অবস্থা হয় এও ঠিক তেমনি কঠিন। প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে মনে রাখতে হয় — এই কট্টর নিয়মনিষ্ঠরা কথা বলে নৈরাজ্যবাদীদের ভাষায় -- নিয়মের কোন বালাই নেই!

যে সব রুশ খবরের কাগজে আমার দরুন মার্কিনীদের গালাগাল করেছে, সেগুলো আমি পড়েছি। দারুণ মর্মস্পর্শী মনে হল।'বিংশ শতাব্দীতে চিঠি লিখে*' আমার হিতৈষীদের ভদ্র ভাবে এই ইঙ্গিত দিয়েছি যে তাদের লক্ষ্যের খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে।

দয়া করে আমাকে শেলীর তৃতীয় খণ্ড পাঠাবেন (ঠিকানা লিখবেন জন মার্টিন, স্টাটেন আইল্যান্ড, নূ্য ইয়র্ক)।

এখানে ইংরেজ কবিদের লেখা পড়তে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। পাঠাবেন ত?

আচ্ছা, সকলকে আমার নমস্কার জানাবেন। তাহলে কী বলেন, আসবেন ত? তাহলে কী চমৎকারই না হত! এখানে কত যে মৌলিক জিনিস আছে আপনি যদি জানতেন!

আর নয়, এখন ঘুমোতে যেতে হয়। মারিয়া ফিওদরভ্না মিটিংয়ে, আমি তৈরি হচ্ছি আরেকটার জন্য — আসছেকাল আছে। দৃঢ় মুষ্টিতে আপনার করমর্দন করি; চাই আপনি যেন আমেরিকায় আসেন।

আপনার সময়ের অপচয় হবে না!

আ.

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে*)

ন্যু ইয়র্ক,
মে'র মাঝামাঝি, ১৯০৬

প্রীতিভাজনেষু

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ, বেশ কতকগুলো কারণে প্যারিসে আসার আমন্ত্রণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হল। ১৯ তারিখে ফিলাডেলফিয়ায় আমার মিটিং, ২১ তারিখে বস্টন, তারপর ন্যু ইয়র্ক ইত্যাদি। আমি যে রকম আশা করেছিলাম এখানে আমার কাজকর্ম তার চেয়ে খানিকটা ধীরগতিতে এগোচ্ছে, ফলে পুলিশ আমাকে যত দিন না তাড়াচ্ছে কিংবা আমি আমার কাজকর্ম যথাসম্ভব ভালো ভাবে সেরে এখান থেকে চলে না যাচ্ছি ততদিন আমাকে এখানে থেকে যেতে হচ্ছে। বর্তমানে আমি একটা সাক্ষাৎকারের বই লিখছি। এতে জার্মান কাইজার ভাসিলি ফিওদরভিচের সঙ্গে*), ফরাসী দেশের সঙ্গে, দ্বিতীয় নিকলাই, জনৈক কোটিপতি, প্রমেথিউস, ভ্রাম্যমাণ ইহুদী, কোন এক মৃতদেহ, পেশাদার পাপী ইত্যাদি কৌতূহলপ্রদ নানা চরিত্রের সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিবরণ থাকছে। আমেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে কাজ কাজ আর কাজ করার জন্য ইচ্ছে করে চারটে মাথা আর ৩২টা হাত পেতে! নিজেকে মনে হয় যেন একটা বোমা, যে বোমা অবিরাম ফাটছে, কিন্তু এমন ভাবে ফাটছে যে তার ভেতরের পদার্থ উড়ে বেরিয়ে গেলে গোলাটা আস্ত থেকে যায়। বলব কি, এ এক

আশ্চর্য দেশ! — যে মানুষ কাজ করতে চায়, কাজ করতে পারে তার পক্ষে এক আশ্চর্য দেশ।

আপনার শুভেচ্ছা কামনা করি। আপনার পত্রিকার অপেক্ষায় আছি বেরিয়েছে কি? আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার।

আমার ঠিকানা: মিঃ জন মার্টিন (অমুকের জন্য), গ্রাইমেস হিল্স, স্টাটেন আইল্যান্ড, নুয় ইয়র্ক।

ইয়েকাতেরিনা পাভ্লভ্না পেশ্কভা সমীপে*)

ফিলাডেলফিয়া,
২৮ মে, ১৯০৬

দেখছ ত কেমন হোটেলে আমি আছি!*) এছাড়া উপায় নেই।

এখানে সমাজতন্ত্রীদের কোন সম্মান নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলে কখনও জায়গা পাবে না। সুতরাং হোটেলের কামরার ভাড়া দিয়ে লোকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে হয় - এখানে সব কিছু মাপা হয় টাকার নিক্তিতে, টাকায় তোমার সাত খুন মাপ, টাকায় সব জিনিস বিক্রি হয়। আশ্চর্য দেশ বটে! - আমি তোমাকে না বলে পারছি না। সকলে প্রত্যক্ষ ভাবে সোনার জন্য অসুস্থ কামনায় আকুল, সময় সময় তাদের এই কুশ্রীতা ন্যক্কারজনক, প্রায়ই করুণ ও হাস্যকর। আমি এখানে আছি আমার সেক্রেটারীর সঙ্গে — বড় মিষ্টি চেহারার এক ছোকরা। আজ অপেরা হাউসে আমার একটা মিটিং আছে। মিটিং-এর পর চলে যাব বস্টনে। সেখানে আছে দুটো।

তারপর চলে যাব অ্যাডিরনডাক্সে*) - - সেখানে শরৎকাল অবধি--বিশ্রাম করব আর কাজ করব। একটা উপন্যাস লিখব।*) 'আমার সাক্ষাৎকার' নামে একটা বই লেখা শেষ করেছি। এতে আছে দ্বিতীয় ভিল্হেল্ম ও দ্বিতীয় নিকলাইয়ের সঙ্গে, ফ্রান্সের সঙ্গে, মার্কিনদেশের একজন রাজা প্রমুখের সঙ্গে ব্যঙ্গপূর্ণ ছোট ছোট আলাপ। এখানকার জীবনযাত্রার ওপর কতকগুলো নক্শার একটা ছোটখাটো বইও*) শুরু করেছি। মোট কথা, কাজ করে যাচ্ছি। এখানে জীবনযাপন করা কঠিন ঠিকই, তবে আকর্ষণীয়ও বটে — নরকের মতো।

আমি আমার সমস্ত পাল তুলে দিয়েছি, দেখেশুনে মনে হয় অনেক দিনের মতো আমাকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে। মস্কোর অ্যাডভোকেট জেনারেলের অফিস আমার বিরুদ্ধে কী মামলা দায়ের করেছে খোঁজ নিয়ে দেখবে কি?

মাক্সিমকে ফরাসী ভাষা শেখাও। ভাষা না জানা খুবই যা-তা ব্যাপার!

আমার নমস্কার। বাচ্চাদের এবং ছোটদের আর সকলকে চুমু।

আমার ঠিকানা: মিঃ জন মার্টিন, গ্রাইমেস হিল্‌স, স্টাটেন আইল্যান্ড, ন্যু ইয়র্ক।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কনস্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্‌নিৎস্কি সমীপে*)

ন্যু ইয়র্ক,
২৭ জুন, ১৯০৬

বন্ধুবরেষু

এই চারটি নক্‌শা*) বিভিন্ন মার্কিন সাময়িক পত্রিকার আগস্ট সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রসঙ্গত একটা সংবাদ হিশেবে আপনাকে জানাতে পারি -- স্টেট্‌স-এর প্রেসিডেণ্ট পদের জনৈক সমাজতন্ত্রী প্রার্থী মিস্টার হার্স্ট আমার জিনিস চুরি করে*) আমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছেন। একজন সামান্য মজুর শ্রেণীর লোকের পক্ষে কতখানি সম্মানের কথা একবার ভেবে দেখুন! রুশ দূতাবাস নাছোড়বান্দা হয়ে দাবি করছে আমাকে যেন এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়; বুর্জোয়া প্রেস নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে এই ধারণা সঞ্চার করার চেষ্টা করছে যে আমি একজন নৈরাজ্যবাদী এবং আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেলসিংফোর্সে টাকা পাঠান।

আগামী পরশুদিন অ্যাডিরন্‌ডাক্সে চলে যাচ্ছি। পুরনো ঠিকানায় লিখবেন।

আ. প.

ইভান পাভ্‌লভিচ লাদিজ্‌নিকভ সমীপে*)

ন্যু ইয়র্ক,
১৭ জুন, ১৯০৬

প্রিয় কমরেড,

চিঠির সঙ্গের চারটি নক্‌শা আগস্টে মার্কিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবে। মার্কিনীরা যদি শুধু মার্কিন দেশ সম্পর্কেই পড়তে ভালোবাসে তাহলে আমি কী করতে পারি!

পিয়াত্‌নিৎস্কিকে আমি বরাবরের মতো প্রাপ্তিস্বীকারের ফেরত রসিদ চেয়ে রেজিস্টার্ড ডাকে লেখার দ্বিতীয় কপি পাঠিয়েছি; কিন্তু এখন পর্যন্ত সে ব্যক্তি কিছুই লিখছেন না। আমি তাই সত্যি সত্যি ভাবতে শুরু করেছি - তার ডান হাতটা অকেজো হয়ে গেল নাকি? কখন কখন দেখা যায়, বন্ধু হয়ত দূরে কোথাও চলে গেল, আর যাকে সে রেখে গেল সে বেচারি শোকে দুঃখে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

ওয়াশিংটনের রুশ দূতাবাস আমাকে আমেরিকা থেকে বার করে দেওয়া যে একান্ত আবশ্যক সেই মর্মে সনির্বন্ধ দাবি জানাচ্ছে, টিকটিকিরা যে কত তার কোন লেখাজোখা নেই! আমাকে খুন করা হবে - এই মর্মে সতর্ক করে দিয়ে লেখা চিঠিপত্র আমি পেয়ে থাকি - সেগুলো দিব্যি ভালো রুশীতেই লেখা। এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে যা-ই হোক না কেন সাফল্য আমার আসবেই। চিঠিপত্রের মারফত কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি। অর্থসাহায্যের আবেদন করে সবগুলি শহরে সার্কুলার পাঠিয়েছি*)।

আগামী পরশু অ্যাডিরনডাক্সে যাচ্ছি। আগস্টের শেষ পর্যন্ত সেখানে কাটাব, জুলাইয়ে নাটক পাঠাব*) - তার আগেও হতে পারে। ওখানে, অ্যাডিরনডাক্সে গিয়েও বিভিন্ন লোকজনকে এবং আমেরিকার সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে আমি চিঠি লিখব।

কখন সখন খবরের কাগজ পাই - কী আনন্দই যে হয় ভাবতে পারেন!

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাফল্য কামনা করি। আমেরিকা সম্পর্কে আরও নক্‌শা লিখব। মোটের ওপর কাজ আমি অনেক করছি, কিন্তু ফয়দা খুবই কম।

কাতেরিনা ইভানভ্‌নাকে আমার নমস্কার। আমরা সকলে ভালো।

আ. পেশ্‌কভ

ইভান পাভ্‌লভিচ লাদিজনিকভ সমীপে*)

অ্যাডিরন্‌ডাক্স,
আগস্টের শেষ, ১৯০৬

প্রীতিভাজনেষু

ইভান পাভ্‌লভিচ, এই হল আপনাদের নাটক*)। এতে আছে তিনটি দৃশ্য, কিন্তু আমার মনে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই — দৃশ্যগুলি বেশ বড় বড়। রাইন্‌গার্ডকে বলতে পারেন, সেপ্টেম্বরে আমি একটা একাঙ্ক নাটক*) পাঠাব।

ওঁকে বলবেন শ্রমিকদের যেন ডাকাত করে না তোলে। মোটের ওপর আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে আপনি থিয়েটারকে মূল্যবান নির্দেশাদি দিতে পারেন।

সম্ভব হলে আলাদা বই হিশেবে 'সাক্ষাৎকার' ছাপানোর কাজ আপাতত স্থগিত রাখুন -- আরও কয়েকটা জিনিস আমি পাঠাব। 'জীবনের প্রভু' রচনাটা একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়া উচিত — কাঁচা লেখা। ওটা হয়ত আমি নতুন করে ঢেলে সাজাব।

মার্কিনীদের সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে*) তার অনুবাদ পাঠালাম — চুক্তিটা তেমন একটা ভালো নয় — তবে এই বা কম কি! অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ভারত, গিনি ইত্যাদি ওদের হাতের মুঠোয়। এখানে আমি ওদের জানিয়ে দিয়েছি যে আমার মুখ্য প্রতিনিধি হলেন আপনারা — পাণ্ডুলিপি ওরা পাবে আপনাদের কাছ থেকে, তার বদলে টাকা পাঠাবে আপনাদের। এই লাভের টাকা আপনাদের আর আমার মধ্যে ভাগাভাগি হবে এই ভাবে: শতকরা ৫০ ভাগ আমার, ৫০ ভাগ পার্টির।

সবিনভ সম্পর্কে আর কী বলব?*) এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা আমার কাছে দুর্বোধ্য।

নাটকটা আমি মার্কিনীদের দেব, যদিও আগে থাকতে বলে দিতে পারি যে ও থেকে এখানে লাভ কিছু হবে না। এখানে আছে থিয়েটার সিণ্ডিকেট। ফরমাশ মতো তাদের মনোনীত লেখকদের দিয়ে নাটক লিখিয়ে মঞ্চস্থ করা হয়। অতি জঘন্য ব্যাপার! স্থূল ধরনের যাত্রা যাকে বলে! ইব্‌সেন, হাউপ্টম্যান একেবারে জমে না। দিন কয়েক আগে কোন এক পত্রিকায় জনৈক ইয়াঙ্কি গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে জনমণ্ডলীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে

যে ইব্‌সেন স্ক্রিবের অনুকরণ করেছেন। এটা ঘটনা। আরেকটা লেখায় প্রমাণ করা হয়েছে যে ইব্‌সেন নৈরাজ্যবাদী, তাই তার নাটক আমেরিকায় মঞ্চস্থ করা উচিত নয় — যেন মঞ্চস্থ করা হয় আর কি!

'সাক্ষাৎকার' আমি একটা সাময়িক পত্রে ৫ হাজার ডলারে বেচে দিয়েছি। মূল চুক্তিপত্রটা আমি যখন আপনাকে পাঠাব তখন ঐ ফার্মকে আমার সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রস্তাব দেবেন। এখানে লোকে আমার লেখা খুব পড়ে —কিছু দিন আগে 'ফোমা'র*) সপ্তদশ সংস্করণ বেরিয়েছে — একলালীন ৫ হাজার কপিতে। এটা খুবই বেশি! 'বেল আমি' এখানে বিক্রি হয় সাকুল্যে ৬ হাজার কপি, আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের 'জাংগল' — মাত্র ৩ হাজার! তাতেই আমেরিকার সর্বত্র দারুণ হৈচৈ পড়ে যায়!

মোটের ওপর বইয়ের অবস্থা এখানে ভালো নয়। লজ্জাজনক! রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী সাহিত্য যত কপিতে প্রকাশিত হয় এখানকার সমাজতন্ত্রীদের কাছে সে সংখ্যা উল্লেখ করলে তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

আমি আপনাদের বলি কি জানেন? আমাদের এত দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও স্বাধীন আমেরিকা থেকে আমরা অনেক এগিয়ে আছি! এটা বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের চাষী ও মজুরদের সঙ্গে এদের কৃষক-শ্রমিকদের তুলনা করলে।

কী আকাট মূর্খ রাজ্যের যত তুভেরস্কায়*) আর তার মতো রুশী লেখকরা, যারা আমেরিকার ওপর লিখছে!

সে যাক গে, এ হল দর্শনশাস্ত্রের কথা। বাস্তবের কথা যদি বলেন, বেজায় ক্লান্ত।

শিগগিরই আমি আমার উপন্যাস শেষ করছি।*) মোটেই সুবিধের হবে বলে মনে হয় না।

নমস্কার জানবেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমরা সবাই ভালো।

আ. পেশ্‌কভ

ইউশ্‌কেভিচের 'দিনা' আর চিরিকভের উপন্যাস পাঠাবেন।

কুশল কামনা করি।

কন্স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্নিৎস্কি সমীপে*)

অ্যাডিরন্ডাক্স,
আগস্টের শেষ, ১৯০৬

বন্ধুবরেষু

লাদিজ্নিকভকে আমার 'দুশমন' নাটক পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছি তাঁর সুবিধেমতো যে-কোন সময় যেন আপনাকে পাঠিয়ে দেন। 'মা' উপন্যাস শেষ করতে চলেছি।*) সরাসরি আপনার নামে পাঠাচ্ছি না, কেননা আশঙ্কা হচ্ছে, নাও পেঁছুতে পারে। আপনারা বড় বেশি হৈ-হট্টগোল ও হাঙ্গামার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন,*) সম্ভবত কর্তৃপক্ষ আপনার চিঠিপত্র খুলে পড়ে।

এখানে কিন্তু শিগগির কোন বিপ্লব ঘটছে না, যদি না আজ থেকে বছর দশেক বাদে স্থানীয় কোটিপতিদের ভোঁতা মাথার ওপর তা ভেঙে পড়ে। ওঃ কী দারুণ দেশ! এরা যে এখানে কী ছাই করে, কী ভাবে কাজ করে, এদের মধ্যে কত যে শক্তি আর উৎসাহ, অজ্ঞতা, দম্ভ আর বর্বরতা! আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, শাপ-শাপান্ত করি, আমার বড় বিশ্রী লাগে, আবার ফুর্তিও লাগে -- ওঃ কী মজাই যে লাগে! সমাজতন্ত্রী হতে চান? এখানে চলে আসুন। সমাজতন্ত্রের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এখানে ভীষণ ভাবে প্রকট, জাজ্বল্যমান।

নৈরাজ্যবাদী হতে চান? এক মাসের মধ্যে তা হয়ে যেতে পারেন, এ আমি আপনাকে বলে দিতে পারি।

মোটকথা, এখানে এসে লোক স্থূলবুদ্ধি, লোভী প্রাণীতে পরিণত হয়। এই বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য দেখামাত্র তারা দাঁত বার করে এবং যতক্ষণ কোটিপতি না হতে পারে কিংবা অনাহারে ইহলীলা সংবরণ না করে ততক্ষণ এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

আর বাইরে থেকে যারা বসবাস করার জন্য এখানে এসেছে! তারা ভয়ঙ্কর! যারা মার্কিন দেশকে তৈরি করেছিল এই বহিরাগতরা আদৌ সেই শ্রেণীর লোক নয়। আজকের এরা স্রেফ ইউরোপের আবর্জনা, তার জঞ্জাল, অলস, ভীরু, অথর্ব, উদ্যমহীন ছোট মাপের মানুষ -- আর এই উদ্যম না থাকলে এখানে কিছুই করা যায় না। একালের বহিরাগতদের জীবন গড়ে তোলার ক্ষমতা নেই — তারা কেবল জানে হাতে-গরম, নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত জীবনের সন্ধান। বাইরে থেকে এরকম যারা এখানে বসবাস করার জন্য

আসছে তাদের সাগরে ডুবিয়ে মারাই বরং ভালো — আমি এখানে সিনেটর হলে এই কর্মে একটা খসড়া প্রস্তাব ভোটদানের জন্য আনতাম।

একটা অদ্ভুত তথ্য আপনারা জানেন কি? — আমেরিকায় ইংরেজরা আশ্চর্য রকমের তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যেই দেখা যায় স্নায়বিক দৌর্বল্য, আত্মহত্যার হিড়িক, এরা হয়ে পড়ে একেবারে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। সেদিক থেকে ইহুদীদের কৃতিত্ব আছে, আইরিশরাও বেশ টিকে যায়।

আমরা এখন আছি অ্যাডিরনডাক্স নামে একটা অঞ্চলে — যতদূর মনে হয়, আমার শেষ চিঠিতে আপনাকে আমি সে কথা বলেছিলাম কিন্তু সে চিঠিরও কোন উত্তর পাই নি। পত্রবহুল গাছপালার জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়পর্বত। সর্বোচ্চ বিন্দু ১,৫০০ মিটার। সেখান থেকে চোখে পড়ে হ্রদের দৃশ্য। নেহাৎ মন্দ নয়। আমাদের এখান থেকে এক মাইল দূরে একটা ফিলজফি স্কুল। চারধারে প্রফেসারদের বাস। ভ্যাকেশনের সুযোগ নিয়ে যে কোন বিদ্যার ওপর লেকচার দিয়ে বেড়ান এঁরা। সপ্তাহে ১০ ডলার দক্ষিণা দিয়ে ছয়টা লেকচার শোনা যায় · এর জন্য খাওয়াও পাবেন অবশ্য · তবে প্রধানত ঘাসপাতা। শ্রোতৃবৃন্দ বসে একটা ছোট্ট হলঘরে অসহ্য! — বক্তৃতা দিচ্ছেন বেঁটেখাটো চেহারার প্রফেসর মরিস - অসহ্য! 'মেটাফিজিক্স, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন! মেটাফিজিক্স কী? প্রতিটি শব্দ, তা সে যে শব্দই হোক না কেন -- একেকটি প্রতীক, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন! আমি যখন বলি মেটাফিজিক্স, তখন মনে মনে কল্পনা করি একটি সিঁড়ি -- সিঁড়িটা মাটি থেকে উঠে একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে মিলিয়ে গেছে। আমি যখন বলি সাইকোলজি তখন আমার সামনে দেখতে পাই এক সারি থাম।' বাস্তবিক বলতে গেলে কি ইচ্ছে হয় লোকটার মুণ্ডুতে দড়াম করে বসিয়ে দিই থামের বাড়ি। জেম্‌স.*⁾ চ্যানিং এবং আরও কারও কারও সঙ্গে আমার আলাপ হয়। জেম্‌স চমৎকার বুড়োমানুষটি, কিন্তু সে আমেরিকান বটে। ওঃ, চুলোয় যাক সব! মজার লোক বটে সব, বিশেষ করে যখন নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে।

আমি পাঁচ হাজার ডলারে 'আমার সাক্ষাৎকার' একটা পত্রিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। আপনার টাকার প্রয়োজন আছে কি? আমার নাটকও বিক্রি করব।

বলি কি, একবার অন্তত দুটো ছত্র লিখুন।

সঙ্গের চিঠিটি ইয়েকাতেরিনা পাভ্‌লভ্‌নাকে পাঠিয়ে দেবেন, সেও

কতকাল যে আমাকে চিঠি লেখে নি! জানি না কোথায় আছে, ছেলেমেয়েরা সব বেঁচে বর্তে আছে কিনা।

আপনাকে যেন কখনও আমেরিকায় না দেখি — এটা আমার একটা শুভকামনা — বিশ্বাস করুন।

আমার মতো একজন চপলমতি লোকের কাছে পৃথিবীটা একটা ফুর্তির জায়গা। আর আপনার কাছে? অর্থাৎ, আপনি কেমন বোধ করছেন?

আচ্ছা, আরও একবার আপনার শুভ কামনা করি।

ইচ্ছে করে, আপনার সঙ্গে কথা বলি। আসল কথা কি জানেন, একমাত্র আপনার সঙ্গেই যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় — এটা আমি বেশ জানি।

লোকজন বড় বেশি! কিন্তু দুঃখের কথা, মানুষ খুব কম।

ফের দেখা হবে। সঙ্গের চিঠিটা ফিন্ ভাষায় প্রকাশিতব্য রচনাসংগ্রহ প্রসঙ্গে। লুকিয়ে রাখবেন।

আ.

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে*)

অ্যাডিরন্ডাক্স,
আগস্টের শেষ, ১৯০৬

প্রীতিভাজনেষু,

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ, পেরস্কিকে নিয়ে আপনি বৃথাই এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত -- তাঁর বেশ ভালো জানা আছে যে আমার লেখার অনুবাদের ব্যাপারে বার্লিনে লাদিজনিকভের কাছে আবেদন করতে হবে। তৃতীয় সংখ্যা পেয়েছি।*) এর ত্রুটি -- গোর্কির আধিক্য। অনুগ্রহ করে বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করে এই লেখকের লেখা ছাপাবেন না! 'ইহুদী প্রশ্ন' রচনায় আশ্চর্য রকমের কিছু বিকৃতি আছে।

তিন অঙ্কের নাটক 'দুশমন' লিখেছি — মন্দ নয়, ফুর্তির জিনিস আছে। যদিও এটা ঠিক সেই ভালো নাটক নয় যা একদিন আমি লিখব। ১০ পাউন্ড ওজনের উপন্যাস রচনার কাজ শেষ করছি। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর।

কাজ করে যাচ্ছি। অসভ্য জংলী লোকের মতো লোলুপ দৃষ্টিতে মার্কিন

সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করছি। মোটের ওপর বড় বিশ্রী লাগে, কিন্তু মাঝে মাঝে পাগলের মতো হো-হো করে হেসে উঠি। এখন আমার মনে হচ্ছে আমেরিকার ওপর কিছু লেখার শক্তি আমার আছে — এমন কিছু লেখার, যার জন্য ওরা আমাকে তাড়াবে।

বলব কি, আশ্চর্য জাত! আমি এখানে যা-ই ছাপিয়ে প্রকাশ করি না কেন, এরা তৎক্ষণাৎ আপত্তি তুলবে -- শুধু তা-ই নয়, যেই আপত্তিগুলো একটু বেশি রূঢ় ধাঁচের সেগুলো আবার আমি যেখানে থাকি সেই ফার্মের বেড়ার গায়ে সেঁটে দেয়। পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ঘাসফড়িংয়ের মতো লাফিয়ে এক পাশে সরে যায়। বেশ মজা লাগে। সবচেয়ে ভালো ওজর আপত্তিগুলো আসে সিনেটরদের কাছ থেকে।

নভেম্বরে সম্ভবত আমি প্যারিসে থাকব।

এখনকার মতো বিদায়।

উপন্যাসটা শেষ হয়ে গেলে আপনাকে 'মার্কিন জীবনযাত্রার' ওপর একটা ছোট গল্প পাঠাব -- দেখবেন, সত্যি বলছি!

আপনি ও আপনার সহধর্মিণী আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আ. পেশ্‌কভ

পের্‌স্কি এবং তার মতো আরও যাঁরা আছেন তাঁদের সকলকে পাঠানো উচিত বার্লিনে - অবশ্য আপনার যদি আলস্য না থাকে। তবে সেটা হবে কোন লোককে জাহান্নামে পাঠানোরই সামিল অতি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পন্থা।

আ.

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে¹⁾

অ্যাডিরন্‌ডাক্স,

সেপ্টেম্বরের শুরু (অন্তত ৬ সেপ্টেম্বরের পরে নয়), ১৯০৬

শরীরটা কেমন যেন গোলমাল শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমার জীবনযাত্রায় বা কাজে কোন ব্যাঘাত হয় না। উপন্যাস লিখি,*⁾ আমেরিকানদের সঙ্গে রিসেপশনেরও বন্দোবস্ত করি।

দুমার ব্যবহারে তারা মোহিত। এরা বড় বড় অঙ্ক নিয়ে কারবার করতে অভ্যস্ত, তাই ৪৫০ জন লোকের মধ্যে মাত্র তিন জন বিশ্বাসঘাতককে পাওয়া গেল দেখে এরা অবাক। বড় বড় কারবারী আর শাঁসাল লোকজন বলাবলি করছে যে রাশিয়ায় যদি জার উচ্ছেদ হয় তাহলে তার জায়গায় যে সরকারই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন মার্কিনীরা তাকে টাকা দেবে। রুশীরা যে স্বশাসনে সক্ষম এটা এখন এদের কাছে স্পষ্ট।... এই জাতটা যে কী রকম একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন আর অজ্ঞ সে সম্পর্কে কোন ধারণা যদি আপনার থাকত! অবাক হয়ে যেতে হয় গল্পকথার মতো।

এখন আবার তারা পত্রপত্রিকায় আমাকে গালাগাল দিতে শুরু করে দিয়েছে -- এখানকার একটা পত্রিকায় 'পীত দানবের পুরী' নাম দিয়ে নু্য ইয়র্ক সম্পর্কে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি। লেখাটা তাদের পছন্দ হয় নি। সিনেটররা তাদের আপত্তি লিখছেন, শ্রমিকরা হেসে কুটিপাটি। একজন ত প্রকাশ্যে তার বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: আগেও লোকে উঠতে বসতে আমেরিকানদের গালাগাল করেছে, কিন্তু তা করত আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবার পর; এখন কিনা লোকে এখানে থেকেও তার প্রশংসা করে না -- এটা কী রকম ব্যাপার? খুব সম্ভব শেষকালে আমাকে ওরা এখান থেকে তাড়াবে। কিন্তু টাকা ঠিকই দেবে। আমি হলেম গিয়ে বেজায় জেদি দিদিমার নাতি কি না!

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ, আপনি যদি বেশ আগ্রহ জাগানোর মতো লেখা, নিদেনপক্ষে রাশিয়ার খবরের কাগজের কাটিংও আমাকে যোগাতে পারতেন! আমার মনে হয় সেরকম জিনিস আপনার কম নেই -- তাই না? এদিকে আমরা এখানে রাশিয়ার খবরের কাগজের জন্য হা পিত্যেশ করে মরছি। খবরের কাগজ আমি পাই, কিন্তু পথে কোথায় যেন অনেক দিন পড়ে থাকে।

আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে মিলে আমি কোন মতলবই পাকাচ্ছি না - আপনি খামোকা কবিতা লিখে আমার ওপর এক চোট নিলেন। আপনাকে বলি, ইউরোপীয়দের আমি কেন যেন বিশ্বাস করি না; আর আনাতোল ফ্রাঁসের চেয়ে সুসম্পন্ন ইউরোপীয় আর কেউ আছে কি? তাঁর সন্দেহবাদ আমাকে গ্রাম্য বাবুর নতুন জুতোর মস্‌মস্‌ আওয়াজ মনে করিয়ে দেয় -- এর জন্য ফ্রাঁস যেন আমাকে ক্ষমা করেন! যাই হোক না কেন, বুদ্ধি কিন্তু তাঁর খরশান আর কলম সূক্ষ্ম। কিন্তু ঐ যে বললাম, তাঁর সন্দেহবাদ! অমন শোভন, মার্জিত রূপে তাঁকে তুলে ধরার কোন প্রয়োজন নেই।

সমুদ্র পাড়ি দেব শরৎকালে, অক্টোবরে, কিন্তু কোথায় যাব জানি না। কাজকর্ম যদি ভালো চলে তাহলে আরও আগে আসব। আপনার সঙ্গে দেখা অবশ্যই হবে। আপনার সহধর্মিণীকে আমার নমস্কার, রুশ ও গ্যালিক কমরেডদের -- অভিনন্দন। পঞ্চম সংখ্যার জন্যও*) কিছু পাঠানোর চেষ্টা করব।

ভবদীয়

আ. পেশ্‌কভ

ইয়েকাতেরিনা পাভ্‌লভ্‌না পেশ্‌কভা সমীপে*)

অ্যাডিরন্‌ডাক্স,
আগস্টের শেষ বা সেপ্টেম্বরের শুরু, ১৯০৬

তোমাকে চিঠি পাঠানোর পর তোমার চিঠিও পেলাম - চিঠির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ফোটোগ্রাফও। ঠিক সময় মতন!

মাক্সিমের চোখদুটো আকর্ষণ করার মতো -- নিশ্চয় সুন্দরও! ওকে বলো, সত্যিকারের রেড ইন্ডিয়ান তীর ধনুক এনে দেব, যদি খুঁজে পাই। আর কিছু আমেরিকান প্রজাপতি -- এখানকার প্রজাপতিগুলো ভারী আশ্চর্যের। এছাড়া এখানে আর কিছু নেই, ভালো বলতে যা কিছু - সব ইউরোপ থেকে। সৌন্দর্যের অর্থ যে কী আমেরিকা নিজে তা বোঝার পক্ষে এখনও বড় ছোট। আমি যেখানে আছি সে জায়গাটা কানাডার প্রায় সীমান্তে --- ওখানকার দুখবোর*) ধর্মসম্প্রদায় ও রেড ইন্ডিয়ানদের দেখতে খুব সম্ভব একবার ওখানে যাব। রেড ইন্ডিয়ান আর নিগ্রো --- এদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লোকজন। খোদ মার্কিনীদের কথা যদি বল, তারা কৌতূহল জাগায় কেবল তাদের অজ্ঞতার কারণে -- অবাক হয়ে যেতে হয় তাদের অজ্ঞতায়! -- আর তাদের অর্থলোলুপতা দেখে। বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে এই অর্থলোলুপতা।

এখন তোমার চিঠি পাবার পর আমি ভালো বোধ করছি -- এর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি আমার ভুল বোঝার অবসান ঘটিয়েছ - - বড় ভারী হয়ে মনের ওপর চেপে বসে ছিল, দেখা যাচ্ছে অপ্রয়োজনীয়ও ছিল বটে। কাতিয়া*) যদি আমাদের ছেড়ে চলে না যেত তাহলে আমি এখন

আনন্দই বোধ করতাম। কিন্তু থাক, ওর কথা আর বলব না। এটাও অপ্রয়োজনীয়। মৃত্যুর ওপরে কারও হাত নেই।

তোমার কাছে আমার অনুরোধ — ছেলেটাকে দেখো। কেবল ছেলের বাপ হিশেবে বলছি না, একজন মানুষ হিশেবে বলছি। আমি যে উপন্যাস এখন লিখছি -- আমার 'মা' উপন্যাসের নায়িকা একজন বিধবা, কোন এক বিপ্লবী শ্রমিকের, মানে জালমভের মা — বলছে, 'জগতের বুকে সন্তানেরা পা বাড়াচ্ছে, পা বাড়াচ্ছে নতুন সূর্যের দিকে, নবজীবনের পথে।... আমাদের সন্তানেরা পা বাড়াচ্ছে সমস্ত মানুষের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ ক'রে, তারা পা বাড়াচ্ছে জগতের বুকে - তাদের ছেড়ে যেয়ো না, ফেলে দিয়ো না বিনা যত্নে নিজেদের রক্তমাংস!'

পরে তার কার্যকলাপের জন্য যখন তাকে বিচার করা হবে তখন যে ভাষণ সে দেবে তাতে সমগ্র বিশ্ব-প্রক্রিয়াকে সে বর্ণনা করবে সত্যের পথে সন্তানদের এক শোভাযাত্রা বলে। সন্তানদের, একথা মনে রেখো! এর মধ্যেই নিহিত আছে জগতের ট্র্যাজিডির নিদারুণ তীব্রতা। এই বিরাট ধারণা চিঠিতে তোমাকে বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে শক্ত—জিনিসটা বড় বেশি জটিল; তা থেকে বেরিয়ে আসছে আরও একটা চিন্তা- সেটাও অত্যন্ত গভীর — সংস্কারবাদী আর বিপ্লবীদের পার্থক্য, মানুষের পক্ষে সর্বনাশা সেই প্রভেদ, যা আমরা লক্ষ করতে পারছি না, যা আমাদের দারুণ ভাবে বিভ্রান্ত করে ফেলছে।

তোমাকে একটা কথা আমি বলতে চাই -- এখানে এসে আমি অনেক জিনিস বুঝতে পারলাম; প্রসঙ্গত, বুঝতে পারলাম যে এর আগে পর্যন্ত আমি বিপ্লবী ছিলাম না। আমি বিপ্লবী হয়ে উঠছিলাম মাত্র। যাদের আমরা বিপ্লবী বলে ভাবতে অভ্যস্ত তারা আসলে সংস্কারবাদী মাত্র। বিপ্লব সম্পর্কে যে বোধ, তার গভীরতাসাধন প্রয়োজন। আর সেটা সম্ভবও!

আমার মনে হয়,তুমি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা দৃষ্টিভঙ্গির লোকজনের মহলে অনেক ঘোরাফেরা করেছ এবং সম্ভবত সুপরিচিত চিন্তার ধারায়, বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে লোকমহলে পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিমধ্যে কতকটা অভ্যস্তও হয়ে গেছ -- তাই, আমার ধারণা, আমার কথাগুলো তোমার কাছে অদ্ভুত শোনাবে, প্রচলিত মতবিরোধী মনে হবে। দেখা হবে — তখন হয়ত আমার কথা বুঝতে পারবে, আর যদি সত্য উপলব্ধি করতে নাও পার, আশা করি অন্তত নিজে বোঝার চেষ্টা করবে।

এখানে একটা মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আমার আছে — মামলাটা

স্টেট্‌সের জনৈক সম্ভাব্য প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীর বিরূদ্ধে*)। ইচ্ছে হচ্ছে প্রতারণার জন্য তার বিরূদ্ধে মামলা দায়ের করি।

তুমি যদি জানতে, যদি দেখতে পেতে এখানে কী ভাবে আমি জীবন যাপন করছি! দেখেশুনে তুমি হয়ত হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে, কিংবা স্তম্ভিত হয়ে যেতে। আমি এদেশে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। একটা সংবাদপত্র লিখেছে: 'প্রকৃতিগত ভাবে নীতিজ্ঞানবিবর্জিত এই বদ্ধ উন্মাদ, নৈরাজ্যবাদী রুশীটির ধর্ম ও বিধিবিধানের প্রতি এবং পরিশেষে, জনসাধারণের প্রতি যে ঘৃণা, তা সকলকে অবাক করে দেবার মতো; আর আমাদের দেশের ওপর যে কলঙ্ক ও অপমানের বোঝা সে চাপিয়ে দিচ্ছে তেমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে এদেশের কখনও হয় নি।' আরেকটা খবরের কাগজে আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য সিনেটের প্রতি এক আবেদন ছাপা হয়েছে। বটতলার পত্রপত্রিকাগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যে বাড়িতে আমি আছি তার গেটের গায়ে আমার বিরূদ্ধে আরও বেশি কড়া কড়া কথা লিখে সেঁটে দেয় ওরা। এমনকি তোমাকেও গালিগালাজ দেয়!

এসব সত্ত্বেও -- একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ করবে, পত্রপত্রিকা আমার কাছ থেকে প্রবন্ধ দাবি করছে, লেখার জন্য সাধাসাধি করছে। এটা তাদের পক্ষে লাভজনক, আর লাভই এখানে সর্বস্ব।

তোমাকে লিখেছিলাম কি যে নূ্য ইয়র্ক সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ*) ছাপা হওয়ার পর আমার বিরূদ্ধে ১,২০০টিরও বেশি প্রতিবাদ এসেছে? সিনেটররা পর্যন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমার সাক্ষাৎকার এবং আমেরিকা সম্পর্কে অন্যান্য প্রবন্ধ ছাপা হলে কী যে হবে, বুঝতে পারছি।

প্রসঙ্গত, ইউরোপেরও খুব একটা বুকের পাটা নেই। ভিল্‌হেল্‌মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার - 'যে রাজা নিজের ধ্বজা ঊর্ধ্বে ওড়ান' — কেবল জার্মানিতে ও অস্ট্রিয়ায় কেন, এমনকি জোরেস তাঁর 'মানবতাবাদে'ও*) ছাপাতে সাহস পেলেন না! রোমে 'লা ভিতা'*) ছাপাল বটে, কিন্তু বাদসাদ দিয়ে। এই হল তোমার প্রেসের স্বাধীনতা! এই নাকি ইউরোপীয় সংস্কৃতি! এখানে বলতে হয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটা কিন্তু খুবই অকিঞ্চিৎকর জিনিস। আগে থাকতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোটিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার — 'প্রজাতন্ত্রের কোন এক রাজা' -- আমার ওপর এক চোট ঝড়ঝাপটা ডেকে আনবে।

আমি আছি বনের ভেতরে খুব নির্জন একটা জায়গায় -- সবচেয়ে কাছের শহর — এলিজাবেথটাউন থেকে ১৮ মাইল দূরে। কিন্তু

আমেরিকানরা আমাকে দেখতে এখানে আসে। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ভয় পায় -- আমার সঙ্গে পরিচিতি মানে বদনাম কামানো। বনের ভেতরে ঘুরে বেড়ায় — দৈবাৎ যদি একবার সাক্ষাৎ মিলে যায়। আমরা পাঁচ জন এক সঙ্গে আছি: আমি, জিনা, একজন রুশী, যে আমার সেক্রেটারী হিশেবে আমার সঙ্গে এসেছে, একজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক*), আর বয়স্থা চিরকুমারী চমৎকার মানুষ মিস ব্রুক্স। আমাদের কোন চাকরবাকর নেই, আমরা আমাদের নিজেদের খাবার রান্না করি, সব কাজ নিজেরা করি। আমি বাসন ধুই, জিনা ঘোড়ায় চড়ে শহরে রসদ আনতে যায়, প্রফেসর চা, কফি ইত্যাদি বানান। কখনও কখনও আমিও খানা পাকাই -- মাংসের পিঠে বানাই, বাঁধাকপির সুপ ইত্যাদি এটা ওটা রান্না করি। আমরা উঠি সকাল সাতটায়, আটটায় আমি কাজে বসে যাই, বারোটা পর্যন্ত কাজ করি। একটায় দুপুরের খাবার, চারটেয় চা, আটটায় রাতের খাবার। তারপর বারোটা পর্যন্ত কাজ করি। রুশী কমরেডটি পিয়ানো বাজনায় সঙ্গীত বিদ্যালয় শেষ করেছে, চমৎকার বাজায়। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কন্সার্ট। এখন আমরা স্ক্যান্ডিনেভীয় বাজনা নিয়ে গ্রিগ, ওলে ওল্সেন ও ল্যুড্ভিগ শিট নিয়ে চর্চা করছি।

আমি আমার সমস্ত জিনিস বিভিন্ন মার্কিন পত্রিকার কাছে বেচে দিয়েছি, শব্দ পিছু ১৬ সেণ্ট হিশেবে আগে থেকে শর্ত হয়েছে -- তার মানে আমাদের ৩০,০০০ শব্দের এককেটি ফর্মার জন্য প্রায় ২ হাজার ডলার করে। কাজ করতে করতে বড় তাড়াতাড়ি সময় কেটে যায়।

আমি আর সকলের থেকে আলাদা থাকি একটা বিরাট চালাঘরে। তার দু'পাশের দেয়াল কাচের ফ্রেমের, নড়ানো যায়। যখন ঘুমোতে যাই ওগুলো উঠিয়ে নিই। লেখার টেবিলে বড় বেশি বসে থাকার ফলে পিঠ ব্যথা করে, কখন কখন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। খুব রোগা হয়ে গেছি, রোদে পুড়ে গেছি, মাথা কামিয়েছি। তবে মোটের ওপর স্বাস্থ্য চলনসই।

আমাদের এখান থেকে কিছু দূরে একটা ফিলজফি স্কুল আছে। স্কুলটা কাজ করে কেবল গরমের সময় -- বছরে তিন মাস। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডিউই। কোন ধরাবাঁধা পাঠক্রম নেই -- দৈবাৎ এ ও বক্তৃতা দিয়ে যায়। দিন কয়েক আগে বক্তৃতা দিলেন জেম্স — ইনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ। এখানে লোকে তাঁকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে শ্রদ্ধা করে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, বেশ চমৎকার বৃদ্ধ। গিডিংস একজন সমাজতত্ত্ববিদ — খুবই ভালো; আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে।

ইংরেজ সংস্কৃতি আশ্চর্য রকমের আকর্ষণীয়। তার মধ্যে আমাকে যেটা অবাক করে তা হল পরিপূর্ণ আত্মিক দাসত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। শবদেহ তাদের জীবনের নিশ্বাস। অসভ্য জংলীদের মতো কর্তাভজা তাদের স্বভাব।

পরশু দিন জন মার্টিন নামে একজনের বাড়িতে শ'খানেক লোকে এসে জড় হবে — মনে হয় ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট। দেখব। তারা আমার এখানে চা পান করতে আসবে।

এই হল আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিন্তার ধারা। সব ভাবনাচিন্তা অবশ্যই নয়! এখানে ভাবনাচিন্তা কাজ করে মহা উৎসাহের সঙ্গে। সব সময় আমি আছি একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। আমার সামনে অশেষ অঢেল কাজ — অন্ততপক্ষে ১৬ বছরের মতো ত বটেই।

আর নয়, এখন আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে হয় — এই হল আমার উপলব্ধি। তড়িঘড়িতে লেখা আমার এই লেখাগুলোর কোনটার বিশেষ মূল্য নেই।

আচ্ছা, এবারে আসি, দরদী বন্ধু আমার। সব কিছুর জন্য আবার ধন্যবাদ তোমাকে। মনপ্রাণ খুলে।

এই চিঠি তোমার কাছে পেশছুতে ১৫ দিন লাগবে। উত্তরে তুমি যে চিঠি লিখবে সেটাও আমি পাব ১৫ দিন বাদে।

লিখো। তবে অক্টোবরের গোড়ায় আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি — এটাই স্থির হয়েছে। তুমি তাই নীচের ঠিকানায় লিখো:

Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow, Berlin W. 15 Uhlandstr. 145.

ইভান পাভ্‌লভিচ পাঠিয়ে দেবেন, উনি সব সময় জানেন কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে।

আচ্ছা, আসি! তোমাকে দেখতে পেলে বড় আনন্দ পাব। মাক্সিমকে আমার অনেক চুমো দিও। রেড ইন্ডিয়ানদের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড পেয়েছে ত ও? আমি প্রায়ই পাঠাতাম।

শুভেচ্ছা, আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবে। মন শক্ত করো। এটা সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে দামী।

ইয়েলেনাকে, পাভেল পেত্রোভিচকে আর সমস্ত পুরনো বন্ধুবান্ধবকে আমার নমস্কার জানাবে।

আ.

টীকা-টিপ্পনী

১৯০৫ সালের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের 'অপরাধে' ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাক্সিম গোর্কি'র ওপর নতুন করে গ্রেপ্তারী পরওয়ানার আশঙ্কা দেখা দিতে বলশেভিক পার্টি'র নির্দেশে তিনি রাশিয়া পরিত্যাগ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় চলে যান। তাঁর ওপর যে কাজের ভার ছিল তা হল বিদেশের শ্রমিকদের কাছে রুশ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সত্য বিবরণ দেওয়া এবং বলশেভিক পার্টি'র বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য অর্থসংগ্রহের উপায় সংগঠন করা। বিপ্লবকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে গুলি করে হত্যা, মিলিটারী ট্রাইবুনাল আর পিটুনি অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য রাশিয়ার জারকে যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, পশ্চিমে থাকাকালে মাক্সিম গোর্কি তার বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে কতিপয় প্রবন্ধ, আবেদনপত্র ও খোলা চিঠি লেখেন। আমেরিকায়, বিশেষত ন্যু ইয়র্কে অসংখ্য সভা-সমিতিতে লেখক রাশিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে ভাষণ দেন, মার্কিন শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে রাশিয়ার বিপ্লব সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানান।

গোর্কি'র জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার জন্য মার্কিন বুর্জোয়া প্রেস উঠে-পড়ে লেগে গেল। ন্যু ইয়র্কের যে হোটেলে লেখক বাস করতেন সেখান থেকে তিনি বহিষ্কৃত হলেন, অন্যান্য হোটেলের মালিকেরাও তাঁকে ঘর দিতে রাজি হল না। গোর্কি তখন বাধ্য হয়ে ন্যু ইয়র্কে মার্টিন দম্পতির ব্যক্তিগত বাড়িতে উঠে এলেন। এলিজাবেথটাউন থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অ্যাডিরনডাক্স পাহাড়ের ওপর এই মার্টিন-দম্পতির বাগান বাড়িতে গোর্কি ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকাল কাটান এবং অক্লান্ত কাজ করে যান। আমেরিকায় থাকাকালে মাক্সিম গোর্কি 'মার্কিন মুলুকে' এবং 'আমার সাক্ষাৎকার' শিরনামায় একটি পুস্তিকামালা লেখেন — এগুলিতে লেখক

ইউরোপ ও আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার সার কথা ব্যক্ত করেন, তাঁর পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'মা'ও তিনি এখানেই লেখেন।

'মার্কিন মুলুকে'

আদিতে 'পীত দানবের পুরী', 'একঘেয়েমির রাজত্ব', 'মব্' ও 'চার্লি ম্যান' — এই চারটি প্রবন্ধ রচনামালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে শেষোক্ত প্রবন্ধটি গোর্কি রচনামালা থেকে বাদ দেন।

পৃষ্ঠা

'আমার সাক্ষাৎকার'

এই পর্যায়ে বর্তমান সংস্করণে যে তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে গোড়ায় তাতে এছাড়াও ছিল আরও তিনটি পুস্তিকা — 'যে রাজা নিজের ধ্বজা ঊর্ধ্বে ওড়ান' (জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌মকে নিয়ে ব্যঙ্গ), 'অপরূপা ফ্রান্স' (রুশ বিপ্লব অবদমনের জন্য জার সরকার ফ্রান্সের কাছ থেকে যে দু'শ' কোটি ফ্রাঙ্ক কর্জ পেয়েছিলেন সেই সম্পর্কে মন্তব্য) এবং 'রাশিয়ার জার'।

পৃষ্ঠা ৫৩

প্রবন্ধ

কোন এক মার্কিন পত্রিকার প্রশ্নতালিকার উত্তর। রচনাটি অসমাপ্ত। লেখকের মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালে 'ইণ্টারন্যাশনাল লিটারেচার'-এর ৬ (জুন) সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ১১১

সাক্কো-ভাঞ্জেত্তি হত্যাকাণ্ডের...— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতালীয় শ্রমিক সাক্কো ও ভাঞ্জেত্তিকে ১৯২০ সালের ৫ মে তারিখে মার্কিন নিরাপত্তা কর্মীদের সাজানো, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হলে সারা দুনিয়ার অসংখ্য মেহনতী মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তা সত্ত্বেও সাত বছর কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখার পর ১৯২৭ সালের ২৩ আগস্ট সাক্কো ও ভাঞ্জেত্তিকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পৃষ্ঠা ১১২

বুর্জোয়া প্রেস প্রসঙ্গে। রচনাটি অসমাপ্ত। লেখকের মৃত্যুর পর ১৯৪৭ সালে 'কুল্‌তুরা ও জীজ্‌ন' (সংস্কৃতি ও জীবন) পত্রিকার ২০ জুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ১১৪

আগেকার দিনে, যুদ্ধের আগে...— ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ।

পৃষ্ঠা ১১৬

রুজ্‌ভেল্‌ট — ১৯০১-১৯০৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেণ্ট থিওডর রুজ্‌ভেল্‌ট।

পৃষ্ঠা ১২১

কিন্তু ব্রেশ্‌কোভ্‌স্কায়াকে দিচ্ছে কেন? — সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক ইয়ে. ক. ব্রেশ্‌কোভ্‌স্কায়া — অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত শাসনক্ষমতার কট্টর শত্রু। ১৯০৬ সালে মাক্সিম গোর্কির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন প্রেস যে কুৎসামূলক প্রচারাভিযানে নামে তাতে অংশ নিয়েছিলেন।

পৃষ্ঠা ১২১

আমেরিকার নিগ্রো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী সন্ত্রাস। ১৯৩১ সালের ২৪ আগস্ট একযোগে 'প্রাভ্দা' ও 'ইজ্ভেস্তিয়া' সংবাদপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ১২২

আপনারা যাঁরা 'সংস্কৃতির কারিগর', তাঁরা কাদের দলে আছেন? ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ একযোগে 'প্রাভ্দা' ও 'ইজ্ভেস্তিয়া' সংবাদপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ১২৮

চিঠিপত্র

উইলিয়ম ডি· হেউড ও চার্লস ময়ের সমীপে। মাক্সিম গোর্কির প্রেরিত টেলিগ্রাম। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে শ্রমিক ধর্মঘট কঠোর হস্তে দমন করতে গিয়ে আইডাহো স্টেটের গভর্ণর নিহত হন। মার্কিন শাসনকর্তৃপক্ষ এই ঘটনার সুযোগে পশ্চিম খনিমজুর ফেডারেশনের প্রগতিশীল নেতাদের ওপর নির্যাতন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের কারারুদ্ধ করা হয়, তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। কেবল আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর তুমুল প্রতিবাদের ফলেই হেউড ও ময়ের বেকসুর খালাস পান।

পৃষ্ঠা ১৫৭

নূ্য ইয়র্ক সংবাদপত্র-সম্পাদকদের প্রতি

পৃষ্ঠা ১৫৭

আমার মনে হয়, আমার বিরুদ্ধে এহেন অশোভন আচরণ...—মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল প্রেস মাক্সিম গোর্কির বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচারাভিযান চালায় সেই প্রসঙ্গে। বিষোদ্গারের উপলক্ষস্বরূপ যে ঘটনাটি ছিল তা এই যে

মাক্সিম গোর্কি ও মারিয়া ফিওদরভ্‌না আন্দ্রেয়েভার বিবাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে গির্জায় সম্পন্ন হয় নি। বিষোদ্‌গারের আসল কারণ ছিল মাক্সিম গোর্কির কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কিন বুর্জোয়া 'গণতন্ত্র' ও 'সভ্যতা' সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক মনোভাব এবং মাক্সিম গোর্কিকে আমেরিকা থেকে বহিষ্করণের জন্য রাশিয়ার জার সরকার ও তার গুপ্তচরদের দাবি।

পৃষ্ঠা ১৫৭

লেওনিদ বরিসভিচ ক্রাসিন সমীপে। লেওনিদ বরিসভিচ ক্রাসিন (১৮৭০-১৯২৬) -- রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী, লেনিনের সহযোগী।

পৃষ্ঠা ১৫৮

'ওয়ার্ল্ড' — মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র।

পৃষ্ঠা ১৫৮

গিডিংস — নু্য ইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক।

পৃষ্ঠা ১৫৯

মরিস হিলকুইট — মার্কিন সমাজতন্ত্রী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। নু্য ইয়র্কে মাক্সিম গোর্কির রচনা প্রকাশে সাহায্য করেন।

পৃষ্ঠা ১৫৯

...দুমা না কিসের যেন... — প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভা এই দুমার অধিকার প্রকৃতপক্ষে নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের চাপে পড়ে জার সরকার এর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মাস দুয়েক বাদেই জার সরকার উক্ত দুমা ভেঙে দেন।

পৃষ্ঠা ১৬০

মারিয়া ফিওদরভ্না — ম. ফ. আন্দ্রেয়েভা।

পৃষ্ঠা ১৬০

কন্‌স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্‌নিৎস্কি সমীপে। ক. প. পিয়াত্‌নিৎস্কি (১৮৬৪-১৯৩৯) – গণতন্ত্রী গ্রন্থপ্রকাশন সমিতি 'জ্‌নানিয়ে' (জ্ঞান)-র অধিকর্তা ও ব্যবস্থাপক। গোর্কি ছিলেন সমিতির ভাবাদর্শ পরিচালক।

পৃষ্ঠা ১৬০

'বিংশ শতাব্দী'তে চিঠি লেখে...—রুশ উদারনৈতিক সংবাদপত্র 'বিংশ শতাব্দী' লেখকের 'সমর্থনে' নামলে তার সম্পাদকমন্ডলীর উদ্দেশে গোর্কি চিঠি লেখেন।

পৃষ্ঠা ১৬১

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে। আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ (১৮৬২-১৯২৩) রুশ লেখক, রম্য রচনাকার। ১৯০২ সালে 'গস্‌পদা অব্‌মানভি' (প্রতারক মহোদয়বৃন্দ) নামে একটি প্রচার পুস্তিকায় জার রমানভ পরিবারকে নিয়ে বিদ্রূপ করার অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৯০৫-১৯০৬ সালে দেশান্তরী হয়ে ফ্রান্স অবস্থান করেন, সেখানে 'ক্রাস্নয়ে জ্ন্যামিয়া' (লাল নিশান) নামে বিরুদ্ধপক্ষের সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন।

পৃষ্ঠা ১৬২

...**জার্মান কাইজার ভাসিলি ফিওদরভিচের সঙ্গে**...—জার্মান কাইজার দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌ম প্রসঙ্গে। এখানে ব্যঙ্গ করে তাঁকে রুশী নাম দেওয়া হয়েছে।

পৃষ্ঠা ১৬২

ইয়েকাতেরিনা পাভ্লভ্না পেশ্কভা সমীপে।

পৃষ্ঠা ১৬৩

দেখছ ত কেমন হোটেলে আমি আছি! — চিঠি লেখা হয়েছে হোটেলের ছবি আঁকা চিঠির কাগজে।

পৃষ্ঠা ১৬৩

...তারপর চলে যাব অ্যাডিরন্ডাক্স... — মার্কিন শিক্ষাবিদ জন মার্টিন ও তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে গোর্কি ন্যু ইয়র্ক স্টেটের পার্বত্য অঞ্চল অ্যাডিরন্ডাক্সে তাঁদের গ্রীষ্মাবাসে গরমকাল কাটানোর আমন্ত্রণ পান এবং সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

পৃষ্ঠা ১৬৩

একটা উপন্যাস লিখব। — 'মা' উপন্যাস।

পৃষ্ঠা ১৬৩

এখানকার জীবনযাত্রার ওপর কতকগুলো নক্শার একটা ছোটখাটো বইও... — 'মার্কিন মুলুকে' শীর্ষক রচনামালা।

পৃষ্ঠা ১৬৩

কন্স্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্নিৎস্কি সমীপে।

পৃষ্ঠা ১৬৪

এই চারটি নক্শা... — 'পীত দানবের পুরী', 'একঘেয়েমির রাজত্ব', 'মব্' ও 'চার্লি ম্যান'।

পৃষ্ঠা ১৬৪

...**মিস্টার হার্স্ট আমার জিনিস চুরি করে** — ১৯০৬ সালে, গোর্কিকে যাতে লেখাবাবদ দক্ষিণা দিতে না হয় সে জন্য যে-সব প্রকাশনালয়ের সঙ্গে গোর্কি চুক্তিবদ্ধ ছিলেন সেগুলিতে তাঁর রচনা বেরোবার আগেই হার্স্ট গোর্কির রচনার পুনর্মুদ্রণ (ইউরোপীয় পত্রপত্রিকা থেকে) করে ফেলতেন।

পৃষ্ঠা ১৬৪

ইভান পাভ্‌লভিচ লাদিজ্‌নিকভ সমীপে। ইভান পাভ্‌লভিচ লাদিজ্‌নিকভ (১৮৭৪-১৯৪৫) — বলশেভিক, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির সক্রিয় সদস্য। ১৯০৫ সালে পার্টির সিদ্ধান্তক্রমে পার্টির প্রকাশনালয়গুলি থেকে রুশ লেখকদের রচনা প্রকাশের কর্মপরিচালনার জন্য বিদেশে যান।

পৃষ্ঠা ১৬৫

...**সবগুলি শহরে সার্কুলার পাঠিয়েছি...** — খুব সম্ভব 'মুক্ত আমেরিকার সাহিত্যিকদের উদ্দেশে খোলা চিঠি' প্রসঙ্গে।

পৃষ্ঠা ১৬৫

জুলাইয়ে নাটক পাঠাব... — 'দুশমন' নাটক।

পৃষ্ঠা ১৬৫

ইভান পাভলভিচ লাদিজ্‌নিকভ সমীপে।

পৃষ্ঠা ১৬৬

...**এই হল আপনাদের নাটক...** — মাক্সিম গোর্কির 'দুশমন' নাটক।

পৃষ্ঠা ১৬৬

একটা একাঙ্ক নাটক... — গোর্কির অপূর্ণ বাসনা।

পৃষ্ঠা ১৬৬

...মার্কিনীদের সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে... — ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে গোর্কির রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

পৃষ্ঠা ১৬৬

...সবিনভ সম্পর্কে আর কী বলব? — ইতালীয় অনুবাদক, বিখ্যাত গায়ক লেওনিদ সবিনভের (মিলান, ১৯০৬) আত্মপক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে। ইনি গোর্কির বিনা অনুমতিতে তাঁর রচনাবলী অনুবাদ করেন।

পৃষ্ঠা ১৬৬

কিছু দিন আগে 'ফোমা'র... — গোর্কির উপন্যাস 'ফোমা গর্দেয়েভ'।

পৃষ্ঠা ১৬৭

ত্ভেরস্কোয়... — 'উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিত্র' (সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৯৫) গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থে উদারপন্থী বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকাকে দেখানো হয়েছে।

পৃষ্ঠা ১৬৭

শিগগিরই আমি আমার উপন্যাস শেষ করছি... — 'মা' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড।

পৃষ্ঠা ১৬৭

কনস্তান্তিন পেত্রোভিচ পিয়াত্নিৎস্কি সমীপে

পৃষ্ঠা ১৬৮

'মা' উপন্যাস শেষ করতে চলেছি... — উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রসঙ্গে।

পৃষ্ঠা ১৬৮

আপনারা বড় বেশি হৈ-হট্টগোল ও হাঙ্গামার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন... — প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমা ভেঙে দেবার পর রাশিয়ায় যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে : স্ভেয়াবর্গ ও ক্রন্‌শ্‌টাডে সৈনিক ও নাবিকদের অভ্যুত্থান, কৃষক অভ্যুত্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গে গোর্কি এই মন্তব্য করেছেন।

পৃষ্ঠা ১৬৮

উইলিয়ম জেম্‌স (১৮৪২-১৯১০) — মার্কিন বুর্জোয়া দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ; প্রয়োগবাদী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা।

পৃষ্ঠা ১৬৯

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে

পৃষ্ঠা ১৭০

তৃতীয় সংখ্যা পেয়েছি। — 'ক্রাসনয়ে জ্নামিয়া' (প্যারিস) পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় গোর্কির 'রুশ জার', 'শূন্যে বার্তা', 'সৈনিক' ও 'ইহুদী প্রশ্ন' প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ১৭০

আলেক্সান্দর ভালেন্তিনভিচ আম্ফিতিয়াত্রভ সমীপে।

পৃষ্ঠা ১৭১

উপন্যাস লিখি.. — 'মা' উপন্যাস।

পৃষ্ঠা ১৭১

পঞ্চম সংখ্যার জন্যও... — 'ক্রাসনয়ে জনামিয়া' পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা।

পৃষ্ঠা ১৭৩

ইয়েকাতেরিনা পাভলভনা পেশকভা সমীপে

পৃষ্ঠা ১৭৩

দুখবোর — রুশ অর্থডক্স গির্জার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে অনাস্থা পোষণকারী ধর্মসম্প্রদায়।

১৮৯৮-১৯০০ সালে এই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের একটি অংশকে রাশিয়ার জার সরকার বহিষ্কার করে কানাডায় পাঠিয়ে দেন।

পৃষ্ঠা ১৭৩

কাতিয়া — গোর্কির কন্যা।

পৃষ্ঠা ১৭৩

মামলাটা স্টেট্সের জনৈক সম্ভাব্য প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীর বিরুদ্ধে... — হার্স্ট-এর কথা মনে রেখে বলেছেন।

পৃষ্ঠা ১৭৫

ন্যু ইয়র্ক সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ... — 'পীত দানবের পুরী'।

পৃষ্ঠা ১৭৫

'মানবতাবাদ' — ফরাসী সংবাদপত্র L'humanité।

পৃষ্ঠা ১৭৫

'লা ভিতা' — ইতালির সমাজতন্ত্রী পত্রিকা।

পৃষ্ঠা ১৭৫

...একজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক... — ন্যু ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রুক্‌স।

পৃষ্ঠা ১৭৬